ইন্টারনেট সংস্করণ: www.ekashtipathar.com

দ্বিতীয় বর্ষ □ সপ্তম সংখ্যা □ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ □ ৩০ টাকা

Read Online
www.swarnakshar.in

কালের কষ্টিপাথর

জাহানারা ইমামের
একাত্তরের দিনগুলি
মুক্তিযুদ্ধের আগুনঝরা দিনের চাক্ষুষ ধারাভাষ্য

শুভাপ্রসন্নর
ধারাবাহিক আত্মকথা
আমার ছবিজীবন

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের
স্ট্রিট লেন বাই-লেন

নতুন ধারাবাহিক উপন্যাস
নীলকণ্ঠ ঘোষালের
কমলহিরের আলো

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ছিন্নবিচিন্তা

চিঠিপত্রে কমলকুমার
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তকে লেখা চিঠি

অমিতাভ চৌধুরির
একগুচ্ছ নতুন ছড়া

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
ভ্রমণ কথা
অমিত লাবণ্যের দেশে

স্মৃতিকথা: সমরেশ মজুমদার, নবনীতা দেবসেন, প্রচেত গুপ্ত, জাহিরুল হাসান ও শংকর চক্রবর্তী। সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক উপন্যাস রাজ্যপাট
কালীকৃষ্ণ গুহর কলমে গ্রিক কথামৃত। রণজিৎ দাশ ও বেলাল চৌধুরীর কবিতা। কবিতা-পরিচয়। চণ্ডীমণ্ডপ। বই-ঠেক। ক্ষণের বচন। শব্দবক্র

২৪"×৩০" ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিকে আঁকা। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

বইমেলায় স্বর্ণাক্ষরের স্টলে

স্টল নং ২৭৮

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
প্রথম উপন্যাস
বিষাদগাথা
হারানো অতীত থেকে ঝাঁপানো বর্তমান অবধি বিস্তৃত বাংলার স্মৃতি-ইতিহাস। নদীহারা এক গ্রামের দর্পণে দুই শতাব্দী যাপনের নিবিড় মায়াচিত্র কিংবা সমকালীন রূপকথা।
২০০ টাকা। বইমেলায় ১৫০ টাকা

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর

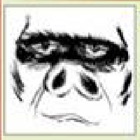

নতুন কিশোর উপন্যাস
গরিলার চোখ
৮০ টাকা। বইমেলায় ৫০ টাকা

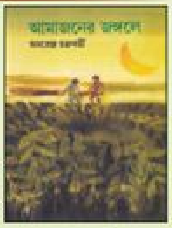

আমাজনের জঙ্গলে
৭ম মুদ্রণ প্রকাশিত হল। ৭০ টাকা

গৌর যাযাবর। গৌরের নতুন অভিযান সংযোজিত পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ। ১২০ টাকা

নিমফুলের মধু ১৮টি ছোটগল্পের সংকলন। ২য় সংস্করণ ₹৬০

সেরা ভ্রমণ কাহিনী ৩য় খণ্ড
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত। ৪৫০ টাকা। বইমেলায় ৩০০ টাকা

অমিতাভ চৌধুরির ঐতিহাসিক দলিল **মহাজনসঙ্গ**
ইতিহাসস্রষ্টাদের সান্নিধ্য-স্মৃতি। 'কালের কষ্টিপাথর'-এ ধারাবাহিক প্রকাশের সময়ে উচ্চপ্রশংসিত।

সিডি হীরু ডাকাত বই

অবাক করা গানে-সুরে বাদ্যি-বাজনায় অভিনয়ে জমজমাট
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
হীরু ডাকাত
প্রায় দু'ঘণ্টার MP3 সিডি
সব মিউজিক শপে পাওয়া যায়। ₹৯৯

পাগলকরা ছন্দে দম বন্ধ করা ডাকাতের গল্প

শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত। ৯ম মুদ্রণ ₹৪৫

স্বর্ণাক্ষরে ছোটদের বই

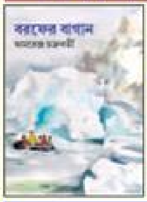

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর কিশোর-উপন্যাস
দুঃসাহসিক সমুদ্র-অভিযানের রুদ্ধশ্বাস কাহিনি
বরফের বাগান
আন্টার্কটিকার রহস্যময় তুষাররাজ্যের আশ্চর্য উপকথা। যুধাজিৎ সেনগুপ্তের ছবি।
প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত প্রায় ₹১২০

কানাইলাল চক্রবর্তীর

কুমির হয়ে জলে গেল ₹৩০
চলো দেখে আসি ₹২০
চড়ুইয়ের সঙ্গে ₹১৫

মৈত্রেয়ী নাগের
আষাঢ়ে গল্প

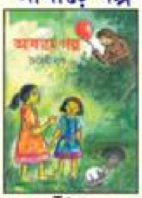

₹৬০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর

ছেঁড়াকাঁথার গল্প ₹৭৫

শাদা ঘোড়া ₹৩০

ঋষিকুমার ₹২০

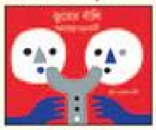

ভূতের বাঁশি ₹৪০

মহাশ্বেতা দেবীর তুতুল ₹২৫
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বকবকম ₹১৫
পূর্ণেন্দু পত্রীর আমার ছেলেবেলা ₹১৮
পবিত্র সরকারের কথামালা: ছড়ায় ঢালা ₹১৫
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
পাখির খাতা ₹৪০ হরিণের সঙ্গে খেলা ₹১৫
তালগাছের ডোঙা ₹২০ আমার বনবাস ₹১২

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

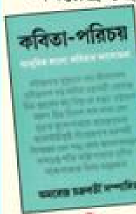

কিংবদন্তি পত্রিকার সংরক্ষণযোগ্য সংকলন
কবিতা-পরিচয়
রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে থেকে শুরু করে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার পর্যন্ত ২১ জন কবির ৪০টি কবিতা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ কবি। ₹১৫০

কবিতা
মৃত্যুর অধিক এই মেরে ফেলা ₹৫০

স্বর্ণাক্ষরে ভ্রমণবই
বিমল মুখার্জির দুচাকায় দুনিয়া ₹১৫০
শঙ্খ ঘোষের ইছামতীর মশা ₹১৫০
নবনীতা দেব সেনের ভ্রমণের নবনীতা ₹৯০
প্রতাপকুমার রায়ের দেশে দেশে ₹৭৫
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর বন্ধুভরা বসুন্ধরা ₹১২০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
সেরা ভ্রমণ কাহিনী
১ম খণ্ড। ৪র্থ মুদ্রণ ₹৫০০
২য় খণ্ড। ২য় মুদ্রণ ₹২৭৫
৩য় খণ্ড। ১ম প্রকাশ ₹৪৫০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ভ্রমণ-ভিসিডি

আন্টার্কটিকা ₹৫০
আফ্রিকার জঙ্গলে ₹৫০
আলাস্কা ₹৫০
সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড়ে ₹১০০

এছাড়াও: চিন। শ্রীলংকা। দক্ষিণ থাইল্যান্ড। মিশর। নেপাল। ব্যাংকক-পাটায়া। ইন্দোনেশিয়া। মোঙ্গোলিয়া। সুমেরুবৃত্তে ভ্রমণ। নানা দেশের লোকনৃত্য ও আরও দেশ-দেশান্তরের ভ্রমণচিত্র।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর পরিচালনায়: জম্মু ও কাশ্মীর। গোয়া। গাড়োয়াল হিমালয়। হিমাচল প্রদেশ। রাজস্থান। অন্ধ্রপ্রদেশ। কেরালা। অরুণাচল প্রদেশ ও ত্রিপুরা। বারাণসী। উইক এন্ড।

সব বই অনলাইনেও পাবেন
www.swarnakshar.in

অনলাইনে কালের কষ্টিপাথর ভ্রমণ ও ছেলেবেলা-র গ্রাহকও হতে পারেন
www.swarnakshar.in

আমাদের সব বই এখানেও পাওয়া যায়:
দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট)
স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে।

আমাদের ওয়েবসাইট:
www.swarnakshar.in
www.bhraman.com

স্বর্ণাক্ষর
Swarnakshar Prakasani Private Limited
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: 2283 2320 **Fax:** 2287 6448 **E-mail:** info@swarnakshar.in

www.ekashtipathar.com

মাসিক সাহিত্যপত্রিকা

কালের কষ্টিপাথর

এবার অর্ধেক দামে

পশ্চিমবাংলা, আসাম ও ত্রিপুরায় বইয়ের দোকানে
এবং পত্রিকাস্টলেও খোঁজ করতে পারেন।

প্রতি সংখ্যা ৩০ টাকা

**ঘরে বসে অর্ধেক দামে
নিয়মিত পত্রিকা পেতে
অনলাইন গ্রাহক হোন**
www.swarnakshar.in

নিখরচায় পড়তে পারেন:
www.ekashtipathar.com

এখনই গ্রাহক হয়ে সারা বছর অর্ধেক দামে পত্রিকা পেতে
নীচের নামে ও ঠিকানায় ১৮০ টাকার চেক পাঠান

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge Second Lane, Kolkata-700 019

স্বর্ণাক্ষর

Phone: 2280 8818, 2283 2320 **Fax:** 2287 6448 **E-mail:** kashtipathar@swarnakshar.in **Website:** www.swarnakshar.in

সবে যারা অক্ষর চিনেছে তাদের জন্য এক আশ্চর্য সুন্দর বই

কানাইলাল চক্রবর্তীর

চলো দেখে আসি

শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত

পাতায় পাতায় রঘুনাথ গোস্বামী ও পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি।

দাম ২০ টাকা

স্বর্ণাক্ষরের বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন: www.swarnakshar.in

বইমেলায় ২৭৮নং স্টলে

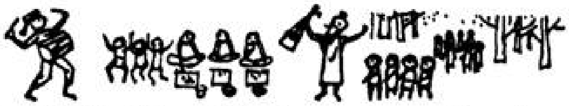

বইটি শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। এটি লেখা হয়েছে শিশুদের জন্যে যত্ন করে ও যুক্তাক্ষরবর্জিত করে। রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠ প্রথম ভাগের পর, সদ্য অক্ষর পরিচয় হয়েছে যাদের তাদের জন্যে এরকম বই বেশি লেখা হয়নি। 'এস, এস। চটপট কর। সময় কম।' এইরকম ছোট ছোট সরল বাক্য দিয়ে পাঠ শুরু হয়েছে।

ছোট-ছোট বর্ণনাগুলি ক্রমশ সুন্দর ছবির রূপ নিয়েছে।

আনন্দমেলা □ ১৬-৩-১৯৮৮

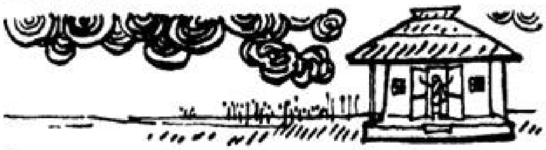

'চলো দেখে আসি' বলে বাংলা প্রথম পাঠের বইখানি এরই মধ্যে বহু যশ অর্জন করেছে। প্রথম ভাগ 'সহজ পাঠে'র চাইতেও সহজপাঠ এ বই। মোট তিনটি অধ্যায়ে লেখক স্বরবর্ণযোগের যাবতীয় বৈচিত্র্য পরিক্রমা করে নিয়ে গেছেন যুক্তবর্ণের সীমানা অবধি, ওপরে ওপরে গাঁ আর গ্রামজীবনের ছবি দিয়ে দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন সারা পথ।

আনন্দবাজার পত্রিকা □ ১৮-৯-১৯৮৮

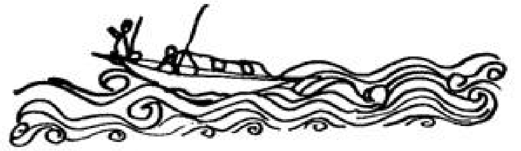

একলা একটা পাখি দুর থেকে ডাকছে না? সে কি এই দিকেই উড়ে আসছে? চলো দেখে আসি।

হঠাৎ মেঘ ডাকল না? এখন তো মেঘ ডাকার সময় নয়! চলো দেখে আসি।

ছোটদের নিয়ে ছোটদের জন্য এরকম কত কথাই যে তিনি লিখেছেন তার শেষ নেই। এরকম কিছু কথার পিঠে ছবি আঁকলেন শিল্পী রঘুনাথ গোস্বামী আর পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়— তাই নিয়ে হল একটা ছোটদের বই— 'চলো দেখে আসি।'

যুগান্তর, ছোটদের পাততাড়ি □ ১১-৬-৮৫

সদ্য বর্ণ-পরিচিতদের কাছে এক বিশ্বাস্য, প্রামাণিক আর ব্যক্তিগত পৃথিবীর দরজা খুলে দিয়ে কানাইলাল চক্রবর্তী ডাক দিয়েছেন: চলো দেখে আসি।

মিনিমাসী আর তার গাভী মালিনী, লালু-ভুলু আর তাদের কুকুর ভুকু, চূড়ামণি ঠাকুর, ভূষণমালী, ঋষি দাশ, শৈল, ভোলা, গৌরময়রা, কংসারিবেদে— এই বইতে এরা শুধু বর্ণ-পরম্পরাতেই ধরা পড়েনি, অপত্য স্নেহের এক অকৃপণ ফল্গুধারায় বাঁধা পড়ে এরা সবাই মিলেমিশে হয়ে উঠেছে প্রাক্-বিভাজন বাংলাদেশের এক প্রতিষ্ঠান।

একুশ বছর আগে লেখা 'চলো দেখে আসি' ছোট্টদের শ্রেষ্ঠ বই হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিল ১৯৭০ সালে।

আজকাল □ ২৩-৮-১৯৮৮

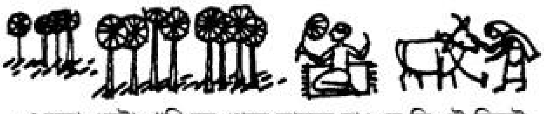

কানাইলাল চক্রবর্তী সেই সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে একজন, যাঁরা ছোটদের জন্য আন্তরিকভাবে চিন্তাভাবনা করেন।... এই বইতে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে তিনি অ-কার, আ-কার ইত্যাদির পরিচয় করিয়েছেন সেইসব শিশুদের যাদের সদ্য অক্ষরপরিচয় হয়েছে। যুক্তাক্ষরবিহীন প্রতিটি ছত্র। প্রতিটি কাহিনী শিশুদের কাছে মেলে ধরেছে প্রকৃতি এবং জীবনের অপরূপ রূপচ্ছবিকে।

বর্তমান □ ১১-২-১৯৯০

এই লেখকের আরও দুটি ছোটদের বই

কুমির হয়ে জলে গেল

প্রথম স্বর্ণাক্ষর সংস্করণ ₹৩০

চড়ুইয়ের সঙ্গে

₹১৫

স্বর্ণাক্ষর **Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.**, 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320, 2283-5526 **Fax:** 2287-6448 **E-mail:** books@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, **বলাকা বুক স্টল** (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন।

ইন্টারনেট সংস্করণ: www.ekashtipathar.com

কালের কষ্টিপাথর

দ্বিতীয় বর্ষ। সপ্তম সংখ্যা। ফেব্রুয়ারি ২০১৪। ফাল্গুন ১৪২০

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয় ৭

ক্ষণের বচন ১০। শব্দবক্র ১০

চণ্ডীমণ্ডপ। একটি নিমগাছ। চণ্ডী লাহিড়ী ৯

চিঠিপত্রে কমলকুমার ২৩

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তকে লেখা চিঠি ২৭

কানাইলাল চক্রবর্তীর পঁচাত্তর বছর আগের একটি ছোট গল্প
অজ্ঞাত ক্ষত ৩৮

ধা রা বা হি ক

কমলহিরের আলো। নীলকণ্ঠ ঘোষাল ৫২

গ্রিক কথামৃত। কালীকৃষ্ণ গুহ ২১

একাত্তরের দিনগুলি। জাহানারা ইমাম ১৩

আমার ছবিজীবন। শুভাপ্রসন্ন ৪০

রাজ্যপাট। সুব্রত মুখোপাধ্যায় ৪৯

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১১
মহাজনসঙ্গ। অমিতাভ চৌধুরি

ছিন্নবিচিন্তা। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৪

পু র নো অ্যা ল বা ম

সঞ্জয় ভট্টাচার্য একটি সাক্ষাৎকার ৪৫

ক বি তা র পা তা

অমিতাভ চৌধুরির শেষ জীবনের নতুন ছড়া ৬১

বেলাল চৌধুরীর দু'টি কবিতা ৬৪

রণজিৎ দাশের স্বনির্বাচিত সাতটি কবিতা ৬৬

ঋত্বিক ত্রিপাঠীর দীর্ঘ কবিতা ৬৯

কবিতা-পরিচয়

নষ্ট নীড়: সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ৫৫

অরুণকুমার সরকার ● দীপ্তি ত্রিপাঠী ● বিনয় মজুমদার ● ত্রিদিব ঘোষ

কবিতা-পরিচয় প্রশ্নমালা, কবির উত্তর ● অমিয় চক্রবর্তী ৬০

ভ্র ম ণ ক থা

অমিত লাবণ্যের দেশে। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী ৩১

স্ট্রিট লেন বাই-লেন। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়।
আহিরীটোলা স্ট্রিট ৭১

স্মৃতিকথা ৭৮

সমরেশ মজুমদার ■ নবনীতা দেবসেন ■ প্রচেত গুপ্ত
জাহিরুল হাসান ■ শংকর চক্রবর্তী

নি য় মি ত

কয়েকটি চিঠি ৭৩। বই-ঠেক ৭৬

প্রচ্ছদ: ২৪"×৩০" ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিকে আঁকা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

অনিবার্য কারণে জানুয়ারি সংখ্যা প্রকাশ করা গেল না। এ জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত ও লেখক পাঠক শুভানুধ্যায়ী সকলের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। সংখ্যাটি প্রকাশিত না হওয়ায় বার্ষিক গ্রাহকদের আর্থিক ক্ষতি পূরণের জন্য গ্রাহক-মেয়াদ শেষে আরও একটি অতিরিক্ত সংখ্যা দেওয়া হবে।

কালের কষ্টিপাথর

সম্পাদক : অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: সম্পাদকীয় বিভাগ: ২২৮৩-৫৫২৬
বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন: ২২৮৩-২৩২০, ২২৮০-৮৮১৮
ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ E-mail: kashtipathar@swarnakshar.in
Website: www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক, স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ, দোলতলা, দোহারিয়া, পোঃ গঙ্গানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০ ১৩২ থেকে মুদ্রিত ও ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯ থেকে প্রকাশিত।
Owner Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Printer & Publisher Amarendra Chakravorty on behalf of Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Published from 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019 and Printed from Swapna Printing Works (P) Ltd., Doltala, Doharia, P.O. Ganganagar, North 24 Parganas, Kolkata-700 132.
Editor Amarendra Chakravorty.

স্বর্ণাক্ষরে ভ্রমণকাহিনি

বইমেলায় ২৭৮নং স্টলে

দুচাকায় দুনিয়া
বিমল মুখার্জি

১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন প্রথম ভারতীয় ভূ-পর্যটক বিমল মুখার্জি। তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
পঞ্চম মুদ্রণ ₹১৫০

ভ্রমণের নবনীতা
নবনীতা দেব সেন

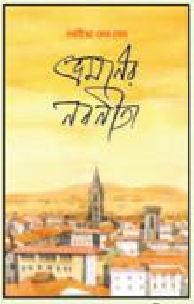

নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ ₹৯০

দেশে দেশে
প্রতাপকুমার রায়

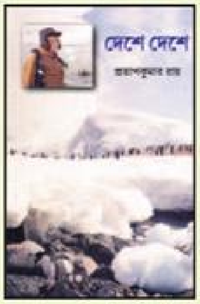

প্রখ্যাত ভ্রামণিকের ভ্রমণগাথা ₹৭৫

ইছামতীর মশা
শঙ্খ ঘোষ

কবির দেখা কবির লেখা একগুচ্ছ অসাধারণ ভ্রমণকথার সংকলন।
পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ ₹১৫০

অনলাইনেও পাবেন: **www.swarnakshar.in**

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

সেরা ভ্রমণ কাহিনী

প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অন্তরঙ্গ কাহিনি। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।

প্রথম খণ্ড । ৪র্থ মুদ্রণ ₹৫০০ **দ্বিতীয় খণ্ড** । ২য় মুদ্রণ ₹২৭৫

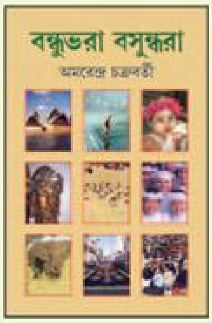

বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানোর আন্তরিক আলেখ্য। সঙ্গে রঙিন ছবি। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা।
পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ₹১২০

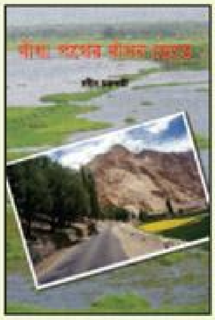

বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে
রবীন চক্রবর্তী

উত্তর-পূর্ব ভারত আর লাদাখ ভ্রমণে আগ্রহীদের এ-বই পথ দেখাবে। সঙ্গে খুঁটিনাটি দরকারি তথ্য।
₹৬০

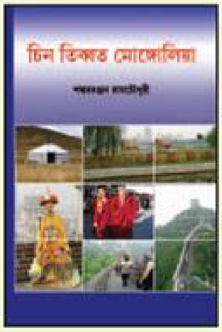

চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া
শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরী

চিন, তিব্বত আর মোঙ্গোলিয়া— ভৌগোলিক রহস্যভরা তিন ভুবনে বিচিত্র প্রকৃতি আর মানুষের জীবনস্রোতে ভেসে বেড়ানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ₹৬০

স্বর্ণাক্ষরের বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন: www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর
SWARNAKSHAR PRAKASANI PRIVATE LIMITED
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283 2320 **Fax:** 2287 6448
E-mail: info@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে আমাদের সব বই পাবেন।

কালের কষ্টিপাথর

ফাল্গুন ১৪২০ □ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

উৎসর্গ

কবি, কথাসাহিত্যিক অকপট, বিতর্কিত সাহিত্যকথক শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়-কে এই সংখ্যার 'কালের কষ্টিপাথর' উৎসর্গ করে আমরা ধন্য।

জীবনযাপনের দুটি মাত্র পথ। একটা হল অলৌকিক ঘটনা বলে যেন কিছুই নেই। অন্যটা, সব কিছুই যেন অলৌকিক ঘটনা।

আলবার্ট আইনস্টাইন

স ম্পা দ কী য়

বাংলা সাহিত্যে ভাব আর ভাষার কত যে উত্তুঙ্গ মুহূর্ত ধরা আছে তার কোনও আলাদা ইতিহাস আজও লেখা হয়নি।

এক চাঁদেরই কত রূপ! এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে বা পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি, এ তো আজ সকলেরই জানা। সকলেরই কি? এখনকার তরুণরা কি এতটা জানেন? 'থুরথুরে অন্ধ পেঁচা'র কর্কশ কণ্ঠে তাঁরা কি আর শোনেন 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে?'

হাতির কচি দাঁতের মতো চাঁদ, নারকোলের ফলার মতো চাঁদ, অশথগাছের ডালে বসা চাঁদ, কিংবা যখন 'মড়ার খুলির মতন চাঁদ ছড়াচ্ছে জ্যোৎস্না' তখন কবিদের এইসব মর্মভেদী নিরীক্ষণ কি বাংলাভাষাকে আরও বেশি সাহিত্যের মাতৃভাষা করে তোলে না? হাতের কাছে খুব সহজেই পাওয়া এই ক'টি দৃষ্টান্তই শুধু নয়, আরও অসংখ্য লক্ষ্যভেদী ভাষাবিচ্ছুরণ মনোযোগী পাঠকমাত্রকেই বিদ্ধ করেছে।

শুধু চাঁদই বা কেন, কত প্রবাদসম বাক্য বা বাক্যাংশও ছড়িয়ে আছে বাংলা সাহিত্যে— দীক্ষিত পাঠকের তা হয়তো অজানা নয়। সাহিত্যে ভাষাবিস্ফোরণ বা তার স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরণের ইতিহাসই হয়তো সাহিত্যের প্রকৃত ইতিহাস।

কতরকম জীবন, কত জন্ম-মৃত্যু, প্রেম-অপ্রেম, কত ঋতুবর্ণনা, কত গভীর আশা-নিরাশা, দুঃখ আনন্দ, বিস্ময়কর জীবনযাপন শিলালিপির মতো খোদিত আছে সাহিত্যে ভাবলে জীবনসম্পর্কে আমাদের অভ্যস্ত দৃষ্টিকোণ অনেকটাই নাড়া খেয়ে যায়।

বাঘারুখান জোতদারের, গাছখান জোতদারের, তিস্তাখান জোতদারের, আকাশখান জোতদারের, জগৎখান জোতদারের— স্মৃতিভ্রষ্ট এই উদ্ধৃতির সম্ভাব্য ভুলগুলো আমার, কিন্তু এর ভেতরের প্রবল যুগসত্যি দেবেশ রায়ের মতো শক্তিশালী ভাস্করই আমাদের মনে খোদাই করে দিতে পারেন। ভরা জ্যোৎস্নায় আদিগন্ত পটলখেতে রিক্সাওলার সহজ ঈশ্বরদর্শনের কথাকার শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় যেমন আশ্চর্য এক মায়াবি রঙে ছবি এঁকে দেন পাঠকের মনে।

'মাটিতে মিশাবো বলে আসিনি মাটিতে।' কিংবা— 'এতো দম্ভ করো না পৃথিবী/রয়ে গেল ঘরের কাঠামো/রয়ে গেল মাটির প্রতিভা/ফিরে এসে ঠিক খুঁজে নেবো।' শঙ্খ ঘোষ এই ভাবেই আমাদের মনের পলিমাটিতে তাঁর স্বপ্নচৈতন্যের বীজ বুনে দেন।

এ সবই সেই, এজরা পাউন্ড যাকে বলেছেন, 'ল্যাঙ্গোয়েজ চার্জড উইথ হায়ার পোটেনশিয়ালিটি।'

জীবনসন্ধান আর ভাষাসন্ধান তখন পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায়।

হয়তো এভাবেও একদিন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখতে হবে।

সব ক'টি উদ্ধৃতিই স্মৃতিবাহিত। ভুল ঘটে থাকলে লেখক ও পাঠক উভয়ের কাছেই ক্ষমাপ্রার্থী।

জীবনে আমি চাকরি পাইনি
ব'লে দুঃখ ছিল। ফলে,
'কর্মক্ষেত্র' আমি গোগ্রাসে
গিলি। প'ড়ে বুঝেছি, চাকরি
পেতে যে এলেম দরকার
আমার তা নেই।
প্রশ্নোত্তরগুলো রপ্ত করার
চেষ্টা করি। পরে বুঝি, খুব
দেরি ক'রে ফেলেছি। কী
করব, আমাদের বয়সকালে
তো 'কর্মক্ষেত্র' জন্মায়নি।
স্বনিযুক্তি প্রকল্পগুলো আত্মস্থ
ক'রে তবু লাখপতি হওয়ার
স্বপ্ন দেখি। এ বয়সেও হয়তো
একবার কপাল ঠুকে দেখা
যেতে পারে। তার চেয়েও বড়
কথা হল, 'কর্মক্ষেত্র' আমাকে
কাজ না দিলেও অনেক কিছু
শেখায় পড়ায়।

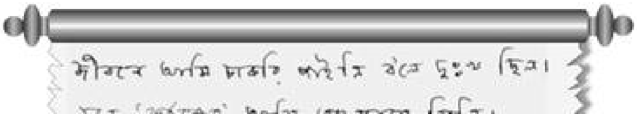
জীবনে আমি চাকরি পাইনি বলে দুঃখ ছিল।
ফলে, 'কর্মক্ষেত্র' আমি গোগ্রাসে গিলি।
প'ড়ে বুঝেছি, চাকরি পেতে যে এলেম
দরকার আমার তা নেই। প্রশ্নোত্তরগুলো
রপ্ত করার চেষ্টা করি। পরে বুঝি, খুব
দেরি ক'রে ফেলেছি। কী করব, আমাদের
বয়সকালে তো 'কর্মক্ষেত্র' জন্মায়নি।
স্বনিযুক্তি প্রকল্পগুলো আত্মস্থ ক'রে
তবু লাখপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখি।
এ বয়সেও হয়ত একবার কপাল ঠুকে
দেখা যেতে পারে। তার চেয়েও বড়
কথা হল, 'কর্মক্ষেত্র' আমাকে কাজ
না দিলেও অনেক কিছু শেখায় পড়ায়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়
১৮/১২/২০০০

কর্মক্ষেত্র
বাঙালির কর্মজীবনের প্রবেশপথ
ইন্টারনেটে কর্মক্ষেত্র: www.ekarmakshetra.com

চণ্ডীমণ্ডপ

একটি নিমগাছ

লেখা ও ছবি: চণ্ডী লাহিড়ী

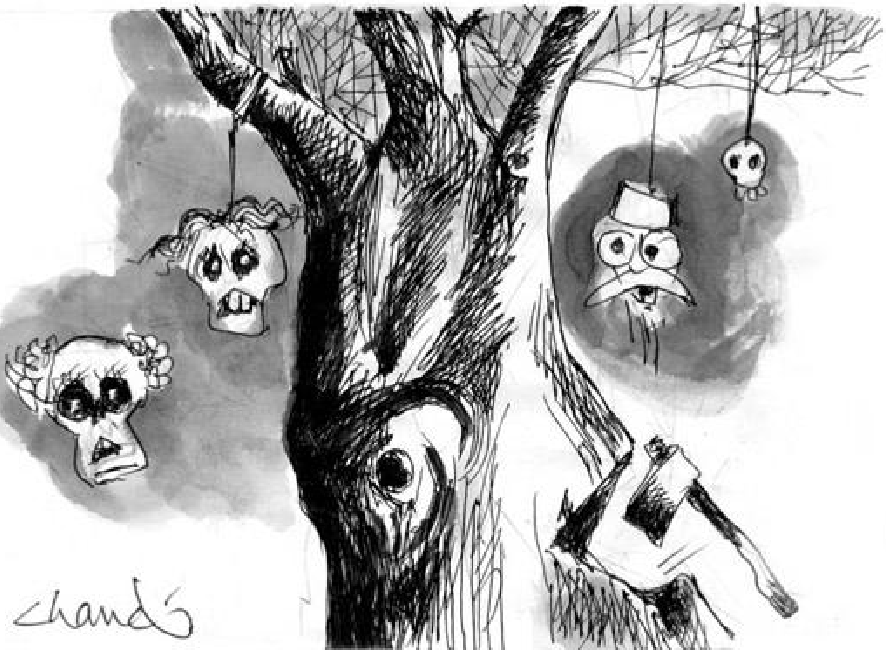

হেরিটেজ বলতে কেবল অট্টালিকা আর মন্দির বোঝায় না। প্রাচীন গাছ, পুষ্করিণী, পাখি— এসবও বোঝায়। কলকাতার বাইরে এরকম একটি অতি গৌরবময় নিমগাছ আছে। কৃষ্ণনগর (নদিয়া) শহরে হাইস্ক্রিটের বড় পোস্ট অফিসের অদূরে একটি নিমগাছ আছে। খোদ শিশির ভাদুড়ি, কাজী নজরুল, হেমন্ত সরকার (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রধান শাকরেদ), বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ('দেশ' পত্রিকার এককালের সম্পাদক) এরা কখনও কয়েকজনে, কখনও বিচ্ছিন্নভাবে আড্ডা দিতেন। আমি শিশিরবাবুর অভিনয় দেখিনি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে দু'-তিনবার মুখোমুখি বসেছি। যেটা অনেকের জানা নেই, শিশির ভাদুড়ির বোনের বিয়ে হয়েছিল কৃষ্ণনগরে, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বাবা-কাকারা সবাই শিশিরবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সৌমিত্রর বিপুল পড়াশোনার স্বভাবটাও পারিবারিক সূত্রে পাওয়া।

শিশিরবাবুর জন্মস্থান মেদিনীপুরে, কারণ তাঁর বাবা-কাকারা সুন্দরবনে লাট হাসিল করতে গিয়েছিলেন। যে যত জঙ্গল কেটে, অপরাধী মেরে, জমি দখল করতে পারবেন, ততটা লাট (LoT একলপ্তে) পাবেন। একেবারে নিষ্কর। সেই সূত্রে তাঁরা মেদিনীপুরে যান।

হরিদা (হরিসাধন দাসগুপ্ত) একদিন এলেন আমার বাড়ি। 'বাঘা যতীন' ডকুমেন্টারি করবেন। অমল সুরকে (প্রেসিডেন্সির ভালো ছাত্র, সুচিত্রা সেনের পরম বন্ধু এবং অসিত সেনের দক্ষিণ হস্ত) সঙ্গে নিয়ে। বাংলা চলচ্চিত্রের এই লিজেন্ড আমার বাড়ি! আগেই হোমওয়ার্ক করে নিয়েছেন— বাঘাযতীন মুকুজ্জে হলেও সৌমিত্রর ঠাকুর্দাদের নিকট আত্মীয় এবং বাঘাযতীন বেশির ভাগ সময় কেষ্টনগরে থাকতেন। Light-Camera-Action.

সেই নিমগাছটা এখনও আছে। চায়ের দোকানটা অবশ্য নেই। ভূতের গপ্পো নিয়ে সবাই ফিল্ম বানাচ্ছে। শীর্ষেন্দু তো এব্যাপারে মাস্টার। সেই নিমগাছটায় নজরুল, শিশিরবাবু, বিজয়লাল, হেমন্ত সরকার সবাই ভূত হয়ে ডালে বসে আছেন! ভাবুন না।

একালের পরিচালকরা প্রচুর পড়াশোনা করেন। নিমগাছের দরকার নেই। বেলগাছ ও শ্যাওড়া গাছেও তাঁরা বেশ আরাম বোধ করেন। বাজ-পড়া তালগাছের মাথায় বাঘাযতীন জম্পেশ করে বসে পা দোলাতে পারবেন। আর হেমন্ত সরকার— that argumentative Bengalee —তাঁর জন্য ন্যাশনাল লাইব্রেরির একটা প্রকোষ্ঠ দরকার। এলিম্য ইম্পে হলে বাইরের বটগাছটা বেশ মানাত। সরকার মশাই বই আর তর্ক না পেলে দু'সেকেন্ডও বাঁচবেন না। সরি, তিনি তো মরেই ভূত হয়েছেন।

হেমন্ত সরকার মাত্র আঠারো বছর বয়সে তিনটি বিষয়ে এম এ করেছিলেন। স্যার আশুতোষের অনুরোধ এড়িয়ে যাদবপুরের জাতীয় শিক্ষা পরিষদে, যেটা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন জিদ করে বানিয়েছিলেন, সেখানে পড়াতে শুরু করেন। আমি তাঁকে দু'বার দেখেছি। কথা বলেছি। সুভাষচন্দ্রের তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেই ভাঙা নিমগাছ নিয়ে ডকুমেন্টারি বানাতে হলে হেমন্ত সরকারকে দেখাতে হবে, হেমন্ত সরকারকে দেখাতে হলে সুভাষ বোসকে দেখাতে হবে। আবার সুভাষ বোসকে ভূত হিসেবে দেখাতে গেলে ফরওয়ার্ড ব্লকের অশোক ঘোষ মারতে আসবে। তিনিও তো ধরেই নিয়েছেন সুভাষ বোস কোনওদিন মরবে না। পবিত্র সরকারকে ডাকবেন না। বানান নিয়ে বিভ্রাট বাধাবেন। আমরা গ্রামের লোকেরা সাধারণত ভুত বলি ও লিখি। তবে ভয় পেলে নির্ঘাত ভুঁত লিখব। আর বিদ্যুৎ বারের ভরদুপুরে তিনি দেখা দিলে দু'টি কানে হাত দিয়ে বলছি ভুঁ ভুঁ ভুঁ ভুঁ ভুঁ ম্যারাথন।

ক্ষনেরবচন

৯৬
মিথ্যার বিরুদ্ধে যদি মিথ্যার পাহাড়
তারও জবাবে মিথ্যা যদি খ্যাপা ষাঁড়
অকাল সন্ধ্যায় তবে কুবাতাস বয়
বসন্তেও যথাতথা শিলাবৃষ্টি হয়।

৯৭
মনুষ্যত্বহীন মুখ মুখোশে ঢাকিলে
দেশের আকাশ ঢাকে শকুনে ও চিলে।

৯৮
সুকর্মের সঙ্গে যদি স্বার্থসিদ্ধি মেশে
ক্ষয়রোগে ভোগে দেশ, মরে কেশে কেশে

৯৯
নিজ দোষ নিজ ভুল নিজ মুখে বলে
নিজেরই অজ্ঞাতে গুণ উঠবেই জ্বলে।

১০০
শত দুঃখে কষ্টে লোকে
পরিত্রাতার আশায় ধোঁকে।

ক্ষণকথক

ছবি: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

শব্দবক্র

৯৬। রসযোগী

বিশেষ্য; রসিক বঙ্গসমাজকে যে প্রধান দু'টি দলে ভাগ করা যায়, তার প্রথমটি। এ বিভাগের কোনও সদস্যই কখনও রস ব্যতিরেকে রসগোল্লা ভক্ষণ করেন না। দ্রঃ গোল্লাভোগী

৯৭। গোল্লাভোগী

বিশেষ্য; রসিক বঙ্গসমাজকে যে প্রধান দু'টি দলে ভাগ করা যায়, তার দ্বিতীয়টি। এ বিভাগের সব সদস্যই সদাই রসটুকু চেপে বের করে ফেলে তবেই রসগোল্লা ভক্ষণ করেন। দ্রঃ রসযোগী > ঠিকুজি-কুষ্ঠি, গ্রহ-নক্ষত্র, রাশি-গণ সব মিলিয়ে দেখে বিয়ে করার পর চরম গোল্লাভোগী গোপালবাবুর মাথায় হাত। রসযোগী শুধু তাঁর গিন্নিটিই নন, গোটা শ্বশুরবাড়িই। রসগোল্লার রস চিপড়ানো দেখলেই সকলে সমস্বরে হায় হায় করে বলতে থাকেন, 'করো কী করো কী, রসগোল্লার আসল মজাটাই যে নিংড়ে বার করে দিলে গো!'

৯৮। নবজলধরপটহোল

বিশেষ্য; গ্রীষ্মকালে রাস্তার যেসব খানাখন্দ কিছু এড়িয়ে কিছু মাড়িয়ে পথ করে নেওয়া চলে, বর্ষাকালে তাদেরই টইটম্বুর অবতারের শ্রদ্ধেয় নাম। পথচারীর প্রধান মনোযোগের বিষয় তখন শ্রদ্ধার সঙ্গে এ নূতন সৃষ্টিকে পাশ কাটিয়ে চলা > বাজার থেকে এক থলে কচি পটোল কিনে শ্যামবাবু মোটরবাইকে চড়ে বাড়ি ফিরছিলেন। একটি নবজলধরপটহোলকে একটু অবজ্ঞা দেখিয়েছেন, আর ব্যস! নিজে পথের ধারে বাইকসমেত আলুর দম হলেন আর কচি পটোলগুলো সে নবীন অবতারের ভোগে গেল।

৯৯। আনুস্বারি

বিশেষণ; যেসব শব্দের সংক্ষিপ্তকরণে অনুস্বর ব্যবহৃত হয় যেমন, পুরুষের বদলে পুং, কোম্পানির বদলে কোং, বঙ্গজাতির বদলে বং।

১০০। বৈসর্গিক

বিশেষণ; যেসব শব্দের সংক্ষিপ্তকরণে বিসর্গ ব্যবহৃত হয় যেমন ডাক্তারের বদলে ডাঃ, সেপ্টেম্বরের বদলে সেপ্টেঃ, ছি ছি এ কী করলে-র বদলে ছিঃ।

শব্দবক্রমুণি

ম হা জ ন স ঙ্গ

অমিতাভ চৌধুরি

। পর্ব ৩২।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

আমার গর্ব, আমিও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ছাত্র ছিলাম, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ পড়ার সময়। আর সুনীতিবাবুর গর্ব ছিল রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অমর করে গিয়েছেন তাঁর উপন্যাস 'শেষের কবিতা'য়। অমিত রায় যখন শিলং পাহাড়ে গিয়েছিল, তখন সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল 'সুনীতি চাটুজ্জের ভাষাতত্ত্বের বই'। তিনি বলতেন, 'এর চেয়ে বড় সম্মান আর কী হতে পারে?' সত্যি কথা, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে স্নেহ করতেন এবং 'বাংলা শব্দপরিচয়' বইটি তাঁকেই উৎসর্গ করেন। তাঁকে তিনি উপাধি দিয়েছিলেন 'ভাষাচার্য' বলে। ১৯২৭ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন ইন্দোনেশিয়া সফরে যান, তখন সুনীতিবাবুকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর লেখা 'দ্বীপময় ভারত' বইয়ে তার বিস্তৃত বিবরণ আছে। রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত 'সাগর জলে সিনান করি' কবিতাটির নামকরণ 'সাগরিকা' করেছিলেন সুনীতিকুমারই।

মনে আছে, তাঁর মৃত্যুর মাত্র কয়েক বছর আগে তিনি পৌষ উৎসবে তাঁর রবীন্দ্রসান্নিধ্যের বিবরণ দিয়ে অসাধারণ একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন আম্রকুঞ্জে। এত মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম যে, তাঁর পূর্ণ বিবরণ রাখতে পারিনি। পরে আপশোস করেছি। তিনি শুধু ভালো লিখতেন না, তাঁর বাকবৈদগ্ধ্যও ছিল অসাধারণ।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ সেই বিলেত থেকে। ১৯১৯ সালে তিনি বিলেত যান। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডি লিট উপাধি পান। ১৯২২ সাল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ছিলেন খয়রা-অধ্যাপক। আমরা তাঁর শেষ যুগের ছাত্র। তাঁর ক্লাসে থাকা আমার গর্বের বিষয় ছিল। মালকোঁচামারা ধুতি, বেঁটে পাঞ্জাবি, গলায় চাদর, পায়ে পাম্প শু পরে হন্তদন্ত হয়ে ক্লাসে ঢুকতেন এবং ঝড়ের বেগে পড়িয়ে হনহন করে চলে যেতেন।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সুনীতিবাবু যেমন বলিয়ে-কইয়ে মানুষ ছিলেন, তেমনই তাঁর কলমও ছিল ক্ষুরধার। কত বই, কত প্রবন্ধ যে লিখেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। ছোটবেলায় 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় তাঁর লেখা 'আয়ারল্যান্ডের সীড' 'দেভ্রিউ' সম্পর্কে লেখা পড়ে আমার মতো এক মফস্সল-বালকের মনে কী আলোড়ন তুলেছিল, তার কথা আজও মনে আছে। গত শতাব্দীর বিশের দশকে তাঁর লেখা 'দ্য অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ' বইখানি আজও যে-কোনও ভাষাবিজ্ঞানীর পথনির্দেশক। তাঁর লেখা 'কিরাত জন কৃতি' এবং 'আফ্রিকানিজম'— অসাধারণ দু'খানি বই। 'চণ্ডীদাসের পদাবলী' সম্পাদনা করেছেন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর শেষ জীবনে 'রামায়ণ কাহিনীর উৎস সন্ধানে' লিখতে গিয়ে কম সমালোচিত হননি আমাদের দেশের। শব্দচারণেও তাঁর অসাধারণত্ব ছিল। 'কালচার' শব্দের বাংলা করা হত 'কৃষ্টি'। শব্দটি রবীন্দ্রনাথের পছন্দ ছিল, তাঁরই অনুরোধে তিনি রবীন্দ্রনাথকে ও বাংলা সাহিত্যকে উপহার দেন

'সংস্কৃতি' শব্দটি— মরাঠি থেকে নিয়ে।

সুনীতিবাবুর ছোটবেলা কেটেছে দারিদ্র্যের মধ্যে। সুকিয়া স্ট্রিটের পিত্রালয় থেকে বাল্যকালে হেঁটে যেতেন চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ের মতিলাল শীলের অবৈতনিক স্কুলে। সেখান থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং তাঁর গৌরবময় জীবনের শুরু। অনেক পরে আসেন বালিগঞ্জের হিন্দুস্থান পার্কে 'সুধর্মা' নামক বাড়িতে। সেই বাড়ি ছিল প্রাচীন জিনিসের এক জাদুঘরও। তাঁর আগ্রহ ছিল বহু বিষয়ে। তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদ ছিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ি। 'সীতা' নাটকে পোশাক-পরিচ্ছদ পরিকল্পনায় তাঁর হাত ছিল। তিনি নিজেও ভালো ছবি আঁকতেন। সেই জন্য নন্দলাল বসুর সঙ্গেও তাঁর হৃদ্যতা ছিল।

তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদ ছিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ি। 'সীতা' নাটকে পোশাক-পরিচ্ছদ পরিকল্পনায় তাঁর হাত ছিল।

সুনীতিবাবু পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষও ছিলেন বেশ কয়েক বছর। গত শতাব্দীর ষাটের দশকে হন জাতীয় অধ্যাপক এবং পরে সাহিত্য অকাদেমির সভাপতি। নিজে শান্তিনিকেতনে পড়তে পারেননি বলে তাঁর মনে আক্ষেপ ছিল। তাই তাঁর দুই মেয়ে রুচি ও শুচিকে শান্তিনিকেতনেই পড়িয়েছিলেন। সেই সুনীতিবাবুর সঙ্গে পরবর্তীকালে অক্ষম আমার একটা বিবাদ হয়েছিল। বাংলা ভাষা নিয়ে তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধের দীর্ঘ প্রতিবাদধর্মী লেখা ছাপিয়েছিলাম 'দেশ' পত্রিকায়। আমার লেখায় যুক্তি ছিল, কিন্তু যুক্তি তো বড় কথা নয় আমার লেখার ধরনটা এত চড়া সুরের ছিল যে, পরে আমি তার জন্য আপশোস করেছি। 'বাংলা বাসনে সুনীতি ও কুনীতি' নামক আমার প্রবন্ধটি কনিষ্ঠ ছাত্রসুলভ ছিল না। তার জন্য আমি পরে আপশোস করেছি। তিনি দেখা হলেও আমার সঙ্গে কথা বলতেন না, মুখ ফিরিয়ে নিতেন। সেই সুনীতিবাবুই আমার লেখা 'রবীন্দ্রনাথের পর লোকচর্চা' পড়ার পর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে আমার আর এক মাস্টারমশাই প্রবোধচন্দ্র সেনকে চিঠি লিখেছিলেন। প্রবোধচন্দ্র সেন আমাকে তা জানিয়ে বলেছিলেন সুনীতিবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। দেখা করেছিলাম। তিনি বলেন, 'আপনার বই পড়ে মনে হচ্ছে পরলোক জায়গাটা মোটেই খারাপ নয়, আমি নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে মরতে পারি।' *আগামী সংখ্যায় শেষ*

বইমেলায় ২৭৮নং স্টলে

অনলাইনে কিনতে ▸ www.swarnakshar.in

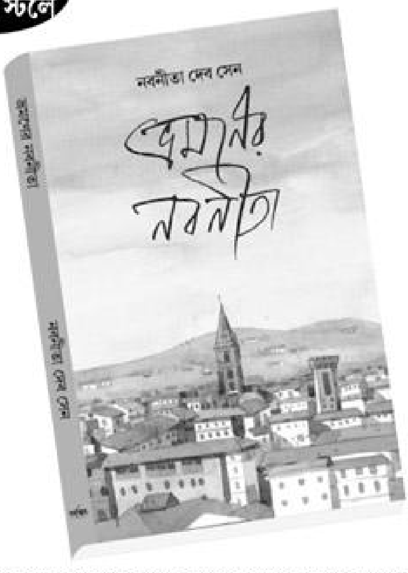

নবনীতা দেব সেনের

ভ্রমণকথা

ভ্রমণের নবনীতা

নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।

দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৯০

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, **বলাকা বুক স্টল** (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

স্বর্ণাক্ষরের বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন: www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ **ফ্যাক্স:** ২২৮৭-৬৪৪৮ **ই-মেল:** info@swarnakshar.in

জাহানারা ইমাম

একাত্তরের দিনগুলি

জাহানারা ইমাম

দশ-বারো বছর আগে একবার এক একুশে ফেব্রুয়ারি আর একবার বাংলা নববর্ষে ঢাকার সন্ধানী প্রকাশনীর সাহিত্যানুরাগী কর্ণধার, আমাদের অনেকেরই বন্ধু, গাজী শাহাবুদ্দিন আহমদের আতিথ্যে সারা রাত সারা দিন ঢাকার পথে পথে ঘুরে দেশে ফেরার বেশ কিছুদিন পর গাজী শাহাবুদ্দিন সস্ত্রীক কলকাতায় আমাদের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন, সেইসময় নিজের প্রকাশনীর একটি বই— জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি' আমাকে উপহার দেন। ওঁরা দেশে ফিরে যাবার দিনই রাতে আমি বইটি শুরু করে ভোরবেলা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। আমাদের এত কাছে, একদা আমাদেরই ভাঙা হৃদয়ের একটা টুকরো এক ভূখণ্ডের স্বাধীন দেশ হয়ে জন্মানোর রোজকার রক্তাক্ত ঘটনাপঞ্জি এভাবে চোখের সামনে জীবন্ত দেখব কখনও কল্পনাও করিনি। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ পূর্ব-পাকিস্তানের ওপর পাক সেনার আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে থেকে বিধ্বংসী ঝড় ওঠার আগের থমথমে মুহূর্তের প্রত্যক্ষ বর্ণনা দিয়ে শুরু করে ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হবার পরদিন পর্যন্ত এ এক পরম মূল্যবান ইতিহাসের সজীব ধারাভাষ্য।

১৯৮৬-তে প্রথম প্রকাশের পর ১৯৯৭ পর্যন্ত বাংলাদেশে বইটির বিংশতিতম মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশক গাজী শাহাবুদ্দিন ঢাকা থেকে ফোনে জানালেন, পাকিস্তানেও নাকি এ বইয়ের উর্দু অনুবাদ বেরিয়েছে। আমাদের ঘরের পাশেই বাংলা ভাষাভিত্তিক এই নতুন দেশের জন্মযুদ্ধের একজন ভুক্তভোগী জননী ও জায়ার লেখা এমন মহামূল্য দলিল পাঠ থেকে এপার বাংলার আমরাই বা বাদ থাকব কেন! 'কালের কষ্টিপাথর'-এ বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের এই দৈনন্দিন দলিলের পুনর্মুদ্রণ প্রয়াত লেখিকার স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ। বইটির প্রকাশক ও জাহানারা ইমাম স্মৃতিরক্ষা সমিতির সদস্য গাজী শাহাবুদ্দিনের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, তিনি এই বাংলায় শুধু আমাদেরই এই বই পুনর্মুদ্রণের সানন্দ সম্মতি দিয়েছেন।—সম্পাদক

আঠারো

৮ নভেম্বর সোমবার ১৯৭১

হ্যারিসের বাসায় গিয়েছিলাম রুমীর একটা ফটোর নেগেটিভ আনতে। বছর দুয়েক আগে ওরা দু'জনে ওয়েস্ট পাকিস্তান বেড়াতে গিয়েছিল আমার দুই বোনের কাছে। তখন হ্যারিসই তুলেছিল ছবিটা। আমার কাছে একটা কপি আছে। কোমরে চিশতীর পিস্তল আর কাঁধের ওপর দিয়ে গুলির বেল্ট ঝুলিয়ে মাথায় একটা ক্যাপ লাগিয়ে কোমরে দুই হাত রেখে রুমী কী যেন বলছে— এমনি অবস্থায় তোলা ছবিটা। খুবই জীবন্ত মনে হয়। গতকাল হঠাৎ হ্যারিস নিজেই ফোন করে বলেছিল তার কাছে রুমীর কয়েকটা ছবির নেগেটিভ আছে। আজ গিয়ে নিয়ে এলাম। ক'দিন থেকে রুমীর ফটো খুঁজছিলাম বাসার সব অ্যালবাম খুলে। ইদানীং রুমী একেবারেই ফটো তুলতে চাইত না। ফটো যা আছে, সব দু'তিন বছর আগের তোলা। হ্যারিসের কাছ থেকে নেগেটিভ এনে দোকানে একটু বড় করে প্রিন্ট করতে দিলাম।

পুরনো ছেলেপিলেরা মাঝে-মধ্যে হঠাৎ এসে দেখা করে যায়। সেলিম এসেছিল গতকাল। আজ এসেছিল মনু অর্থাৎ মনিরুল আলম।

১০ নভেম্বর বুধবার ১৯৭১

মাসুম আজ বাড়ি গেল। ভোরে গাড়ি করে কোচ স্টেশনে দিয়ে এসেছি।

ঈদের কোনাকাটা খুব জমে উঠেছে। তবে তা এক শ্রেণীর লোকের মধ্যেই। যাদের বাড়ির মেয়েদের জামাকাপড় আর ছেলেদের টুপি-জুতোতে বেশি বেশি জরি, চুমকির বাহার দেখা যায়— সেই সব বিহারি আর বাড়িতে উর্দু বলা 'বাঙালি'দের মধ্যেই ঈদের কেনাকাটার সমারোহটা বেশি দেখা যাচ্ছে। আমাদের কোনও ঈদের কেনাকাটা নেই। আমাদের মতো আরও অনেক পরিবারেরই নেই। কোথা থেকে যেন সাইক্লোস্টাইল করা হ্যান্ডবিল ছেড়েছে— দেশের এই দুর্দিনে ঈদের খুশি বলে কিছু নেই। সুতরাং ঈদ উপলক্ষে নতুন জামাকাপড় কেনা, উৎসবের আয়োজন করা অনুচিত। অন্যদিকে সামরিক জান্তা প্রচার করছে, ঈদের খুশি সামনে— প্রাণভরে সবাই আনন্দ করো, কাপড় কেনো, পোলাও কোর্মা সেমাই ফিরনির আয়োজন কর। এক শ্রেণীর লোক মেতেও উঠেছে তাই করতে। নিউ মার্কেটে, বায়তুল মোকাররমে, জিন্না অ্যাভেনিউতে গেলে লোকের এই আনন্দ-উল্লাস দেখে মনের মধ্যে রাগ, ঘৃণা, বিতৃষ্ণা ফুঁসে ওঠে।

১২ নভেম্বর শুক্রবার ১৯৭১

চারদিকে কেমন একটা যুদ্ধ-যুদ্ধ ভাব। দৈনিক কাগজগুলো ভারতীয় আগ্রাসন,

ভারত কর্তৃক যুদ্ধের হুমকি, সীমান্তে ভারতীয় তৎপরতা ইত্যাকার খবরে সয়লাব। পাঁচ তারিখে হঠাৎ সরকারি আদেশে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে রাত সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে নটা পর্যন্ত ব্ল্যাক আউটের মহড়া হল। আজ আবার কাগজে দেখছি সরকারি-বেসরকারি সব বাড়িঘরের পাশে ট্রেঞ্চ খোঁড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ওদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত সংগ্রহের উদ্দেশে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছেন।

দেশের অভ্যন্তরেও লম্ফঝম্প কম হচ্ছে না। পি ডি পি'র চেয়ারম্যান নুরুল আমিন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে আবেদন জানিয়েছেন রাজাকারদের সংখ্যা এবং তাদেরকে দেওয়া অস্ত্র— দুই-ই বৃদ্ধি করা হোক। উপনির্বাচন শুরু হওয়ার পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানে যে হারে 'ভারতীয়' ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ বেড়ে গিয়েছে, তাতে রাজাকারদের শক্তিশালী করা খুবই প্রয়োজন।

কেরোসিনের দর হঠাৎ করে এক লাফে প্রতি টিন ১১ টাকা থেকে ১৮ টাকায় চড়ে গিয়েছে। কী ব্যাপার? সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনে বিচ্ছুদের ধাক্কার জের মনে হচ্ছে!

এতদিন কাগজে শুধু রাজাকার বাহিনীদের কথাই পড়তাম। এখন দেখছি আরও নতুন দুটো বাহিনীর নাম— আল-শামস আর আল-বদর। শব্দ দুটোর মানে কী? কাগজে দিচ্ছে— রাজাকারদের আল-শামস ও আল-বদর বাহিনী। তার মানে এরা রাজাকার বাহিনীরই দুটো অংশ? একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর?

গতকাল বায়তুল মোকাররমের দোকানে বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। আজকাল ঢাকায় এরকম কোথাও কিছু হলে আমার বিস্তারিত খবর জানতে কোনও অসুবিধা হয় না। মিনিকে ফোন করলেই সব জানা যায়। ওর কাছ থেকেই জানতে পারলাম এই দলটার মধ্যেও জন আর ফেরদৌস ছিল। আরও ছিল আসাদ, ফিরোজ, বাবু, সহর, মুনীর, জাহেদুল। ওদের ঘটানো বিস্ফোরণে ফ্যান্সি হাউস বলে শাড়ির দোকানের ভেতরে একজন পাঞ্জাবি মেজর, আর কয়েকজন মহিলা জখম হয়েছে। দোকানের সামনে দাঁড়ানো তিনজন খানসেনা মরেছে, আরও কয়েকজন জখম হয়েছে। ফল হয়েছে বাকি দিন দোকানপাট সব বন্ধ, লোকের ঈদের কেনাকাটায় ছাই পড়েছে।

বেশ হয়েছে।

ওরা ফিরল— তখন প্রায় চারটে। খালি হাতে। অস্ত্র এবং লাইসেন্স দুই-ই রেখে দিয়েছে, শুধু কয়েকটা টুকরো কাগজে রসিদ দিয়েছে। শরীফের সারা মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, দুই চোখ লাল। গতকাল সারারাত জাগা, তারপর সারাদিন গোসল, বিশ্রাম কিছু নেই— অস্ত্র হাতে রোদে দাঁড়িয়ে থাকা।

১৭ নভেম্বর বুধবার ১৯৭১

আজ একখানা দিন গেল বটে। গত রাতটা ছিল শবে কদরের রাত, শরীফ আর বুড়া মিয়া পাড়ার প্লেনওয়ালা মসজিদে গিয়েছিল নামাজ পড়তে। গতকাল রাতে কারফিউ ছিল না। শবে কদরের রাত বলেই। মুসল্লিরা সারারাত ধরে মসজিদে এবাদত-বন্দেগি করে ফজরের নামাজ পড়ে তারপর বাড়ি ফিরবেন। জামী আর আমি বাড়িতে নামাজ পড়েছি, মাঝরাতে ঘণ্টাদুয়েক ঘুমিয়েও নিয়েছি। পাঁচটার সময় হঠাৎ নীচে কলিং বেল বাজল। বুক ধড়াস করে উঠল। এই ভোররাতে কলিং বেল? ফজরের নামাজ না পড়ে তো শরীফদের ফেরার কথা নয়। তাহলে? ভাবতে ভাবতেই আবার কলিং বেল। দোতলার বারান্দায় বেরিয়ে আস্তে করে বললাম, 'কে?'

শরীফের গলা শোনা গেল, 'আমি।'

অবাক হয়ে নীচে নেমে দরজা খুলে দিলাম, 'এখনও তো ফজরের সময় হয়নি। চলে এলে যে?'

'কারফিউ দিয়ে দিয়েছে সাড়ে পাঁচটা থেকে। মাইকে করে বলে বেড়াচ্ছে। মুসল্লিরা সবাই হুড়মুড়িয়ে বাড়ির পানে দৌড় দিয়েছে। ফজর নামাজ পর্যন্ত থাকার উপায় কী? তাহলে তো মসজিদেই আটকা পড়ে থাকতে হবে।'

তা ঠিক। ফজরের আজান পড়বে পৌনে ছ'টায়। আর কারফিউ সাড়ে পাঁচটা থেকে। কাজেই ফজর নামাজ পর্যন্ত মসজিদে থাকার কোনও উপায় নেই।

আজ ছুটি। শবে কদর বলেই। কাল সারারাত জেগে শবে কদরের নামাজ পড়েছেন মোমিন মুসলমানরা, আজ দিনে একটু ঘুমোবেন।

শরীফ নটার দিকে গোসলখানায় ঢুকতে যাবে, এমন সময় হঠাৎ মাইকে কিছু ঘোষণার মতো শোনা গেল। কী আশ্চর্য, আমাদের গলিতে! সবাইকে যার যার বন্দুক, রাইফেল, পিস্তল আর লাইসেন্স নিয়ে মেইন রোডে যেতে বলছে।

এ আবার কী ব্যাপার? শরীফ গেটের কাছে বেরিয়ে দেখল হোসেন সাহেব, ডাক্তার সাহেব, রশীদ সাহেব সবাই গেটের কাছে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছেন। গলিতে দু'জন মিলিশিয়া পুলিশ। কারফিউয়ের মধ্যে বন্দুক, পিস্তল নিয়ে মেইন রোডে গেলে কারফিউ ভঙ্গ করার অপরাধে পড়তে হবে কি না এ নিয়ে সবার মনে ভয়। মিলিশিয়া দু'জন অভয় দিয়ে বলল, কারফিউয়ের মধ্যেই তো অর্ডার দেওয়া হয়েছে, ভয়ের কিছু নেই।

আমাদের কাছে একটা বারো বোর শটগান, একটা টুটু বোর রাইফেল আর একটা অ্যাশট্রা পিস্তল। শরীফ জামী ওগুলো হাতে নিয়ে মেইন রোডের দিকে হাঁটা দিল সাড়ে নটায়। আমিও গেটের কাছে বেরিয়ে দেখলাম অন্য সব বাড়ি থেকে সবাই নিজের অস্ত্র আর লাইসেন্স হাতে নিয়ে গুটিগুটি চলেছে এলিফ্যান্ট রোডের দিকে।

ওরা ফিরল— তখন প্রায় চারটে। খালি হাতে। অস্ত্র এবং লাইসেন্স দুই-ই রেখে দিয়েছে, শুধু কয়েকটা টুকরো কাগজে রসিদ দিয়েছে। শরীফের সারা মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, দুই চোখ লাল। গতকাল সারারাত জাগা, তারপর সারাদিন গোসল, বিশ্রাম কিছু নেই— অস্ত্র হাতে রোদে দাঁড়িয়ে থাকা। শীতের রোদ হলেও রোজা রেখে সারাদিন

দাঁড়িয়ে থাকা খুবই কষ্টকর। জামীর মুখ দেখে মনে হচ্ছে ওর জ্বর এসেছে।

১৯ নভেম্বর শুক্রবার ১৯৭১

সকলেরই মনের অবস্থা খুব খারাপ। দুঃখ, হতাশা, ভয়, নিষ্ফল ক্রোধ— সব মিলে আমাদেরকে যেন পাগল বানিয়ে ছাড়বে। শরীফের ওজন খুব দ্রুত কমে যাচ্ছে। আমারও কমেছে। তবে আমাকে নিয়ে নাকি ভয় নেই। আমি কাঁদি, হাহুতাশ করি, কথা বলি, মনের বাষ্প বের করে দেই। শরীফ এমনিতেই কথা কম বলে, এখন আরও কম— তার ওপর সে কাঁদেও না, হাহুতাশ করে না, মনের বাষ্প বের করার কোনও প্রক্রিয়া তার ভেতর দেখি না। প্রতিদিনের অভ্যস্ত নিপুণতায় সে তার সব কাজ করে যায়— সকালে উঠে শেভ, গোসল, ফাঁকে ফাঁকে স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান শোনা, তারপর অফিস, বিকেলে টেনিস, সন্ধ্যায় আবার স্বাধীন বাংলা বেতার, বন্ধুবান্ধব নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কীয় আলাপ-আলোচনা— ওকে বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই দুঃখ ওকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

শহরে একটা নতুন জিনিস দেখা যাচ্ছে। বিহারিরা সবাই মাথা ন্যাড়া করে একটা লাল ফেটি বেঁধে বেড়াচ্ছে। ওদের দেখাদেখি অনেক বাঙালিও। ন্যাড়া মাথা দেখলেই খানসেনারা ছেড়ে দেয়, তাই বোধহয় অকারণ হয়রানির হাত থেকে বাঁচবার জন্য অনেক ভীরু বাঙালি যুবকও মাথা ন্যাড়া করেছে।

রুমীর এনলার্জ করা ফটোটা দোকান থেকে এনেছি। বেশি বড় করিনি, মাত্র আট বাই দশ। ওই মাপের একটা ফটোস্ট্যান্ডও কিনে এনেছি। ফটোটা স্ট্যান্ডে লাগিয়ে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম। কতদিন দেখিনি ওই প্রিয়মুখ। এই কি ছিল বিধিলিপি? রুমী। রুমী। তুমি কি কেবলই ছবি হয়ে রইবে আমার জীবনে? তুমি গেরিলা হতে চেয়েছিলে, গেরিলা হয়েছিলে। রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দ, ক্ষিপ্র পদসঞ্চারে আঘাত হানতে শত্রুকে, নির্ভুল লক্ষ্যে। শত্রুও একদিন নির্ভুল লক্ষ্যে আঘাত হেনে, রাতের অন্ধকারে তুলে নিয়ে গেল তোমাকে। আর কি ফিরে পাব না তোমাকে? তুমি যে সব সময় জীবনানন্দ দাশের কবিতার ভাষায় বলতে:

ফটোটা রাখলাম নীচতলায় বসার ঘরের কোণায় টেবিলে। আগামীকাল ঈদ। অনেক মানুষ আসবে ঈদ মিলতে। তারা সবাই এসে দেখবে— রুমী কেমন কোমরে হাত দিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে সদর্পে ঘোষণা করছে— আবার আসিব ফিরে— এই বাংলায়।

আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে— এই বাংলায়/ হয়তো মানুষ নয়— হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে,/ হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে/কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায়ায়/হয়তো বা হাঁস হব— কিশোরীর ঘুঙুর রহিবে লাল পায়/ সারাদিন কেটে যাবে কলমীর গন্ধভরা জলে ভেসে ভেসে।/আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ খেত ভালোবেসে/জলঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায়।

রুমী, তোমাকে আসতেই হবে আবার ফিরে।

চোখ মুছে ছবিটার নীচে একটুকরো কাগজে বড় বড় অক্ষরে লিখলাম: আবার আসিব ফিরে— এই বাংলায়। ফটোটা রাখলাম নীচতলায় বসার ঘরের কোণায় টেবিলে। আগামীকাল ঈদ। অনেক মানুষ আসবে ঈদ মিলতে। তারা সবাই এসে দেখবে— রুমী কেমন কোমরে হাত দিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে সদর্পে ঘোষণা করছে— আবার আসিব ফিরে— এই বাংলায়।

২০ নভেম্বর শনিবার ১৯৭১

আজ ঈদ। ঈদের কোনও আয়োজন নেই আমাদের বাসায়। কারও জামাকাপড় কেনা হয়নি। দরজা-জানালার পর্দা কাচা হয়নি, ঘরের ঝুল ঝাড়া হয়নি। বসার ঘরের টেবিলে রাখা হয়নি আতরদান। শরীফ, জামী ঈদের নামাজও পড়তে যায়নি।

কিন্তু আমি ভোরে উঠে ঈদের সেমাই, জর্দা রেঁধেছি। যদি রুমীর সহযোদ্ধা কেউ আজ আসে এ বাড়িতে? বাবা-মা-ভাই-বোন, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন কোনও গেরিলা যদি রাতের অন্ধকারে আসে এ বাড়িতে? তাদেরকে খাওয়ানোর জন্য আমি রেঁধেছি পোলাও, কোর্মা, কোপ্তা, কাবাব। তারা কেউ এলে আমি চুপিচুপি নিজের হাতে বেড়ে খাওয়াব। তাদের জামায় লাগিয়ে দেওয়ার জন্য একশিশি আতরও আমি কিনে লুকিয়ে রেখেছি।

২৬ নভেম্বর শুক্রবার ১৯৭১

ঘটনা যেন একটু দ্রুতই ঘটছে কিছুদিন থেকে। পূর্ব বাংলার চারধারে সবগুলো বর্ডারে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের চাপ যতই বাড়ছে, ঢাকার কাগজগুলোতে 'ভারতীয় হামলার' খবর ততই বড় কলামে ছাপা হচ্ছে। ২৩ তারিখ সকালে দৈনিক পাকিস্তান খুলে হঠাৎ চমকে গিয়েছিলাম। আট কলামজুড়ে বিরাট হেডলাইন: ভারতের সর্বাত্মক আক্রমণ।

আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়াই ভারত পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ চালিয়েছে। কয়েকমাসব্যাপী ছোট ছোট হামলা, ছোট বড় সংঘর্ষ এবং পূর্ব পাকিস্তানের চারদিকে সুপরিকল্পিতভাবে বারোটি পদাতিক ডিভিশন মোতায়েনের পর এই হামলা চালানো হচ্ছে।

তাই বুঝি চারদিকে এমন সাজসাজ রব

পড়ে গিয়েছে। ২৪ তারিখে পাকিস্তান সরকার দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে। ওইদিনই সন্ধ্যায় ছটা থেকে সাতটা পর্যন্ত ঢাকা নারায়ণগঞ্জ আর টঙ্গীসহ শহরের আশপাশের এলাকায় এক নিষ্প্রদীপ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। শহরের সর্বত্র পরিখা যে খোঁড়া হচ্ছে, সে খবরটাও ছবিসহ কাগজে ফলাও করে দেওয়া হয়েছে। আর প্রতিদিন বক্স করে কাগজে ছাপা হয়ে চলেছে বিভিন্ন আপ্তবাক্য। যেমন: 'যুদ্ধকালে নীরবতাই উত্তর আর বাচালতা বিষবৎ।' 'শান্ত থাকুন, নীরব থাকুন, আপনার গোপন কথা আপনার মধ্যে রাখুন।' 'গুজব তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের চাইতেও ক্ষতিকর।' ইত্যাদি।

যুদ্ধ-যুদ্ধ করে পাকিস্তান সরকার বড়ই বিচলিত হয়ে পড়েছে। কী করবে, কী না করবে বুঝে উঠতে পারছে না। গতকালের কাগজে ঘোষণা দেখলাম পরপর সাতদিন সন্ধ্যায় একঘণ্টা করে নিষ্প্রদীপ মহড়া হবে। আজকের কাগজেই সেটা বাতিল করে নতুন ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ২৪ তারিখ বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় হঠাৎ কারফিউ দেওয়া হল। শরীফ আর জামী ঢাকা ক্লাবে টেনিস খেলতে গিয়েছিল। সন্ধ্যার পর শরীফের একটা মিটিংও ছিল ক্লাবে। হঠাৎ দেখি সোয়া পাঁচটায় বাপবেটা বাসায় এসে হাজির। কী ব্যাপার? না, কারফিউ সাড়ে পাঁচটা থেকে! সেই সময় আইডিয়াল লাইব্রেরি থেকে রিয়াজ সাহেব এসেছেন বইয়ের লিস্ট নিয়ে। ঢাকা ক্লাব লাইব্রেরির জন্য বেশ কয়েকশো টাকার বই কেনা হবে। শরীফের মুখে কারফিউয়ের খবর পেয়ে ভদ্রলোক পড়িমরি করে ছুটলেন এলিফ্যান্ট রোডেই ওঁর এক বন্ধুর বাড়ি। আর কী আশ্চর্য। রাত সাড়ে ন'টাতেই কারফিউ উঠে গেল! এসব কী তামাশা হচ্ছে?

গতকাল সাড়ে বারোটার দিকে আবার শোনা গেল— বেলা একটা থেকে কারফিউ! অমনি সবখানে সব লোকে অফিস-আদালত ছেড়ে, দোকানপাট বন্ধ করে ছুটল বাড়ির দিকে। শেষে আর কেউ রিকশাও পায় না। ওরাও তো ছুটছে বাড়ির দিকে। আমি এগারোটার দিকে নিউ মার্কেটে গিয়েছিলাম। সাড়ে বারোটায় ভাবলাম মা'র বাসা হয়ে তারপর ফিরব। রাস্তায়

> আট কলামজুড়ে বিরাট হেডলাইন: ভারতের সর্বাত্মক আক্রমণ। আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়াই ভারত পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ চালিয়েছে। কয়েকমাসব্যাপী ছোট ছোট হামলা, ছোট বড় সংঘর্ষ এবং পূর্ব পাকিস্তানের চারদিকে সুপরিকল্পিতভাবে বারোটি পদাতিক ডিভিশন মোতায়েনের পর এই হামলা চালানো হচ্ছে।

দেখি সব কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা, খালি রিকশা ছুটে যাচ্ছে, সওয়ারির হাঁকডাক কানে নিচ্ছে না। লোকজন প্রায় দৌড়ের মতো ছুটে যাচ্ছে। আমি আর মা'র বাড়ি গেলাম না, গাড়ি ঘুরিয়ে চলে এলাম। কিন্তু খানিক পরেই শুনি কারফিউ নাকি দেওয়া হয়নি। ওটা মিথ্যে গুজব! মাইক দিয়ে সে কথা ঘোষণা করা হল, রেডিওর বিশেষ সংবাদ বুলেটিনে সেকথা প্রচার করা হল। কিন্তু তাতেও খালি জনপদ আর ভরে উঠল না! বেশ মজাই হল। একদিন সরকার বেটাইমে চার ঘণ্টার জন্য কারফিউ দেয়, পরদিন লোকে গুজবটাকেই সত্যি বলে ধরে নেয়। লোকের আর দোষ কী?

২৮ নভেম্বর রবিবার ১৯৭১

জীবন যে কত অনিশ্চিত, আক্ষরিক অর্থেই পদ্মপত্রে নীর— তা যেন এই সময়ই মনেপ্রাণে উপলব্ধি করছি। কত বছর ধরে কত সুন্দর সুন্দর চাদর, ওয়াড়, তোয়ালে, প্লেট, গ্লাস, কাপ, ডিশ, কাঁটাচামচ আলমারিতে তুলে রেখে দিয়েছি, ভবিষ্যতে কখনও কোনও বিশেষ উপলক্ষে বের করব বলে। রুমী-জামীকে প্রায়ই হাসতে হাসতে বলতাম, 'তোদের বউ এলে বের করব।' সেইসব বিশেষ উপলক্ষ আর কখনও আসবে কি? এখন যে প্রতিটি দিন বেঁচে রয়েছি, এটাই তো একটা বিশেষ ঘটনা। এর চেয়ে বড় উপলক্ষ আর কী হতে পারে? তাই আজ আলমারি খুলে সুন্দর সুন্দর চাদর, ওয়াড় বের করে সব ঘরের বিছানায় পেতেছি। দামি, সুদৃশ্য প্লেট, গ্লাস, কাপ, ডিশ, কাঁটাচামচ সব বের করে টেবিলে রেখেছি। শরীফ-জামী অবাক চোখে তাকাতে হেসে বললাম, 'মরে গেলে সাত ভূতে লুটে খাবে তার চেয়ে নিজেরাই ভোগ করে যাই।'

আগামীকালের 'ক্রাশ ইন্ডিয়া' দিবসের কথা ভেবে অনেকেই উদ্বিগ্ন। মিরপুর-মোহাম্মদপুরের বাসিন্দাদের মধ্যে এর প্রস্তুতি নিয়ে যেরকম জোশ দেখা যাচ্ছে তাতে বাঙালিরা অনেকেই ভয় পাচ্ছে। তাদের 'ভারত বিদ্বেষের' লাভা-স্রোতে ঢাকার বাঙালিরাও শেষমেষ তলিয়ে যায় নাকি, কে জানে? বহু অবাঙালির গাড়ির কাচে 'ক্রাশ ইন্ডিয়া' লেখা স্টিকার জ্বলজ্বল করছে। অনেক অবাঙালির দোকানে 'ক্রাশ ইন্ডিয়া' লেখা পোস্টার শোভা পাচ্ছে।

২৯ নভেম্বর সোমবার ১৯৭১

যতটা ভয় পাওয়া গিয়েছিল, ততটা খারাপ কিছু ঘটেনি। সকাল থেকে গাড়ি-রিকশা-বাস চলেনি। দোকানপাট বন্ধ ছিল— অবাঙালিদের-গুলো জোশে, বাঙালিদের-গুলো ভয়ে। এগারোটার দিকে লুলুকে সঙ্গে নিয়ে হেঁটে হেঁটে আজিমপুরে এক বাসায় গেলাম। পথে দুটো মিছিল দেখলাম। উর্দু, ইংরিজিতে 'ভারত বিধ্বস্ত' করার বেশ কয়েকটা শ্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড উঁচিয়ে মোহাম্মদপুরের দিক থেকে আসা মিছিল।

বারোটায় হরতাল শেষ। দেড়টার সময় বাসায় ফিরলাম রিকশা চড়ে।

মিছিল, মিটিং নাকি সন্ধে পর্যন্ত চলেছে।

আজ থেকে ঠিক তিরানব্বই দিন আগে পাক হানাদাররা রাত বারোটার সময় এসে আমার রুমীকে ধরে নিয়ে গিয়েছে।

১ ডিসেম্বর বুধবার ১৯৭১

আজ খুব ভোরে উঠতে হয়েছে। আট-দশদিন হল কেরোসিন উধাও বাজার থেকে। কোনও কোনও দোকানে নাকি কেরোসিন নিয়ে মারপিটও হয়েছে। সরকার তাই কেরোসিনের জন্য ন্যায্য মূল্যের দোকান খুলেছে। বুড়া মিয়াকে সকালবেলাতেই ঢাকা কলেজের উল্টোদিকে মিরপুর রোডের ন্যায্য মূল্যের দোকানে পাঠিয়েছি লাইন দিতে। শেষপর্যন্ত তেল পেলে হয়। আমার আর দু'দিন চলার মতো তেল আছে।

শরীফ অফিসে যাবে ন'টায়। আমি ওর সঙ্গে যাব। আমার সঙ্গে যাবে লুলু আর জামী। শরীফকে মতিঝিলে ওর অফিসে নামিয়ে আমরা স্টেডিয়াম-বায়তুল মোকাররমে কিছু কেনাকাটা করব। আজ ইচ্ছে করেই ড্রাইভারকে আসতে বলা হয়নি। শরীফ অফিস পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যাবে, তারপর সেখান থেকে আমি। যেতে যেতে গাড়ির ভেতর আলোচনা করে নিলাম কে কীভাবে কী কী কিনব। আমি প্রথমে দুটো সোয়েটার কিনব। তারপর আমি ঢুকব ওষুধের দোকানে। লুলু আর জামী আলাদা হয়ে অন্যদিকে অন্য দুটো ওষুধের দোকানে ঢুকে ওষুধ কিনবে। ওদের দুজনকে দুটো প্রেসক্রিপসান দিলাম। ওরা ওষুধ কেনা শেষ করে দুজনে দুটো আলাদা দোকান থেকে দুটো করে সোয়েটার কিনবে। তারপর গাড়ির কাছে যাবে। গাড়ি থাকবে স্টেডিয়ামে পাবনা স্টোরের সামনে।

এতসব ষড়যন্ত্রের কারণ গত সপ্তাহে এক সঙ্গে ছ'টা সোয়েটার কিনতে গিয়ে প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিলাম। জিন্না অ্যাভেনিউয়ে লম্বা ফুটপাত জুড়ে ছোট ছোট দোকানিরা চাদর বিছিয়ে তাদের দোকান সাজিয়ে বসেছে। ওদের কাছ থেকে মোটামুটি সস্তায় হাতকাটা সোয়েটার-মাফলার-মোজা এগুলো কিনতে শুরু করেছি সপ্তাহখানেক থেকে। আগে শুধু ওষুধ, সিগারেট আর টাকা পাঠাতাম। এখন শীত এসে গিয়েছে। গরম কাপড় দরকার। শরীফ বলেছে খুব ছোট ছোট প্যাকেট করতে। যাতে ছেলেদের নিতে সুবিধে হয়। যাতে কেউ সন্দেহ না করে। তাই আমি খুব ছোট ছোট প্যাকেট করি— একটা সোয়েটার, একটা মাফলার, একজোড়া মোজা। অবশ্য মোজা যে খুব

কাজে লাগে, তা নয়। বেশিরভাগ মুক্তিযোদ্ধার জুতোই নেই। তবু মোজাও কিনি। মোজা দিই। অন্তত নিজেকে তো ভোলানো যায়— আমার ছেলেরা এই শীতে জুতো-মোজা পরে যুদ্ধ করছে।

গত সপ্তাহে একসঙ্গে ছ'টা সোয়েটার দর করছি, এমন সময় ফুটপাতে টহল দিতে দিতে এক মিলিটারি আমার পাশে দাঁড়িয়ে গেল, 'এতনা সুয়েটার খরিদিতা মা'জী? কেয়া, জওয়ান লোগোঁকে লিয়ে?'

আমার হৃৎপিণ্ড গলার কাছে লাফিয়ে উঠে এল, তবু মুখে হাসি টেনে বললাম,

পথে দুটো মিছিল দেখলাম। উর্দু, ইংরিজিতে 'ভারত বিধ্বস্ত' করার বেশ কয়েকটা শ্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড উঁচিয়ে মোহাম্মদপুরের দিক থেকে আসা মিছিল।

'জি বাবা, আখবার মে বেগম লিয়াকত আলী কহা হ্যায় না— জওয়ান লোগোঁকে লিয়ে সুয়েটার, টাওয়েল, সাবুন, বিলেড, টফি, চুয়িংগাম— ইয়ে সব খরিদ করকে আপওয়া অফিস মে ভেজনা। আপ জানতে হো, আপওয়া কিসকা আপিস হ্যায়? উয়ো যো অল পাকিস্তান উইমেন্স অ্যাসোসিয়েশান—'

'অল পাকিস্তান' শব্দটার ওপর বেশ জোর দিয়ে বললাম। বেটা কী বুঝল জানি না, 'জরুর জরুর' বলে মাথা নাড়তে নাড়তে চলে গেল।

আমার বুক ধড়ফড় করছিল। তবু ভাগ্যি, কয়েকদিন আগে খবর কাগজে বেগম লিয়াকত আলীর এই খবরটা দেখেছিলাম। আরও ভাগ্যি যে, কথাটা ঠিক সময়ে মনেও পড়েছিল।

সেদিন আমার আর সোয়েটার কেনা হয়নি।

২ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ১৯৭১

আজ সারাদিন বেরোইনি। গতকালকার কেনা জিনিসপত্রগুলো দিয়ে ছোট ছোট প্যাকেট বানিয়েছি কিন্তু কেউ আসেনি কিছু নিতে। অবশ্য আজকেই কেউ আসবে, এমন কথাও তো কেউ দিয়ে রাখেনি। তবু ভেতরে ভেতরে কে যেন বলছিল, কেউ আসবে। আমার অনুমান সত্য হল না। আতিকুল ইসলামের সঙ্গে ফোনে কথা হল দুপুরে। ওর কিছু ওষুধের প্যাকেট নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। ও-ও জানাল বেশ কিছুদিন হয় ওর কাছেও কেউ আসছে না। আমি বললাম, 'অন্তত আমার কাছ থেকে প্যাকেটগুলো নিয়ে তোমার বাসায় রাখ। হঠাৎ এসে পড়লে যাতে দিতে পার।'

'আচ্ছা বুবু, তাই করব।' বলে ফোন রেখে দিল আতিক। কিন্তু আসেনি।

৩ ডিসেম্বর শুক্রবার ১৯৭১

আজকেও কেউ আসেনি। না আসার কারণও অনুমান করছি। দেশের আবহাওয়া বড়ই উত্তপ্ত। চারধারে বর্ডার ঘিরে যুদ্ধও বেশ জোরেশোরে লেগেছে। সবগুলো খবর কাগজে মোটা হেডলাইন দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন সীমান্তে 'ভারতের আক্রমণের' নিন্দাসূচক খবর ফলাও করে বেরচ্ছে। আমরা স্বাধীন বাংলা বেতার,

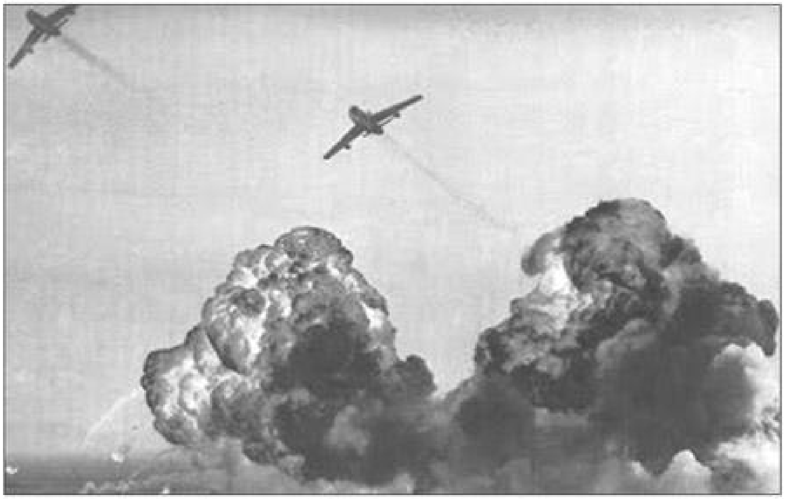

আকাশবাণী, বিবিসি'র খবর শুনে সব খবর চালাচালি করে বুঝে নিই মুক্তিবাহিনী কোথায় কতটা এগোচ্ছে, পাকবাহিনী কোথায় কতটা মার খাচ্ছে। শরীফ রোজ ইংরিজি বাংলা চার-পাঁচটা খবর কাগজের খবর বিশ্লেষণ করে। সে কদিন ধরেই বলে চলেছে, 'দ্যাখো না, ঢাকাতেও যুদ্ধ বাঁধল বলে। রংপুর, দিনাজপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, ফেনী, সিলেট— সব জায়গায় যেভাবে যুদ্ধ চলছে, তাতে মুক্তিবাহিনীর ঢাকায় ঢুকে পড়তে আর দেরি নেই।'

শরীর ভালো ছিল না। তাই রাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিলাম। আমার দেখাদেখি বাড়ির অন্যরাও। রাত দুটোর দিকে হঠাৎ বিমান-বিধ্বংসী কামানের ট্রেসার মারার ফটাফট শব্দে জেগে গেলাম। কী হচ্ছে, ঠিক যেন বুঝতে পারছিলাম না। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি— শূন্যে আলোর ফুলঝুরি। বুঝলাম সারাদিন যে যুদ্ধের সম্ভাবনার কথা নিয়ে সবাই চনমন করেছে, তাই সত্যি হতে চলেছে। খুব উত্তেজনা বোধ করলাম মনের ভেতরে, সে অনুভূতি যেন ছড়িয়ে পড়ল শরীরেরও পরতে পরতে। আর শুয়ে থাকতে পারলাম না। উঠে বাবার ঘরে গেলাম, সন্তর্পণে, পা টিপে টিপে। উনি ঘুমোচ্ছেন, জামী জেগে খাটে বসে আছে। আমাকে দেখে নিঃশব্দে উঠে আমার সঙ্গে এ ঘরে এল। দুই ট্রেসারের অগ্নিঝলকের মধ্যবর্তী সময়টা কী নিকষ কালো। হঠাৎ খেয়াল হল, গভীর রাতে ঢাকা তো কখনও এত অন্ধকার থাকে না। রাস্তার বাতির জন্য একটা আবছা

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। ভয়ানক ক্কড় ক্কড় ক্কড় ক্কড় শব্দে দশদিগন্ত ঝালাপালা করে প্লেন উড়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে এয়ার রেইড সাইরেন বাজছে, রেডিওতে নানারকম ঘোষণা, সাবধানবাণী প্রচারিত হয়ে চলেছে।

আলোময় আভা ফুটে থাকে ঢাকার আকাশে। আজ কী হল? তখন লক্ষ করলাম, আমাদের বাসার সামনের বাতিগুলো জ্বলছে না। পিছনের ঘরের জানালা দিয়ে বলাকা বিল্ডিংয়ের দিকে তাকালাম, সেদিকেও কোনও আলোর আভা নেই। তাহলে কি ব্ল্যাক আউট দেওয়া হয়েছে?

বাকি রাতটা আর ঘুম এল না। শরীফ, জামী, আমি তিনজনে বিভিন্ন ঘরের বিভিন্ন জানালা ও বারান্দাতে ঘুরে ঘুরেই কাটিয়ে দিলাম।

৪ ডিসেম্বর শনিবার ১৯৭১

ছটা বাজতে না বাজতে ফকিরকে ফোন করলাম। এসব ব্যাপারে সে গেজেট। তার কাছে জানলাম: গত রাতেই ঢাকা রেডিওতে ব্ল্যাক আউটের কথা ঘোষণা করেছে। গতকাল বিকেলে সাড়ে চারটেয় ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী পশ্চিম পাকিস্তানের শিয়ালকোট, চাম্ব, লাহোর, রহিমইয়ারখান, পুঞ্জ, উরি সেক্টর— এসব জায়গায় স্থল ও বিমান আক্রমণ শুরু করে। সুতরাং পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীকেও বাধ্য হয়ে আত্মরক্ষার জন্য ভারতীয় সীমান্তবর্তী স্থানসমূহে পাল্টা আক্রমণ করতে হয়। অল ইন্ডিয়া রেডিও অবশ্য বলেছে, পাকিস্তানই প্রথম আক্রমণ করেছে সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায়। তারা সুলেমানকি, খেমকারান, পুঞ্জ, অমৃতসর, পাঠানকোট, শ্রীনগর, যোধপুর, আম্বালা, আগ্রা— এসব জায়গায় স্থল ও বিমান হামলা চালিয়েছে।

প্রথম আক্রমণ যেই করে থাকুক না কেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। তাহলে সত্যি সত্যি যুদ্ধ লেগেছে? প্রমাণও পেয়ে গেলাম সকাল একটু ফুটতে না ফুটতেই। ভয়ানক কড় কড় কড় কড় শব্দে দশদিগন্ত ঝালাপালা করে প্লেন উড়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে এয়ার রেইড সাইরেন বাজছে, রেডিওতে নানারকম ঘোষণা, সাবধানবাণী প্রচারিত হয়ে চলেছে।

আজ আর অন্য কোনও কাজ নয়। রেডিও, টেলিফোন আর খবর কাগজ। রেডিও শুনছি আর একে ওকে ফোন করছি। একজনের কাছে পুরো খবর পাওয়া সম্ভব নয়। তাই বিভিন্নজনকে ফোন করে টুকরো টুকরো খবর সংগ্রহ করছি। কেউ আকাশবাণী শুনেছে, কেউ বিবিসি, কেউ রেডিও অস্ট্রেলিয়া, কেউ রেডিও পাকিস্তান।

গতকাল সন্ধ্যায় ভারতের রাষ্ট্রপতি দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি গতকাল মধ্যরাতের কিছু পরে এক বেতার ভাষণে দেশবাসীকে জানান যে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আজ এক বেতার ভাষণে দেশবাসীকে জানিয়েছেন যে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

কে যে কার বিরুদ্ধে 'প্রথম' যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, তা নিয়ে মতদ্বৈধতা থাকলেও

'কী অবাক কাণ্ড! চারদিকে সবগুলো বাড়ির ছাদে লোক বোঝাই। সবাই প্লেন দেখছে।'
যতই লোকে বলুক যে, ভারতীয় বিমান সিভিলিয়ানের ওপর বোমা ফেলবে না, তবু, অত উঁচু থেকে কি সিভিলিয়ান-মিলিটারি হিসেব করে বোমা ফেলা যায়? যুক্তি দিয়ে ওদের বাইরে যাওয়া বন্ধ করলাম বটে কিন্তু আমার নিজেরই যে বাইরে যেতে ইচ্ছে করছে।

'যুদ্ধ' যে লেগেছে তাতে কোনওই সন্দেহ নেই। জলজ্যান্ত প্রমাণ: ঢাকার আকাশে ভারতীয় বিমানের কর্ণবিদারী আনাগোনা।

ন'টার দিকে লুলু এল, উত্তেজিত গলায় বলল 'মামি কী যে অবাক কাণ্ড! এয়ার রেইড সাইরেন শুনে লোকে দৌড়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসছে।'

আমি অবাক হলাম, 'সে কী? সাইরেন শুনে তো সিঁড়ির নীচে মাথা গুঁজে বসার কথা।'

'সবাই কী বলছে জানেন? ইন্ডিয়ার প্লেন নাকি সিভিলিয়ানদের ওপর বোমা ফেলবে না। ওদের লক্ষ্য কেবল ক্যান্টনমেন্ট আর এয়ারপোর্ট। তাই সবাই 'যুদ্ধ দেখতে' রাস্তায় বেরিয়ে আসছে।'

জামী ছাদে গিয়েছিল, নেমে এসে বলল, 'কী অবাক কাণ্ড! চারদিকে সবগুলো বাড়ির ছাদে লোক বোঝাই। সবাই প্লেন দেখছে।'

লুলু চেঁচিয়ে উঠল, 'শুনলেন মামি? শুনলেন? যা যা বলেছি, ঠিক কি না? সবাই যুদ্ধ দেখতে ছাদে দৌড়চ্ছে, রাস্তায় নামছে।'

সত্যি, আজব ব্যাপার! আমিও সারাদিন ধরে রান্নাবান্নার ফাঁকে ফাঁকে আকাশযুদ্ধই দেখলাম। শরীফ আর জামী একবার বেরতে চেয়েছিল, আমি দিইনি। যতই লোকে বলুক যে, ভারতীয় বিমান সিভিলিয়ানের ওপর বোমা ফেলবে না, তবু, অত উঁচু থেকে কি সিভিলিয়ান-মিলিটারি হিসেব করে বোমা ফেলা যায়? আমার একটি ছেলে পাক আর্মির খপ্পরে গিয়েছে, বাকিটাকে আর বোমার ঘায়ে হারাতে চাই না। যুক্তি দিয়ে ওদের বাইরে যাওয়া বন্ধ করলাম বটে কিন্তু আমার নিজেরই যে বাইরে যেতে ইচ্ছে করছে।

এই প্লেনের কড়কড়ানির মধ্যেই বুড়া মিয়া বাজার করে এনেছে। রান্নাঘরে গেলাম ওকে সাহায্য করতে। ও বেচারা আজ একা পড়ে গিয়েছে। রেণুর মা, রেণু কেউই আসেনি। বোধহয় বাড়ি বসে সবার সঙ্গে মজা করে প্লেন দেখছে। শরীফ আর জামী বাইরে যেতে না পেরে আবার ছাদে উঠে গিয়েছে। রান্নার কাজ কিছুটা এগিয়ে দিয়ে আমিও ছাদে গেলাম। আমার মাকে দেখে জামী উত্তেজিত গলায় বলে উঠল, 'মা মা, এমন একটা ডগ ফাইট হয়ে গেল না!'

'ডগ ফাইট কী?'

'ডগ ফাইট? ডগ ফাইট হল— মানে— দুটো প্লেন আকাশে একে অন্যের সঙ্গে ফাইট করে। রাস্তায় যেমন দুটো ছেলে মারামারি করে, সেইরকম আর কি! প্লেন দুটো একে অন্যকে জখম করে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করে।'

'তা আমাকে ডাকলি না কেন?'

'হুঁ! তোমাকে ডাকতে নীচে যাই আর ডগ ফাইটটা মিস করি আর কী!'

'তা কী হল শেষপর্যন্ত? কে মরল?'

'কেউ না। পাকিস্তানি প্লেনটা না পেরে ভয়ে পালিয়ে গেল যে!'

এরপর ডগ ফাইট দেখার প্রত্যাশায় আমিও কয়েকবার ছাদে উঠলাম কিন্তু আর চোখে পড়ল না। কারণ ডগ ফাইট তো ঘনঘন হয় না। সব পাইলট করতে পারে না। খুব বেপরোয়া, দুঃসাহসী, জেদী পাইলটরাই জীবন বাজি রেখে ডগ ফাইটে লাগে। কারণ ওই পাইলটরা জানে— প্লেন জখম হওয়া মানেই প্লেনে আগুন ধরে যাওয়া, আর প্লেনে আগুন ধরে গেলে সব পাইলট যে প্যারাসুট নিয়ে ঝাঁপিয়ে বের

হতে পারবে, তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্লেনের সঙ্গে পাইলটও ধ্বংস হয়ে যায়।

তিনতলার ছাদে বারবার উঠতে হাঁফ ধরে যায়। শরীফ আর জামী কেমন সকালের নাশতাটা খেয়েই রেডিওটা বগলে করে, গুটিগুটি ছাদে উঠে গিয়েছিল। দুপুরে ভাত খেয়েও তাই করল। আমার তো হাজারটা কাজ— শ্বশুরের দেখাশোনা, তার ওপর বালবে কাগজের টোপর পরাতে হবে— কারণ 'পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ঢাকা নগরীতে প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত পূর্ণ নিষ্প্রদীপ পালিত হবে।' —খবর কাগজে সরকারি নির্দেশ। জানালার কাচে কাগজের ফালি আঠা দিয়ে সাঁটতে হবে, বোমা পড়লে যাতে কাচ ভেঙে ছিটকে ঘরে ছড়িয়ে লোকজন জখম না করে। এসব কাজ কি একা হাতে করা সম্ভব? ওরা নামে না। ওদের স্বার্থপরতায় রাগ হয় কিন্তু বেশিক্ষণ থাকে না।

লুলু এসেছে। ভাত খাওয়ার পর ওকে নিয়েই কাজে ডুবে গেলাম। ও রান্নাঘরে গিয়ে ময়দার লেই বানাল, আমি খবর কাগজের ফালি কাটলাম, তারপর দুজনে মিলে বসার ঘরের জানালার কাচে সাঁটলাম। দেয়ালে বসানো ব্র্যাকেট থেকে বালবগুলো খুলে শুধু দুটো সিলিং থেকে ঝোলানো বালব রাখলাম। সেখানে পঁচিশ পাওয়ারের বালব লাগিয়ে খবর কাগজের টোপর বানিয়ে পরিয়ে দিলাম। এসব কাজ শেষ হতে হতে দিনের আলো ফুরিয়ে এল। আজ আবার রেডিওতে বলেছে— সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত কারফিউ, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া অবধি। লুলুকে বললাম, 'এখন বেরোন সেফ হবে না। আজ থেকে যা।' লুলু রাজি হল না, 'না মামি, ভাই-ভাবী তাহলে খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে যাবে। ফোনও নেই যে জানিয়ে দেব। ভাববেন না, কাছেই তো, ঠিক চলে যাব। এখনও খানিক দেরি আছে অন্ধকার হতে।' লুলু প্রায় দৌড়েই চলে গেল। ভূতের গলিতে ওর ভাইয়ের বাসা।

ক্রমশ

দেয়ালে বসানো ব্র্যাকেট থেকে বালবগুলো খুলে শুধু দুটো সিলিং থেকে ঝোলানো বালব রাখলাম। সেখানে পঁচিশ পাওয়ারের বালব লাগিয়ে খবর কাগজের টোপর বানিয়ে পরিয়ে দিলাম। আজ আবার রেডিওতে বলেছে— সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত কারফিউ।

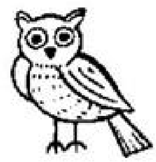

বইমেলায় ২৭৮নং স্টলে

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
আমাজনের জঙ্গলে

আমাজন ঘুরে এসে লেখা বিস্ময়কর কিশোর উপন্যাস।
সপ্তম মুদ্রণ। ₹৭০

'শৈশবের এমন জাদুছবি, সেইসঙ্গে অরণ্য ও অরণ্যবাসী মানুষজনের এমন পরিচয়, এ যেন মনে পড়ায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। গল্পের সঙ্গে সঙ্গে এত সত্য কথা যাতে আছে, সেই বইটি ভারতের নানা ভাষায় অনুবাদ হোক। সকল ভাষার শিশুরা পড়ুক।'

মহাশ্বেতা দেবী, আজকাল

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, **বলাকা বুক স্টল** (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

অনলাইনেও পাবেন: www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ **ফ্যাক্স:** ২২৮৭-৬৪৪৮ **ই-মেল:** info@swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষরের বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন: www.swarnakshar.in

গ্রিক কথামৃত

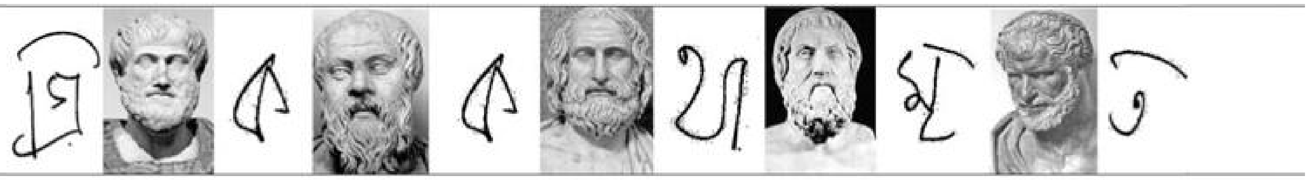

সংকলক ও অনুবাদক

কালীকৃষ্ণ গুহ

পর্ব ২

আধুনিক সভ্যতার বা ঐতিহাসিক পাশ্চাত্য সভ্যতার শুরু বলা যায় গ্রিসে। ভারত, চিন ও এশিয়ার প্রাচীনতর সভ্যতাগুলির পরিপূর্ণ চেহারা লিপিবদ্ধ নয় বলে সেইসব সভ্যতাকে পৌরাণিক বা প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা বলাই হয়তো সংগত। প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা, যা আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিভূমি, তা গড়ে উঠেছিল বলা যায় ৭০০ খ্রিঃ পূঃ সময়ে— এক অন্ধের কাব্যপাঠে। মহাকবি অন্ধ হোমার এক-একটা জনপদে পৌঁছে সারাদিন দাঁড়িয়ে তাঁর কাব্য আবৃত্তি করতেন— গ্রিকদের জয়ের কাহিনি— ইলিয়াড ও ওডেসি। অজস্র দ্বীপে বিভক্ত একটা অঞ্চল বা একটা ছোট ভূ-ভাগ গ্রিসদেশ হিসেবে পরিচিত হয় পরে। জ্ঞানচর্চায় শ্রেষ্ঠ দ্বীপরাজ্য বা নগররাজ্যটি ছিল আথেন্স। যেমন যুদ্ধচর্চার শ্রেষ্ঠ স্থান ছিল স্পার্টা। এই আথেন্সে জন্মেছিলেন একের পর এক মহাজ্ঞানী লেখক, ভাবুক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, ঐতিহাসিক, রাষ্ট্রনায়ক। বিভিন্ন সময় তাঁরা যে সকল উক্তি করেছিলেন সেইসব কথা বা কথামৃত আজও মনে হয় অব্যর্থ। বিভিন্ন বিষয়ে ভাগ করে এই জ্ঞানীদের উক্তিগুলির সংকলন ও অনুবাদ করেছিলাম একসময়। উক্তিগুলি এতই শক্তিশালী ও মহৎ যে অনুবাদের অনুবাদেও তা মহৎ থেকে গিয়েছে, এই আমাদের বিনীত ধারণা। মনে রাখা যায় যে, প্রাচীন গ্রিক মনীষীদের জ্ঞানেরই ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল ইউরোপের রেনেসাঁস বা নবজাগরণ, প্রায় দেড় হাজার বছর পর।

সা হ স

সাহসী হৃদয় মুষড়ে পড়ে না।
সোফোক্লিস

শারীরিক শক্তি জিনিসটা দেহের সাহায্যে আত্মার গতিবিধি।
সোক্রেটিস

সাহসীরা শ্রম করতে অনীহা বোধ করে না, ভীতদের সবকিছুতেই অনীহা।
ইউরিপিডিস

যারা সাহসের সঙ্গে বিপদের মুখোমুখি হতে পারে না, তারা আক্রমণকারীদের দাসে পরিণত হয়।
অ্যারিস্টটল

স্পার্টার সৈন্যরাই স্পার্টার দেয়াল।
স্পার্টার রাজা দ্বিতীয় অজেসিলাউস

একজন সৎ মানুষ কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করার সময় ভয় পায় আর সবগুলি বিষয়ই ভেবে নেয়, কিন্তু তা সম্পাদন করার সময় সাহসী ভূমিকা নেয়।
হেরোডোটাস

নিজেকে সমস্ত রকমভাবে সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করবে, কিন্তু যদি যুদ্ধের মুখোমুখি হতেই হয়, তাহলে জীবনকে সম্মানের সঙ্গেই ক্ষমা করার চেষ্টা করবে, অপমানের সঙ্গে নয়; মৃত্যু তো প্রত্যেকের জন্য অবধারিত, কিন্তু মহৎ কাজের জন্য মৃত্যুবরণ করা বিশেষ সম্মানের ব্যাপার বলে জানবে।
আইসোক্রেটিস

একজনের শারীরিক পরিশ্রমক্ষমতা যেমন অন্য একজনের থেকে বেশি হতে পারে, তেমন একজনের মনের ক্ষমতা অন্য একজনের থেকে বেশি হতে পারে। আমি দেখেছি একই রকম ব্যবস্থায় গড়ে-ওঠা মানুষের মধ্যে সাহসিকতার বিরাটরকম পার্থক্য থাকে।
সোক্রেটিস

প্র তা র ণা

চেহারা অনেক সময়ই প্রতারণা করে।
ইশপ

আমি প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতককেই ঘৃণা করতে শিখেছি, আর বিশ্বাসঘাতকতার থেকে বেশি থুতু দেওয়ার মতো কোনও অসুখ নেই।
এ্যাসকাইলাস

ম নে র দৃ ঢ় তা ও ই চ্ছা

কথা কাজের ছায়া ছাড়া কিছু নয়।
ডিমোক্রিটাস

বিপদের সময়ই বোঝা যায় একজন মানুষ কী।
এপিক্‌টেটাস্‌

তোমার ইচ্ছের স্বাধীনতা কী দামে বিক্রি করবে তা ভেবে দেখো, কিন্তু ভাই সস্তায় তা বিক্রি কোরো না।
এপিক্‌টেটাস্‌

মেনে নাও, সহ্য করো।
এপিক্‌টেটাস্‌

সাহস কী তা জানা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য সাহসী হওয়া; ন্যায় কী তা জানা নয়, উদ্দেশ্য ন্যায়নিষ্ঠ হওয়া; সেইভাবে আমাদের উদ্দেশ্য স্বাস্থ্যবান হওয়া। স্বাস্থ্য জিনিসটা কী তা জানা নয়।
অ্যারিস্টটল

সম্পদ বা সৌভাগ্য অনিশ্চিত জিনিস, ইচ্ছাশক্তির কোনও অনিশ্চয়তা নেই।
এপিকিউরাস

যদি কোনও মানুষের ইচ্ছাশক্তি সুবিবেচিত না হয়, তাহলে তা-ই হয়ে দাঁড়ায় তার জীবনের সবথেকে বড় দুর্বলতা।
এ্যাসকাইলাস্‌

শুরু করাটাই একটা কাজের অর্ধেকটা করে ফেলার বেশি।
অ্যারিস্টটল

একটা যুক্তিকে তার আকার বা উচ্চতা দিয়ে মাপা যায় না, তাকে মাপতে হয় তার ভিতরের নীতিবোধ দিয়ে।
এপিকটেটাস্‌

সা ম্য

আইনগতভাবে একজন মুক্ত মানুষ, অন্যজন দাস। কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে তাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। সেই কারণে ওই (প্রভু-দাস) সম্পর্ক ন্যায়সঙ্গত নয়। বরং তা সন্ত্রাসমূলক।
অ্যারিস্টটল

সমস্ত মানুষই বিশ্বাস করে যে ন্যায়বিচারের ভিত্তি সাম্য।
অ্যারিস্টটল

এটা পরিষ্কার যে-কোনও একটা বিশেষ দিক থেকে নয়, বহু দিক থেকেই সাম্য আর বাক্‌স্বাধীনতা মঙ্গলজনক।
হেরোডোটাস্‌

একজন ক্রীতদাসের শিল্পনৈপুণ্য নিহিত থাকে তার প্রভুকে পরিচালনা করার মধ্যে।
ডায়োজিনিস অব সিনোপ

মানুষের মধ্যে সাম্য কোনওদিনই খুঁজে পাওয়া যাবে না।
ইউরিপিডিস্‌

ভ য়

কাপুরুষদের যুদ্ধে থাকা-না-থাকা সমান, তারা যুদ্ধে থেকেও থাকে না।
ইউরিপিডিস

অধিকাংশ মানুষ ভয়ের দ্বারা অভিভূত হয়, ভক্তিতে নয়। তারা খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকে শাস্তির ভয়ে, কাজটা খারাপ বলে নয়।
অ্যারিস্টটল

কাপুরুষ বীরকে বলে দুঃসাহসী, দুঃসাহসী তাকে (বীরকে) বলে কাপুরুষ।
অ্যারিস্টটল

যে ভিতু প্রকৃতির, তার সাবধানি হওয়ার দরকার কী?
মিনানডার

তোষামুদি

তোষামোদকারীদের ঘৃণা করা উচিত, যেমন প্রতারকদের করা হয়। যেহেতু উভয়েই যারা তাদের বিশ্বাস করে, তাদের তারা আঘাত দেয়।
আইসোক্রেটিস্‌

স্বাধীনতা

জিউস (প্রধান দেবতা) ছাড়া কেউই স্বাধীন নয়।
এ্যাসকাইলাস

একজনের সত্য-বলা দেখে বুঝতে পারবে, যে লোকটি স্বাধীন।
মিনানডার

আগামী সংখ্যায় আরও

মানবমুখের স্কেচ: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

চিঠিপত্রে কমলকুমার

পর্ব : ১

সুব্রত চক্রবর্তীকে লেখা

১

স্নেহের সুব্রত,

তোমার প্রত্যেকটি পত্র আমি পাইয়াছি। কিন্তু সময় মত উত্তর দিতে পারি নাই কারণ তোমাকে উত্তর দেওয়ার নিমিত্ত যে মনস্কতা লাগে এতদিন তাহা ছিলই না; যে এখনও তাহা যে আছে, ইহার নিশ্চয় নাই। তোমার দ্বিতীয় পত্র আমাকে মর্ম্মাহত করিয়াছে যে প্রত্যেক কবি মানে আদতে পদ্যকাররা বড়ই ষড়রিপুকাৎ। অবশ্য অনেকেই আছে যাহারা বলিবে যে পরশ্রীকাতরতা, অদ্যকার মনুষ্যত্ব! তবু আমাদের খারাপ লাগে! ইহা খুবই স্বাভাবিক এবং খুবই safest ব্যাপার। ইহাতে একের প্রতিভা লইয়া ঘাঁটানোর দায় থাকে না, কেননা একের প্রতিভা talent এ নাড়া দিলে নিজেরও নড়িবে। পরশ্রীকাতরতার কারণও যথেষ্ট। আবাল্য অনেকেরই কোন গর্ব্ব বা গৌরব নাই, না পারিবারিক না আর্থিক! high society ইহাদের নিকট হইতে অনেক দূর, high society বলিতে রুজ আর লিপস্টিক বলিতেছি না। যেমনটি বর্ণিত দেখি লক্ষ্মীর পাঁচালীতে আছে 'স্বামীর আগেতে খায় রুজ মাখে গালে'।

আমার নিজের দেখিয়াছি অতীব মাত্রায় hatred, ঘৃণা আছে ও দুর্দ্ধর্ষ হিংসাবৃত্তি আছে। এমত বৃত্তির জন্য আমি নিজেই বড় নার্ভাস। অবশ্য হিংসা বলিতে তুমি নিশ্চয় ছ্যাঁচড়ামি বুঝিবে না! নিজেই ক্রমে আমি ironical; আমাকে শান্ত করিবার নিবন্ধন অদ্য কুসুমাদি ফুটিতেছে! যে এবং আমি বলিয়া থাকি শালারা, আবার ফুটিয়াছে! টডে পড়িয়াছি যে রাজপুতরা হাওয়ার সহিত লড়াই করে, বেগে হাওয়া দিলে তরওয়াল খুলিয়া ফেলিয়া থাকে। অবশ্য নিশ্চয়ই মানিবে আমার অর্থকষ্ট আছে কিন্তু পরশ্রীকাতরতা নাই, ঠাকুর আমাকে সান্ত্বনা দিবার কারণে ইতিপূর্বে মুঘোল splendour কে ধূলিস্মাৎ করিয়াছেন, সমগ্র ইজিপ্ত এসিরিয়াকে কিউরিও-তে (curio) পরিণত করিয়াছেন! একদা আমরা firpo-র বারান্দায় বসিয়া বহুদূরে সন্ধ্যার আকাশ দেখিয়া টাই-এর নট আলগা করিয়াছি। গায়ে Lyon silk এর polka dot দার shirt অস্তগামী সূর্যের রেশ দেখিয়াছি! আজও মনে পড়ে manton কোম্পানীর লাল চামড়া (!) ছোট ডায়েরীতে (বন্দুকের দোকান হইতে ডায়েরীটি প্রাপ্ত! উহাতে গুলি ও বন্দুকের হিসাব ছিল। কোন ইংলিশ Gun-maker এর) appointment করিতে থমকাইয়াছি! রোজ আমি ঠাকুরকে ডাকি যে ঐ মনোবৃত্তি ঠিক নহে অর্থাৎ হিংসা! ঘৃণা! তবু দেখি ঠিক শালা যে কে সেই এতটুকু হেল দোল নাই— ইহারেই ঠাকুর বলেন অহঙ্কার! ও শালা

যাইবার নহে।

কিন্তু মুস্কিল হইল লেখার ব্যাপারে। লেখাতে ক্রমান্বয় যখনই নাগরিকদের লইয়া— অর্থাৎ এক সময়কার লোক গল্প দরকার। তখন তাহারা মজার হয়। যথা পিঞ্জরে বসিয়া শুকে। এখানে একটা জমায়েত এর (part র) কথা আছে। যাহারা নূতন order এ (দেশের পরিবর্ত্তন বলিব না) আসিতেছে! তাহারা এতাবৎকর ভব্যতা লজ্জাকে উৎখাত করিতে চাহিতেছে (বিশেষত স্ত্রী পুরুষ সম্পর্ক, অবশ্য ইহার ঐ সূত্রের আরও অন্য aspect আছে।) যে তাহারা নির্লজ্জ হইতে চাহিতেছে সমাজকে ভাঙ্গিতেছে। আমাদের সমাজ বলিয়া খুব একটা পাশ্চাত্য ধরণের কিছু ছিল না (তর্ক উঠিতে পারে) আমরা ধর্ম্মপরায়ণ ছিলাম! আমাদের ভক্তি রূপে বৃত্তি ছিল। তাহাকে নির্লজ্জতায় উড়াইতেছে! এই অংশ খেলাইতে আমার দম বন্ধ হইতেছে। শুধু তত্ত্বলেখা হইলে সহজ হইত হয়ত! সর্ব সময় একটা satire এর মনোভাব আমাকে কব্জা করিতেছে। বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন (ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কে) বিশুদ্ধ রসিকতা! অতুল গুপ্ত মহাশয় লড়াই-এর কবিদের অর্থাৎ বিষ্ণু দে সুধীন দত্ত ইত্যাদি সম্পর্কে বলেন— বিশুদ্ধ ইয়ার্কি। এই সমালোচনাটিতে আমার খুব আতঙ্ক! আমরা ইয়ার্কি করিতেছি নাকি! অথচ শরৎ চাটুজ্জে দেখ অদ্ভুত! দারুণ কবি! গিরিশবাবুকে দেখ দারুণ কবি। আমরা যেখানে দুর্বল সেখানে ফরাসী ভাবিতেছি— অবশ্যই নিজেদের ফষ্টি বাঁচাইতে চাহি— অর্থাৎ ফরাসী সাহিত্যিকেরা কি করে!

এখন আমাদের উপায় এই তমোগুণের মোড় ফিরাইয়া দেওয়া তাহাকেই ভক্তিপথে চালিত করা। এবং এই উপযুক্ত সমাবেশ, মদীয় গল্পের, আমি যে cult বলিতে কি বুঝিতে চেষ্টা করি তাহা আরোপ করিতে চেষ্টা করিব। আমরা যদি বোবা হইতাম তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় ভাল লিখিতাম যেমন painter-র আবার তখনই ভাবি, গীত ত মানুষে পারে। মানুষের অতীব সাধারণ পদক্ষেপ, ছুটাছুটি, চাহনি কি অমোঘ নদী-পথে নৃত্য হইয়াছে! তবে কেন ঠাকুর ইহা করিবেন না! গীতকার বা অদ্ভুত স্বরে নৃত্যবিদরা অনৈসর্গিক স্পন্দনে আমরাও হয়ত অলৌকিক ক্রমিক-এ পৌঁছাইব!

ফলে আমি লেখা লইয়া যথার্থই ন্যাজে গোবরে আছি।

সেদিন তোমার চিঠিতে বেগম সাহেবার গল্প আমাকে বড় মুগ্ধ করিয়াছে, সমস্ত কিছুতে একটা হাই-তোলার আরাম আছে। আমি আমার পয়চানিমহলে অনেককে করিয়াছি সকলেই সেই জায়গায় যাইতে চাহে! তুমি এইরূপ (কাহিনী শুধু নয়) ভ্রমণবৃত্তান্ত যদি সময়ক্ষেপের জন্য লিখ তাহা হইলে খুব ভাল হয়— কারণ লেখাও একরূপ তাঁহাকে ডাকা। আমি ঐদিন ইন্দ্রর দোকানে যাই। তারাপদ[১] ও নবাগত উৎপলের[২] সহিত সাক্ষাৎ হয়!

তারাপদ তেমনি উজ্জ্বল সরল আছে।

তুমি কেমন আছ?

ইতি—
কমলকুমার মজুমদার
১২.৮.৬৯

সেদিন বাড়ী আসিয়া তোমার পোষ্ট কার্ড পাই।

তোমার যে phrase (সব থেকে) লিখি উহা কিন্তু preposition নহে।

---

১ তারাপদ রায়
২ উৎপলকুমার বসু

২

৯.১০.৭০

স্নেহের সুব্রত,

অদ্য দুপুরে তোমার চিঠি পাইলাম, তোমার যে Emperor Zones[১] ভাল লাগিয়াছে ইহাতে আমি গর্ব্বিত! আদতে আমি এক সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলাম। আমাদের সমালোচকরা, কেমনভাবে থিয়েটার দেখিতে হয় তাহা জানেই না। বাচন-ভঙ্গীকে অভিনেতার দেহ কখনও পশ্চাৎ কখনও সম্মুখে টানিয়া লইয়া যায় (অর্থাৎ বাচনভঙ্গীর রেশকে) তাহা বুঝিতে পারে না— স্বরবিভঙ্গর মধ্যে চরিত্র ক্রমে এ্যাবস্ট্রাক্ট্ রূপ লয়— কখন ঘটনাকে ওতপ্রোত করে, কখনও বা সে পারিপার্শ্বিকতা— ইহা তাহারা বুঝে না— নাটকের পরিণতি হইতে অনেকটা অঙ্কের Back calculation নাটক ভাল নাটক মন্দ বলে। একটা পুরুষ বলিতে যাহা বুঝায় তাহাই যে নির্ম্মাণ করা ইহা জ্ঞানে আনিতে পারে না। কলকাতায় দুয়েকটি নাম করা দল— তাহাদের উচ্চারণ ভঙ্গী যদি দেখ তাহা হইলে ধারণা করা মুস্কিল শালারা বেটাছেলে না খুকী। আছোলা melodrama সোফিস্টিকেট করা, সোফিস্টিকেট করা মানে ধরা গলায় কথা বলা ও লালায়িত লাল করা। অদ্য একটি পত্রিকায় দেখি লিখিয়াছে— exaggerate বলে এক কথা ব্যবহৃত হইয়াছে— (অথচ আমাদের কথায় সবই বলা ছিল) যাহা ঠিক হয় নাই কেননা পরের লাইনে বলা হইতেছে যে সলিল ভট্টাচার্য, brilliant mime— তাহা হইলে exaggerate হইল কেমনে? অন্য কিছু হইত। exaggerate কথাটা অথচ সদর্থেই ব্যবহৃত।

আমার পয়সা থাকিলে অথবা ঠাকুরের কৃপায় D. K. Gupta[২]-র মত একজন লোক পাইতাম তাহা হইলে দেখান যাইত বাঙলা স্টেজ কি করিতে পারে। শিশিরবাবুর[৩] পর চিৎকার আর লণ্ঠন আসিয়াছে— অভিনয় আসে নাই!

আমার যাওয়া হইল না। কারণ অনেক। একটা বাড়ী দেখিয়া এই পাড়া ছাড়িতে শীঘ্রই হইবে।

ভাল আছি।

ঠাকুর তোমার মঙ্গল করুন।

দিলীপকুমার গুপ্ত, 'বিভাব' পত্রিকার প্রচ্ছদ থেকে

আমার পয়সা থাকিলে অথবা ঠাকুরের কৃপায় D. K. Gupta-র মত একজন লোক পাইতাম তাহা হইলে দেখান যাইত বাঙলা স্টেজ কি করিতে পারে। শিশিরবাবুর পর চিৎকার আর লণ্ঠন আসিয়াছে— অভিনয় আসে নাই!

ইতি—
কমলকুমার মজুমদার

তুমি আমার ভাই খোকার সহিত ১৪৪/১ কালনা রোড, বর্দ্ধমান বা ফোন ৪৬১ সাক্ষাৎ করিও। ৫ই মা'র কাছে গিয়া তোমার কথা বলিতে একেবারেই ভুলিয়াছি— অচিন্ত্য মারফৎ চিঠি পাঠাই। অদ্যও তাহার দেখা নাই। শীঘ্র ব্যবস্থা করিব।

১ কমলকুমার পরিচালিত 'এমপারার জোনস' নাটক
২ সিগনেট প্রেসের দিলীপকুমার গুপ্ত
৩ শিশিরকুমার ভাদুড়ী

৩

১৫.১০.৭১

স্নেহের সুব্রত,

তোমার চিঠি পাইলাম, ইতি মধ্যে ভাবনাতে ছিলাম বটে যে তুমি নিশ্চয়ই বর্দ্ধমানে নাই, আমার লিখিত দুইটি চিঠি পাও নাই; এখন আবার একটা পোষ্টকার্ড লিখিয়া ডাকে দিয়াছি; যে উহা খুব দায়সারা গোছের, উহাতে স্থান অভাবে এবং কি তত্ত্ব লিখিব আগে হইতে ঠিক না থাকাতে খুব মার্জ্জিত হয় না; ইহাতে ভ্রম আসিতে প্রকৃতই পারে। যে এবং তুমি কিছু মনে করিতে পার, তবে জানিবে আমি তোমার পাঠক হওয়াতে উহা বলিতে পারি। আমার বক্তব্য দেখিলে বুঝিবে আমি ঠিক কিংবা তাহা নহে।

তোমার কবিতাটি আমি পড়িলাম; ঐখানে লিখি যে, এইরূপ কবিতা কি পূর্ব্বে তোমার লিখিতই পাঠ করি না আমার কাছে তোমার কবিতার বই আছে, আমি পড়ি। ভাল, ইহাতে এই বক্তব্য স্পষ্ট হওয়া একান্ত প্রয়োজন ইহা সত্য যে যাহারা কবিতা পড়ে তাহাদের নিকট কবিতা ব্যাপার বা কবির বাস্তবতা যাহাই হউক, মায়া সৃষ্টি বা ঘটান যে কোন বাক্য শব্দ দ্বারা তৈয়ারী হউক, পাঠক ঐ বাস্তবতাকে স্পর্শ করে, তাহার ঐ কবিতা ব্যক্ত শব্দ মণ্ডলী দিয়া, এই মানে যে নির্ম্মিত ছন্দে যাহা আছে; আমার স্বাভাবিক গতি ছন্দ, আমি ছন্দে যাইবই। ছন্দ মানুষের বুদ্ধির উপজীব্য, পরোক্ষ শ্রেণীকরণ, কিন্তু অবিচ্ছেদ্যতার কাঠামো ঐ শব্দগুলির অবস্থা বড় সকরুণ; একাধারে তাহার নিজের আড়া আছে আবার যৌগিক যৌগযুক্ত হইবার ক্ষমতা পদার্থও বর্ত্তমান অর্থাৎ অনায়াসে অন্য শব্দের, যাহা একই প্রকৃতির, সহিত যোগ হয়, ঠিক ইহা নয় তর্কের দিক দিয়া শব্দগুলি পুনরুক্তিব্যঞ্জক— যেমন যাহা, বাঙালীর স্বভাব 'কোথায় কোথায়'। 'যাও যাও', 'হায় হায়', শেষান্ত অক্ষর মিলে— মানে অনুপ্রাশের ছায়াপ্রাপ্ত, পুনরুক্তিতে ইহা মানা উচিত নহে যে অক্ষরগত আওয়াজই রহিবে, এমন কথা বলিতে মাত্রা ভেবে তাহা গঠিত হয়; তুমি নিশ্চয় হয়, যে এসব কারে-পড়া লইয়া ভাবিয়াছ! যাহা বলিতে চাই তাহা এই কবির জগৎ পাঠক তাহার আপন স্পর্শের বাস্তবতা দিয়া, লইয়া অগ্রসর হইবে, তাহার বিবেচনার বুদ্ধি কখনও হস্তচ্যুত হইবার নহে ইহা তাহার সরল মতিত্ব, ইহাই তাহার অহং; ফলে এই জন্যই বলিলাম না যে এখানে 'সমগ্র আছে, গণিকা আছে' তাই পড়িয়াছি বলিলাম, যাহা এমনই বলার তুল্য যে ইহা ছাপা হইয়াছে উহাও ছাপা হইয়াছে— যাহা stupid বলিতে পার; ঐ ঐ শব্দ না বসাইলেও একই হইত; 'কম্পন' শব্দটি অতীব পাশ্চাত্য তবু ঐটি সর্বত্র চল্, আমাদের মানিতে হইবে। এখন অন্যর কবিতাতে দেখ, বিশেষত ইদানীং যাহারা...(ঐ শব্দ কাটিলাম, ইহাতে রসিকতার প্রসঙ্গ আছে, এই রসিকতা ব্যাপারটা একমাত্র বাঙালিত্ব, বিশ্রী! ইহা নহে যে আমাকে কেহ করিতে পারে; এই যে উহা একের মানে যে রসিকতা করে, ক্ষমতার সীমা বুঝায়) বাজার চল্। এক্ষণ আছে, 'ধোয়া তুলসী পাতা' পদটিকে তিনি কোন মাত্রাতে, মানে বাচনভঙ্গি না ব্যবহার করিয়াছেন তাহা নাই। এখানে প্রতিটি শব্দই তর্কশাস্ত্রে যাহারে অভিজ্ঞাপক বলে, ঐ ঐ শব্দ কবিতার কারণ নহে; এখানে কারণ বলিতে এবং ঐ বিবরণক্ষম অভিজ্ঞাপক বলিতে কি বুঝায় তাহা খুবই বুঝা যায়; ধর X. ধর (...) অ্যাবস্ট্রাকশানের প্রথম অবস্থা লইয়া ভাব-যুক্তির নহে মানে বস্তুবাচক ও স্থানবাচক হিসাবে। এখানে এক ঘটনা, মানে অভিজ্ঞাপক, দ্বারা যাহা ব্যক্ত; ভাল কিন্তু অভিজ্ঞাপক কোন কারণ নহে। হায় এইখানেই আমরা মায়া বশীভূত! প্রতীয়মানতা আমাকে দেখিতেই হয়, উহা কবিকে বলিতেই হয়। তখনই মনস্তত্ত্ব আসে— এই মনস্তত্ত্ব খুব গদ্যর, সেখানে কারণগুলি অদ্ভুত নৈতিকতার বশ মানে। কাব্যের মনস্তত্ত্ব, সূক্ষ্ম ধর্মের সেখানে এই আমিত্ব কখনই কাজে লাগে না। সেখানে 'আমি কি বলিলাম' বলিয়া বিঘ্নিত হইতে হয়, —ক্রৌঞ্চ মিথুনের জন্য শোক করিতে ''এ আমি কি বলিলাম''! 'প্রতীক' শব্দটি আমার ভাল লাগে না। এই সূত্রে বিদেশে প্রতীক লইয়া, অনেক মেধাবী লোক ভাবিতে চাহিয়াছেন, আমরা জানি। কোন মহৎ কবি যখন তাহার রহস্য কর্ম্ম লইয়া ছোটখাট ব্যাপারে আরোপ করেন তখন আমরা বিপাকে পড়ি; যেমন কোন ঠিকানা লিখিতে এ চাতুর্য্য লাগান; এখানে বাস্তবতা কিভাবে একটা অন্য শব্দে আসে শব্দ শব্দ মিলিয়া এক ঘটনা হয়, হইয়া ধন্ধ সৃষ্টি করে, করিয়া বুঝায় অমুক রাস্তা— অর্থ অমুক রাস্তাতে চিঠি যাইবে। যেমন আমাদের দেশেতে সালতামামি, কোন সময় ইঙ্গিত করিতে অনেক শ্লোক আছে— আবার অনেক ক্ষেত্রে গণিতের যোগ বিয়োগ ঢুকিয়া আরও মারাত্মক করে! আমি এক ঘটনা বলিব, না, ঘটনাক্রমে অনুভূতি বলিব বা অনুভূতির জন্যই ঘটনা, কোনটি ঠিক? তুমি জানিবে যা আমি লিখি তাহা আলোচনার নিমিত্তই, লোক শিক্ষার নিমিত্ত না; আর সেই মূঢ়তা আমাতে। আমি সঠিক হইতে চাহি, আমরা সকলেই বড় কারে

ক্রৌঞ্চপর্ব, বাল্মীকি

এই মনস্তত্ত্ব খুব গদ্যর, সেখানে কারণগুলি অদ্ভুত নৈতিকতার বশ মানে। কাব্যের মনস্তত্ত্ব, সূক্ষ্ম ধর্মের সেখানে এই আমিত্ব কখনই কাজে লাগে না। সেখানে 'আমি কি বলিলাম' বলিয়া বিঘ্নিত হইতে হয়, —ক্রৌঞ্চ মিথুনের জন্য শোক করিতে ''এ আমি কি বলিলাম''! 'প্রতীক' শব্দটি আমার ভাল লাগে না।

খিচিং

হঠাৎ আমাদের গাইড কহিল জুতা খুলুন — সম্মুখের ঐ বনস্থলী এখন যাহা আমরা ভেদিয়া যাইব ঐখান দিয়া ভগবান রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষণ পার হয়েন। আমি নিশ্চয়ই জয় রামকৃষ্ণ বলিলাম, প্রণাম করিলাম! বনাঞ্চলকে যে মনোভাবে আমরা প্রণাম করি আর এই প্রণাম ভিন্ন।

উৎস: 'কমলকুমার মজুমদারের চিঠি'। সংকলন ও সম্পাদনা: প্রশান্ত মাজী, গৌতম মণ্ডল
সৌজন্য: আদম

পড়িয়াছি— আকাশ তত্ত্বর সূত্র বায়ুতে, বায়ুর সূত্র তেজে এইরূপে একটিতে অন্য ঢুকিয়া সব ঘোর পাকে নিমজ্জিত হইয়াছে— অর্থাৎ সম্বাদি ভ্রম (তর্কমতে) আর নাই; ইহাতে কোথাও না কিছুতে পৌঁছায়; আদতে সংশয়াত্মক যাহা তাহা মন; মন কিছু বুদ্ধি নহে! তাহাও এখানে নাই! (অবশ্য মন সম্পর্কে এক দেশী মত এ)

কাব্যের মনস্তত্ত্ব কি তাহা আমাদের বুঝিতে হইবে— উহা সীমা নহে উহা সূত্র নহে, উহা আরম্ভ। প্রতি শব্দই দারুণ কাব্যময়, যেমন সম্প্রসারণ; যেমন বহমান; যেমন স্থির; প্রেম, ভক্তি, হিংস্রতা। ঐগুলির কিছু সামনে যাহা আছে (দেহেতেও বটে) আর কিছু সভ্যতা এক সময়ের স্থিরীকৃত বিধান ঔচিত্য বোধ হইতে স্বাভাবিকতা অর্থেই সভ্যতা শব্দটি ব্যবহৃত। আবার metaphor যে বিবেচনাতে দেখে, কোথায় সরু হইবে তাহা বিচার প্রয়োজন। একবার, সুবর্ণরেখার নদী দক্ষিণে ময়ূরভঞ্জে যাই, খিচিং-এর জঙ্গল ইতিমধ্যে (এখানে কনকদূর্গা আছেন)— হঠাৎ আমাদের গাইড কহিল জুতা খুলুন— সম্মুখের ঐ বনস্থলী এখন যাহা আমরা ভেদিয়া যাইব ঐখান দিয়া ভগবান রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষণ পার হয়েন। আমি নিশ্চয়ই জয় রামকৃষ্ণ বলিলাম, প্রণাম করিলাম! বনাঞ্চলকে যে মনোভাবে আমরা প্রণাম করি আর এই প্রণাম ভিন্ন আবার একস্থানে ঐ বনভূমির মৃত্তিকা দেখাইয়া আর এক গাইড কহিল, এই স্থানের মৃত্তিকা ঔষধময়ী, আমার রোমাঞ্চ লইল! এই এই অনুভব বা জাগা অতীব পুরাতন, এককালের সমষ্টি এখন 'আমি' হইয়াছে, বহুলোক যাহারা পুরাতন ঐ সমষ্টি হইতে অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে (এখানে 'দূর' শব্দের বদলে পথ, দেওয়াল, চুম্বন পার হইয়া গিয়াছে বলা যাইত— একই সংজ্ঞা বুঝাইত অথচ) তাহারা আমার রকম দর্শনে মজা পাইবে; যাহারা পথে তাহারাই ইহারা; যাহারা দেওয়াল পার তাহারা কিছুটা শক্ত তাহারা পাগল ভাবিয়াছে, যাহারা চুম্বনের পার তাহারা দেখিল মাত্র। এই সমালোচনা এ রোমাঞ্চ লইয়া গল্প নিশ্চয়ই হইবে, ইহা লইয়া আমি ছন্দবদ্ধ করিতে পারি। কিছু স্থানবাচক শব্দ তাহাতে থাকে, সময়কে অভিশাপ থাকে— সেই কি কবিতা! ইহার সূক্ষ্মতা কখন এক অপূর্ব্ব দেহ ধারণ করিবে তাহা আমি চিনিব কি না; এই নেতিবাচক ইহা নহে ইহা নহে করিতে করিতে কোথায় ঠেকিব; (ইদানীং সকলেই নির্ভিকভাবে পরোক্ষে ইহাই প্রমাণ করিতেছে— ইহা নহে) ধর্ম্মীয় সাধকদের মোটা গল্পে; যেমন ঠাকুরের গল্পে, যেমন অনেক অনেক স্থানের; এমনকি শ্রীমদ্ভাগবতে— এখানে এক গল্পর কতটুকু এক গুণবাচক ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায় সূক্ষ্ম একটি রেখা (রেখা বলাটা চালিয়াতি নহে; কেন না কম্পনহীন শিখার অন্তরস্থিত রেখাতে মনঃসংযোগ সংশয়াত্মক চিত্ত (স্থির করিতে হয়) এখানে এখন ভাল এই বিবেচনার কথা উঠেই একটি লম্বা প্রক্রিয়া, মানে অবিচ্ছেদ্যতার একটি অতি অল্প যৎসামান্য অথচ কি জোরাল ফল হইয়া পরিণত হয়— যোগ বিয়োগ যে কোন ফল কি অনড় অজড় সত্য— এখন পৃথিবীতে ধূলা বীজময়ী বলিয়া উহা মানিয়া লইতে ইচ্ছা যায় না— এখানে অবিচ্ছেদ্যতা অবিচ্ছেদ্যতাকে আনয়ন করে— অথচ কি বলিব তাহাও জানি না, মানে বীজ আছে বলিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হই না। এখানে প্রাকৃতিক বাস্তবতা হইতে টানা কোন ইঙ্গিত নাই; লোকের স্বভাব হইতে মানে ঐ প্রকার গল্পের লোকের আসিয়াছে; ভাল, আর একটি দিক আছে প্রায় গল্পে লোক, পক্ষী, যেমন বক বা চিল, একটি আবার একটি সমষ্টির হইলেও একটি; এমন গল্প দৈনন্দিন জীবনের জন্য খুব ঠিক প্রবাদটা তাহার বুদ্ধিকে চালিত করে। এখানের প্রক্রিয়া অবিচ্ছেদ্যতা কিভাবে একটিতে পরিণত হয়, সিদ্ধান্ত হয় ঠিক যখন একের সমক্ষে সঠিক ঐ পরিবেশ বা অবস্থা আসিতে পারে, এখন আমার বাস্তবতাকে কোন দিক দিয়া মানিব। ইহা বিশেষ রূপে চিন্তিয়া দেখি এই অনুরোধ।

ঠাকুরের কৃপায় আমি এখন অনেক ভাল আছি।

ইতি কমলকুমার মজুমদার
১৬.১০

এখানে আর দু'টি সূত্র আমাদের ভাবিতে হইবে; নাটকীয়তা ও ব্যাখ্যা; নাট্যক্রিড়া বলিতে আমরা রোজ তারিখে ঐ শব্দ কিভাবে ব্যবহার করি; সেই ব্যবহার কি সর্ব্বসময় কোন কিছু নৈতিকতা, সৌন্দর্য, অবলীলাক্রমে কিছু ব্যাপার ঘটাতেই ঐ সংজ্ঞা লাভ করে! নাটকীয়তা শব্দটি অবিশ্বাস্য কিছুকে প্রতিষ্ঠা মানে যুক্তিগ্রাহী করাতেই ব্যবহৃত? সমাপতন শব্দর দোসর! (২য়) ব্যাখ্যা— কিছুকে সংজ্ঞা নিরুপণ না উহার আদত স্বরূপ, প্রয়োজন! সমস্ত কিছুর বিচার (খুব অহঙ্কারের কথা) অতি সরলভাবে হওয়া দরকার। পূর্ণ আর্টিস্টকে রক্ত চলাচল জানিতে হয় না। কিন্তু এনাটমীতে আমি বিশ্বাসী। ঐ ঐ প্রস্তাব নিছক আর্টের মানে কবিতার অঙ্গীভূত! এই এই বিষয়ে তোমার কি চিন্তা সূত্র তাহা জানাইও। ইতিমধ্যে সন্দীপন এক মিনিবুক film সম্পর্কে প্রকাশ করিয়াছে— তাহা লই নাই। তাহাকে আমি চিঠি দিয়াছি। সে নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হইবে। কি জান আমাতে সত্ত্বগুণ নাই, আমি উহার কাঙাল। অল্পবয়সীতে সেই গুণ ঠাকুর দেন— তাহা লইয়া সে যখন খেলা করে তখন স্বভাবত ভাবি, আমারও আর নিস্তার নাই। ঠাকুর তোমার মঙ্গল করুন। ইতি কমলকুমার মজুমদার
১৭.১০.৭১*

ঠাকুর এমন করুন আমার কথা তোমার ক্ষোভের কারণ না হউক**

* তৃতীয় চিঠিটি কমলকুমার মজুমদার ১৫.১০.৭১ তারিখে লিখতে শুরু করেন এবং শেষ করেন ১৬.১০.৭১ তারিখে।
**চিঠিটির নীচের অংশটুকুও মূল চিঠির অংশবিশেষ। ১৭.১০.৭১ তারিখে এই অংশটুকু লেখা হয়েছিল।

আগামী সংখ্যায় আরও চিঠি

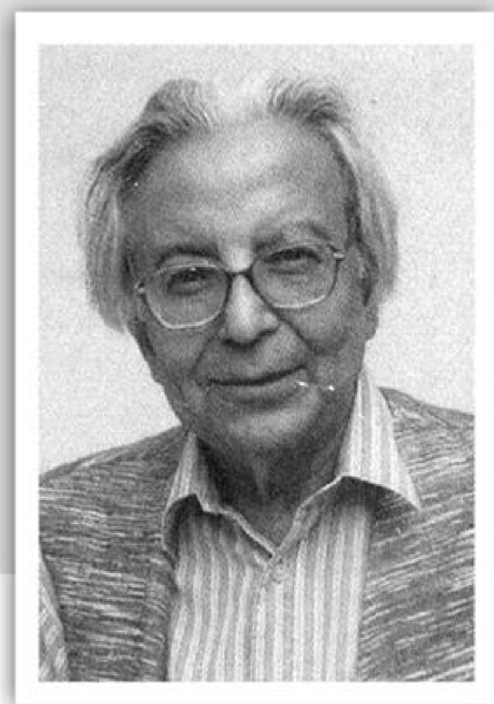

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তকে লেখা চিঠি

পর্ব : ১

রবীন্দ্রনাথ আমাদের পিছনে আছেন, সেই জন্যই আপনার দ্বারা এ কার্য সম্ভব হইল।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের চিঠি

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত,
তুলনাত্মক সাহিত্য বিভাগ[১]
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়,
কলিকাতা।

প্রীতিভাজনেষু, ১৮.৮.৭৫

প্রায় সপ্তাহকাল হইল আমি Academy of Fine Arts-এ 'আন্তিগোনে'[২] নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। প্রথমটায় মনে হইয়াছিল, ইহা বুঝি সোফোক্লেস্-এরই 'আন্তিগোনে' হইবে, এবং অনুবাদ আপনারই[৩]। কিন্তু নাটক আরম্ভ হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই ভুল ভাঙ্গিল। এই বইখানি আধুনিক ফরাসী নাটক—প্রাচীন গ্রীক বীর ও বীরাঙ্গনাদের নাম মাত্র ব্যবহার করিয়াছে। নাটকের লেখক, শুনিলাম, Jean Ennoville (?)। স্বীকার করিব, বইখানি ভালো লাগিল না। কোথায় Greek Tradedy- র দিব্যজ্যোতি, আর কোথায় আধুনিক প্রচ্ছন্ন কমিউনিস্ট প্রোপাগ্যান্ডা। দুই একটি স্থানে গ্রীক প্রতিভার ঝলক যেন দেখা দিতেছিল, কিন্তু হাস্যরসের ব্যর্থ অবতারণায় বিষয়টি সে গাম্ভীর্য্য ও গুরুত্ব রাখিতে পারে নাই। কিন্তু শ্রীমতী কেয়া চক্রবর্তী[৪] (আন্তিগোনের ভূমিকায়) এবং শ্রীযুক্ত অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়[৫] (ক্রেয়ন্-এর ভূমিকায়) যে অপূর্ব সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহাতে এই নাটকের ব্যর্থতাকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছিল।

বাড়িতে আসিয়া বহুদিন পরে আবার সোফোক্লেস্ লইয়া বসিলাম, এবং আন্তিগোনে'র বাঙ্গলা অনুবাদ—আপনার কৃত-কাজ তখনো ভালো করিয়া দেখি নাই, তাহা আবার অনেকখানি পড়িয়া ফেলিলাম। এই পাঠে হৃদয় মন উচ্চ জগতে যেন উন্নীত হইল। গ্রীক ট্র্যাজেডিগুলি আবার নূতন করিয়া পড়িবার সংকল্প করিতেছি। কিন্তু আসন্ন ৮৬ বৎসর বয়সে কতদূর সম্ভব হইবে জানি না।

আপনার বাঙ্গলা অনুবাদ মোটের উপর চমৎকার লাগিল। আপনি অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। গ্রীক ট্র্যাজেডির দেহ ও আত্মা দুই-ই বাঙ্গলা ভাষার মধ্যে আনা সহজ কথা নহে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের পিছনে আছেন, সেই জন্যই আপনার দ্বারা এ কার্য সম্ভব হইল। ...[৬]

টীকা:

১. তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ।

২. নান্দীকার প্রযোজিত সুবিখ্যাত নাটক। পরিচালক: রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত।

৩. আন্তিগোনে: গ্রীক নাট্যকার সোফোক্লেসের (আনুমানিক ৪৯৬-৪০৫ খ্রী.পূ.) নাটক। অনুবাদ:

জীবনে মানুষ ভাষা খোঁজে কেন বলতে পারো? —যা আমরা খুঁজি এবং পাই তা তো ভাষার উপর নির্ভরশীল নয়, ভাষার অতীত। এমন কি জীবনের চেয়েও বেশি।

সঙ্গের ছবি: অমিয় চক্রবর্তীর চিঠিতে 'বাকি' কবিতার অংশটুকু

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। প্রথম প্রকাশ: ১৯৬৩। সেন্ট পল্‌স্ ক্যাথিড্রালের ময়দানে শামিয়ানা নাটমঞ্চে (৬ এপ্রিল— ৫ মে, ১৯৭৯) এই নাটকের অভিনয় হয়। নাট্যপরিচালক: হানস্ গুন্টার হাইমে।

৪. কেয়া চক্রবর্তী (১৯৪২-১৯৭৭) নাট্যব্যক্তিত্ব রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তর প্রথম স্ত্রী, ১৯৬১-তে নান্দীকারে যোগ দেন। 'আন্তিগোনে' নাটকে তিনি আন্তিগোনের ভূমিকায় অভিনয় করতেন।

৫. অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৮৩) ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ১৯৬০-এ নান্দীকারে যোগদান করেন। 'আন্তিগোনে' নাটকে তিনি ক্রেয়ন-এর ভূমিকায় অভিনয় করতেন।

৬. চিঠিটির পরবর্তী অংশ পাওয়া যায়নি।

অমিয় চক্রবর্তীর চিঠি

১

AMIYA CHAKRAVARTY
Dept. of Religion Smith College
Northampton, Mass.

৬ই নভেম্বর, ১৯৬৬

কল্যাণীয়েষু

'কবিতা-পরিচয়'[১] পত্রিকায় তোমার চিদ্-গভীর সতীর্থ চিন্তার পরিচয় আমাকে আনন্দিত করেছে: 'চক্ষুষ্মান' বিচার সত্ত্বেও যে-নন্দন বৃত্তি তোমার সমালোচনায় প্রকাশিত তাতে আমার কবিতা[২] ধন্য হয়েছে। যোগ্যতার কথা ভাবব না। কেননা নিজের কাব্য সম্বন্ধে আমার অভিমান নেই কিন্তু একটি আধুনিক নমুনাকে লক্ষ্য ক'রে তোমার প্রসাদগুণ বিস্তৃত হয়েছে এতে তৃপ্ত না হয়ে পারিনি। 'প্রজ্ঞা'-র সন্ধান করি আমরা সাহিত্য-সমালোচনায়, সেই প্রজ্ঞা দেখা দেয় যখন বহুচিন্তাধারার যোগে, অধীত জ্ঞানের সমন্বয়ে আরো একটি স্রোত যুক্ত হয় যেটা লেখকের প্রাথমিক অভিজ্ঞতা প্রসূত। খুবই ভরসা আছে যে সাহিত্য বিচার এবং সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে তোমার বিচিত্র পরিণত মানসের ফলভোগী হব আমরা; তোমার লেখা নিবিড় পর্যাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে সন্দেহ নেই।

আমার পক্ষে চিঠি লেখা এখন কঠিনতর হয়ে উঠেছে; —কখনো ভেবেছি হয়তো তোমরাও কোনো উপলক্ষ্যে পশ্চিমদেশে আসবে এবং দেখাশোনার সুযোগ হবে। তারপর তোমারই লিপি— কেননা তোমার এই সমালোচনাটি আমাকে সোজাসুজি লেখা চিঠির মতো দরাজ এবং অনেকটা ব্যক্তিগত— আমার কাছে এল। সামান্য একটু উত্তর এই প্রসঙ্গে পাঠাই। তোমার ঠিকানা জানিনা কিন্তু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিশ্চয়ই এটা তোমার হাতে পৌঁছবে।[৩]

শুধু চিঠি লেখা নয়, সকল প্রকার লেখা আমার কাছে নতুন বাধাময় হয়ে উঠছে। সবটাকে যেন ঢেলে-সাজাবার বেলা উপস্থিত, শুধু রচনা নয় সমস্ত জীবনটাকে। বলতে গেলে অত্যুক্তির মতো শোনায় কিন্তু যে-চরম অনুভূতি এবং অমোঘ আত্মবিচারের বেলা এসেছে তাতে নতুন পথ-উদ্ঘাটন না করলে বাঁচব না— পুনরাবৃত্তির পথ বন্ধ। যদি পাথর ঠেলে আর একটি উপত্যকায় না পৌঁছতে পারি তাহলে জানব মৃত্যু ঘটেছে।

খানিক আগেই একটা কবিতা লিখতে বসেছিলাম, কিন্তু একটুতেই শেষ করতে হল। সদ্য রচনাটাকে উদ্ধৃত করলে বুঝতে পারবে কতখানি দুর্যোগের মধ্য দিয়ে চলেছি— অথচ একে দুর্যোগ বলব না, দুরূহ যোগ বলব।

বাকি[৪]

যথেষ্ট নয়
যা বলেছি তাতে বাদ পড়ল
যা করলাম তাতে ধরল না
প্রতিবেশী চাঁদ
অমাবস্যার চোখে কোথায়
সূর্য পৌঁছয় না
বন্ধ বুকে শার্সি আঁটা প্রাণে হাওয়া কৈ
যদি ফিরোতে হয় এই দিনকে
আশ্চর্যের সুযোগ হঠাৎ যোগে পাওয়া
—এমন ক'রে হারানো—
তবু জেনো জেনেছিলাম
বেদনার অতীত শেষ মুহূর্তে।।

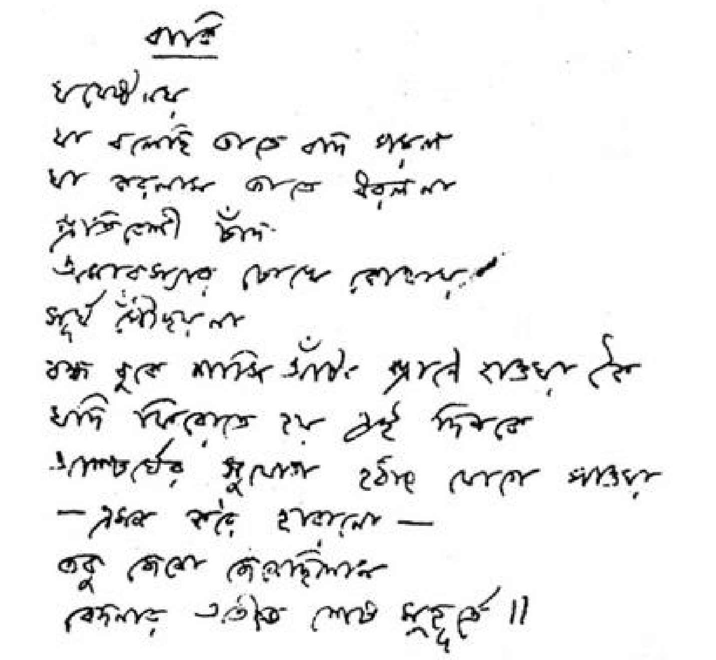
বাকি
যথেষ্ট নয়
যা বলেছি তাতে বাদ পড়ল
যা করলাম তাতে ধরল না
প্রতিবেশী চাঁদ
অমাবস্যার চোখে কোথায়
সূর্য পৌঁছয় না
বন্ধ বুকে শার্সি আঁটা প্রাণে হাওয়া কৈ
যদি ফিরোতে হয় এই দিনকে
আশ্চর্যের সুযোগ হঠাৎ যোগে পাওয়া
—এমন ক'রে হারানো—
তবু জেনো জেনেছিলাম
বেদনার অতীত শেষ মুহূর্তে।।

বাহিরের রাষ্ট্রপৃথিবীতে যে উন্মত্ত ধ্বংসের তাণ্ডব চলেছে তার প্রতিঘাত আমাদের শিল্প চেতনায় প্রবল হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই কিন্তু আমার সমস্যা মুখ্যত সেটা নয়। চরম আবির্ভাবকে ভাষা দিতে পারছি না, প্রচলিত বা আধুনিক কোনও প্রথাই কাজে লাগছে না অথচ নবাগ্নি ধারণ করবার প্রদীপ কৈ? বানাতেই হবে। কিছুকাল আরও দূর নেপথ্যে বাস করে যদি শক্তি পাই।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীকে তাঁর পত্রিকার সম্পর্কে আমার সাধুবাদ জানিয়ো, তুমি জেনো। যে-কবিতাটি ওখানে রয়ে গেছে ছাপানোর আগে দরকার হলে তার প্রুফ আমাকে পাঠাতে বোলো— নামটা বদ্‌লে 'প্রবাসী মার্কিনী-বন্ধুর চিঠি' হ'লে কেমন হয়? (অর্থাৎ মার্কিনী প্রবাসী আমি নিজে নয়, পত্রলেখক অন্যজন, আমি যেন ভাষ্যকার।) অনেক রাত হয়ে গেল —আরো কিছু কাজ সেরে শুতে যাবো। জীবনে মানুষ ভাষা খোঁজে কেন বলতে পারো? —যা আমরা খুঁজি এবং পাই তা তো ভাষার উপর নির্ভরশীল নয়, ভাষার অতীত। এমন কি জীবনের চেয়েও বেশি। অর্থাৎ সকল প্রকাশকে ছাড়িয়ে যায়।

প্রীতিনমস্কারান্তে
অমিয় চক্রবর্তী

টীকা:

১. সম্পাদক: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী। প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ ১৩৭৩, মে ১৯৬৬।

২. উক্ত পত্রিকার পঞ্চম-ষষ্ঠ যুগ্ম সংকলনে অমিয় চক্রবর্তীর 'বাসা-বদল' কবিতাটি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন অলোকরঞ্জন।

৩. অলোকরঞ্জন এইসময়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যায়ের বাংলা বিভাগে যোগদান করেছেন অধ্যাপক পদে।

৪. সুভাষ ঘোষাল সম্পাদিত 'অয়ন' পত্রিকায় এই চিঠির অংশ ও 'বাকি' শীর্ষক কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাটি পরবর্তীকালে অমিয় চক্রবর্তীর 'অমরাবতী' (আশ্বিন ১৩৭৯) কাব্যগ্রন্থে যুক্ত হয়েছে।

২

শিকাগো
২৫ জানুয়ারি ১৯৭২

শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

প্রিয়বরেষু

ভ্রমণের পথে এখানে আপনার চিঠি পেলাম— আপনার ওখানে কাজের এবং নানাবিধ সৃষ্টিশীল প্রবর্তনার খবর পেয়ে খুব সুখী হয়েছিলাম। আপনি যে-পরিকল্পনার সংবাদ দিয়েছেন তাতে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে বলা বাহুল্য। কিন্তু কিছু লিখে পাঠাতে একটু সময় লাগবে, মার্চের কোনও সময়ে তর্জমা এবং বিশ্লেষণমূলক একটি রচনা আপনাদের কাছে পাঠাব।

ইতিমধ্যে অত্যন্ত আবদ্ধ আছি— সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে ফিরেছি— ঢাকার অঞ্চলে ছিলাম। যা দেখেছি তা অবর্ণনীয়। নরজন্তুরা দেশ জুড়ে যে হত্যা অত্যাচার অবমাননা চালিয়েছিল তার ফলে মুমূর্ষু সমাজ এবং চূর্ণ সাধের গ্রাম এখনো প্রাণের অপেক্ষায় পড়ে আছে।[1] ভাগ্যক্রমে মুজিব[2] ফিরেছেন। তাঁর অনুপ্রেরণায় অগণ্য মানুষ এগিয়ে চলবে— কিন্তু বাঁচবার কঠিন সংগ্রাম এখনো স্বাধীন দেশের সামনে। সব কথা লিখতে মহাকাব্য রচতে হয়— শোক ও শক্তির মহাকাব্য। এইটুকু চিঠিতে তা লিখতে পারলাম না।

মার্কিনের প্রশান্ত সাগর তীরের কয়েকটা শহরে যেতে হবে। মধ্যে শিকাগোর বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ ছিল। এইখান থেকে আপনার কাছে প্রীতি অভিবাদন পাঠাই।

(আপনাদের সেমিনারে[3] সশরীরে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা হয় কিন্তু প্রধান অন্তরায় এই যে অনেকটা খরচ লাগবে— ভারতবর্ষে এবং বাংলাদেশে সম্প্রতি ঘুরে এখন সে-দিকে সাবধান হতে হবে।)

আপনাদের কাজের পূর্ণ সফলতা কামনা করি। অধ্যাপক Lathar Lytze[4]-কে এবং অন্যান্য সতীর্থ সহযোগীদের কাছে আমার শুভকামনা জ্ঞাপন করবেন। আপনাদের অমিয় চক্রবর্তী

টীকা:

১. পূর্বপাকিস্তানের (বাংলাদেশ) মুক্তিযুদ্ধের কথা বলা হয়েছে।

২. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান।

৩. হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'কবিতার জন্মরহস্য নিয়ে সমকালীন ভারতীয় লেখকদের সন্ধান' প্রসঙ্গে সেমিনার (১৯৭২)।

যা দেখেছি তা অবর্ণনীয়। নরজন্তুরা দেশ জুড়ে যে হত্যা অত্যাচার অবমাননা চালিয়েছিল তার ফলে মুমূর্ষু সমাজ এবং চূর্ণ সাধের গ্রাম এখনো প্রাণের অপেক্ষায় পড়ে আছে। ভাগ্যক্রমে মুজিব ফিরেছেন।

সঙ্গের ছবি: পূর্ব-পাকিস্তানে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ঢাকার রাজপথ

আজকের দিনে অতিমাত্র মানবিক, বিচারপ্রবণ বৃত্তি আমাদের ঘিরে আছে— কোনো শ্রেষ্ঠ প্রতিভার অনুশীলন মনোবৃত্তি এবং মতামতের স্থান আছে কিন্তু প্রতিজ্ঞার পরিচয় শেষ পর্যন্ত সমালোচকের স্বকীয় প্রতিভার পরিচয়।

উৎস: 'অহর্নিশ', বিশেষ সম্মাননা সংখ্যা, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ৮০।

৪. সঠিক নাম Lother Lutze। নব্যভারততাত্ত্বিক এই অধ্যাপক হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অলোকরঞ্জনের সহকর্মী। তাঁদের যুগ্মসম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে Ganges Delta (১৯৭৪)।

৩

শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
১২ জানুয়ারি, ১৯৭৫

প্রিয়বরেষু

সেদিন দ্রুত দেখা হল, কথাবার্তার সুযোগ পেলাম না, এতে ক্ষুণ্ণ হয়েছি। তার পরেই আপনার ছাত্রবন্ধু এলেন শান্তিনিকেতনে, আপনার প্রদত্ত দুখানি সুন্দর বই হাতে নিয়ে। মধ্যে থামলাম লণ্ডনে, ম্যুনিক, মনট্রিয়ালে—কোথাও ভাবনা লিপিবদ্ধ করবার সুবিধা বা মেজাজ ঠিকমতো না আসায় অনুত্তর দশাতেই বিদেশী বাসায় ফিরেছি।

এখান থেকে শুধু লিখি এই যে বিশ্বের কাব্য তর্জমা[১] খুব ভালো লাগল; Goethe ও রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে অনুশীলন গভীর এবং বহু তথ্যে সমৃদ্ধ[২]। বুঝতে পারা যায় আরও সময় পেলে বিশদ ভাবে ওই আলোচনা সম্পূর্ণ করতেন—আশা করি তা করবেন। (Schwitzer সম্বন্ধে মন্তব্যে হয়তো সামান্য আপত্তি তুলব— উনি আবেগপ্রবণতায় লেখেন নি, ধীর এবং বিচক্ষণ প্রাজ্ঞবোধ নিয়েই দুই মহাকবির জীবনাদর্শের বিচার করেছিলেন। হয়তো তাঁর ধারণা যথেষ্ট ফুটিয়ে তোলার অবসর পাননি। কিন্তু যা বলেছেন তার নিহিতার্থ স্পষ্ট এবং ইঙ্গিত)। ইন্ধনের বিষয়ে একটা খুচরো কবিতায় লিখেছি, তারই অনুতরঙ্গে কথাটা এখানে ব্যবহার করলাম!— হাল্কা কবিতাটি সঙ্গেই রইল।[৩]

আপনি এইরকম দেশী-বিদেশী প্রতিভার আলোচনা আরও করুন এই আমার অনুরোধ। আপনার ভাষায় ধার আছে, দীপ্তি আছে— বরাবরই আপনার সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। কোনো কিছু প্রমাণ করার চেয়েও যা বড়ো, অর্থাৎ যা বিশুদ্ধ প্রকাশ, তারই শক্তি সমস্ত জটিল তর্কের ঊর্ধ্বে আপনার রচনায় প্রতিষ্ঠিত। আজকের দিনে অতিমাত্র মানবিক, বিচারপ্রবণ বৃত্তি আমাদের ঘিরে আছে— কোনো শ্রেষ্ঠ প্রতিভার অনুশীলন মনোবৃত্তি এবং মতামতের স্থান আছে কিন্তু প্রতিজ্ঞার পরিচয় শেষ পর্যন্ত সমালোচকের স্বকীয় প্রতিভার পরিচয়।

আপনারা আমার অন্তরের প্রীতি জানবেন
ভবদীয় অমিয় চক্রবর্তী

টীকা:

১. সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত (১৯৬৪)।

২. Goethe and Tagore/Alokranjan Dasgupta/ Delhi South.

৩. 'নীল ইন্ধন' কবিতাটি অমিয় চক্রবর্তীর 'অনিঃশেষ' (১৩৮৩) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৪

৭ অক্টোবর, ১৯৭৭

শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
প্রিয়বরেষু

কিছুদিন আগে আপনার বন্ধু শ্রীরবীন্দ্রনাথ পাল[১] এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে আমার চিঠির উত্তর ও এক খণ্ড আমার সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ 'কবিতা সংগ্রহ'[২] পাঠিয়েছিলাম। সাহিত্য আকাদেমির নিমন্ত্রণে সেদিন গিয়ে জানলাম হয়তো আমার বই ও পত্র আপনি পাননি।

আপনার সঙ্গে দেখা করতে আমি উন্মুখ আছি। আপনাকে সেই চিঠিতে লিখেছিলাম আপনার নতুন প্রবন্ধের বই[৩] আমাকে কী গভীর ভাবে স্পর্শ করেছে। নতুন কবিতাও।[৪] জানিনা কোন উপলক্ষ্যে আবার শীঘ্র কলকাতায় যেতে পারব, হয়তো তার মধ্যে আপনার জার্মানিতে ফেরবার দিনও আসবে।

আর যাই হোক, পত্রের যোগ যেন থাকে— আপনি ইউরোপে গিয়ে আমাকে লিখবেন (Ulm আমার প্রিয়— বহুদিন আগে সেখানে গিয়ে খুব ভালো লেগেছিল— জার্মানি আমার প্রিয় দেশ, বিশেষ করে বাভেরিয়া অঞ্চল।)

আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার গ্রহণ করুন।
আপনাদের
অমিয় চক্রবর্তী

দেশে অন্তত ডিসেম্বরের শেষ অবধি আছি।
অ.চ.

টীকা:

১. শান্তিনিকেতনে বাংলা সাহিত্য পড়াতেন।

২. 'কবিতা সংগ্রহ' প্রথম খণ্ড। প্রকাশ: ১৩৮৪ শ্রাবণ, আগস্ট ১৯৭৭।

৩. 'স্থির বিষয়ের দিকে' (আশা প্রকাশনী: ১৯৭৬)

৪. 'গিলোটিনে আলপনা' (প্রতীক প্রকাশনী, ১৯৭৭) কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

আগামী সংখ্যায় আরও চিঠি

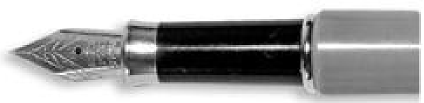

ভ্র ম ণ ক থা

অমিত লাবণ্যের দেশে

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

বেইরুটের রাস্তায়

বেইরুটের রাস্তায় গুপ্তহত্যায় পিতাকে হারানোর সাড়ে চার বছর পর মেয়ের চিঠি: 'আন-নাহার (দি ডে) সংবাদপত্রের সবাই আমরা ২০১০-এর ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অব নিউজপেপার্স, ওয়ার্ল্ড এডিটর্স ফোরাম ও ইনফো সার্ভিসেস এক্সপো অনুষ্ঠান আয়োজনের দায়িত্ব পেয়ে দারুণ খুশি।

এত বড় এই অনুষ্ঠানের দায়িত্ব আমরা নিয়েছি তার কারণ এটা ছিল আমার বাবার স্বপ্ন, ২০০৫-এ তাঁর গুপ্তহত্যার আগে পর্যন্ত তিনি ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন অব নিউজপেপার্স-এর পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। তাঁর সেই স্বপ্নকে আজ সত্যি হতে দেখে আমরা পুলকিত।'

লিখেছেন 'আন-নাহার'-এর ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার নায়লা তুয়েনি। তাঁর বাবা 'আন-নাহার'-এর সম্পাদক-প্রকাশক গারবান তুয়েনিকে ২০০৫-এর ডিসেম্বরে লেবাননের হৃদ্বিজয়ী প্রধানমন্ত্রী ফিরাক হারিরির মতোই বেইরুটের রাস্তায় গাড়িবোমায় বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হত্যা করা হয়। মৃত্যুর মাত্র ছ'মাস আগে লেবাননের মানুষের নয়নমণি নিহত প্রধানমন্ত্রীর পুত্রের সিরিয়াবিরোধী নির্বাচন এলাকা থেকে তিনি সাংসদ হয়েছিলেন। আঞ্জার-এ আবিষ্কৃত গণকবর নিয়ে আন্তর্জাতিক অনুসন্ধানের পক্ষেও প্রচার চালাচ্ছিলেন তিনি।

নায়লার নিমন্ত্রণপত্রের বাকি অংশ:

'আতিথেয়তার জন্মগত বোধসম্পন্ন এদেশের মানুষ লেবাননকে 'মর্ত্যের স্বর্গ' হিসেবেই জানে। পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় ছোট্ট দেশ লেবানন পুরনো পাণ্ডুলিপিতে পৃথিবীর একটি প্রয়োজনীয় অংশ হিসেবে উল্লেখিত আছে। ফিনিক্স পাখির মতো এখানকার মানুষ। পুড়ে গিয়েও ছাই থেকে আবার জেগে

তাইরে

পৃথিবী কি আর এখন এত সরল পথে চলে! বিশেষত একদা এক-মানচিত্র, পরে তারই ছেঁড়া দু-তিন টুকরো যেসব দেশ, তাদের পরস্পরের প্রতি ভাঙা বিশ্বাস যাতে জোড়া না লাগে, সেদিকে রাষ্ট্রশাসকদের হয়তো বিশেষ নজর থাকে। সেই অভিশাপেই সম্ভবত আমারও ভিসা মিলল না। এর প্রায় একযুগ পর, এই ২০১০ সালে, লেবাননের রাজধানী বেইরুটে সারা পৃথিবীর সংবাদপত্র-পত্রিকার প্রকাশক-সম্পাদকদের মহাসম্মেলনে এবার নিমন্ত্রণ।

ওঠে। আমাদের রাজধানী বেইরুট অনেক যুদ্ধ হামলা আঘাত সত্ত্বেও বারবার উঠে দাঁড়িয়েছে। এখানকার চমৎকার আবহাওয়া আর দিনে-রাতে এমন প্রাণোচ্ছল জীবনপ্রবাহের জন্য বিখ্যাত এই শহরকে ইউনেস্কো ২০০৯-এর বিশ্বের বইয়ের রাজধানীর মনোনয়ন দিয়েছে।

'লেবাননে এবছর ৭ থেকে ১০ জুন ৬৩তম ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অব নিউজপেপার্স এবং ১৭তম ওয়ার্ল্ড এডিটর্স ফোরামে আপনাকে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আমন্ত্রণ জানাই।'

এরকম বাসন্তী হাওয়ার নিমন্ত্রণে কার না মনে ঢেউ লাগে! বেইরুটের কথা ওয়ার্ল্ড এডিটর্স ফোরামের ডিরেক্টর বার্ট্রান্ড পিকিউরি অনেক আগেই বলে রেখেছিলেন, এবার তাঁর ও ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন অব নিউজপেপার্স-এর সি-ই-ও, আমার পুরনো বন্ধু তিমতি বলডিংয়ের চিঠিও এসে গেল।

অনেকদিন থেকে ঠিক এরকম একটা দেশই মনে মনে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। যে-দেশ আমাদের চেনা ভ্রমণসূচিতে থাকে না, কোনও ভ্রমণসংস্থার বিজ্ঞাপনেও দেখা যায় না। যে-দেশ হাতছানি দেয় কিন্তু হাত বাড়ালেই ধরা দেয় না।

মনে মনে ভাবি সম্মেলনের শেষে কয়েকটা দিন ক্যামেরা-হাতে দেশটার এমাথা-ওমাথা চক্কর দিয়ে সে-দেশের পাষাণ অতীত আর ভাসমান বর্তমান যতটা সম্ভব চলচ্চিত্রে তুলে আনা যায় না? একযাত্রায় দুই যজ্ঞ সম্পন্ন হলে তবেই না আমাদের লেবানন দর্শন সার্থক!

বাধ সাধলেন আমাদের তিন-পত্রিকার সম্পাদক। তিন-পাহাড় কাজের বোঝা-মুক্ত হয়ে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদক-প্রকাশক সম্মেলনে যোগ দেওয়া দেখা গেল মহাশ্বেতার পক্ষে মহা অসম্ভব।

তাহলে উপায়? সম্মেলনের গুরুভার আর ভ্রমণচিত্রের গুরুদায়িত্ব আগাগোড়া একা হাতে সামলাতে হবে নাকি!

এইরকম দোটানার মধ্যে ক্রমশ সমস্যাটার আরও কিছু জট চোখে পড়তে লাগল। এবারের সম্মেলনে নানা দেশের কয়েকটি সংবাদপত্রের মহিলা সম্পাদকদের কাছে বিশেষ কয়েকটি বিষয় আমার জানবার বোঝবার আছে। এজন্যে অনুষ্ঠানের আগাম কর্মসূচি দেখে সেইমতো বিভিন্ন অধিবেশনের বাঁধা সময়ের বাইরেও অনেকটা সময় বরাদ্দ করে ফেললাম। দুজন থাকলে নিউজপেপার্স কংগ্রেস আর এডিটর্স ফোরামের বিভিন্ন অধিবেশনের গুরুত্ব ও প্রয়োজন বুঝে সেইমতো আমরা ভাগাভাগি করে যোগ দিতে পারি। এবার আর সেটা হবে না। যেটুকু হবে তা-ও তাঁতের মাকুর মতো ছোটাছুটি করে একাই সারতে হবে।

এইভাবে সম্মেলন যদি বা শেষ হয়, তারপর শুরু হবে ক্যামেরা নিয়ে দৌড়োদৌড়ি? বেইরুট কাণ্ডের পর লেবাননের পালা!

যা থাকে কপালে— ভিসার দরখাস্ত তো করে দিই। সেখানেও নাকি জটিলতা, জানা গেল একলা কোনও ভারতীয়কে নাকি লেবাননি ভিসা দেওয়া হয় না।

এ দেশে যাওয়ার কথা প্রথম যখন ভেবেছিলাম তখনও ভিসার বাধায় সব ভেস্তে যায়। সেটা ছিল এ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার ঘটনা। সেবার বার্লিনের বিশ্ব পর্যটন মেলায় সিরিয়ার এক ট্র্যাভেল এজেন্সির কর্ণধারের সঙ্গে কথা বলে জেনেছিলাম— সড়কপথে আশপাশের বেশ কয়েকটি দেশ জুড়ে তাঁদের ষোলো কিংবা আঠেরো দিনের একটি প্যাকেজ ট্যুর আছে। যত দূর মনে পড়ে, লেবানন, সিরিয়া, ইরাক, ইরান হয়ে আফগানিস্তান, তারপর খাইবার গিরিপথ পেরিয়ে পাকিস্তানে এসে যাত্রা শেষ। পাকিস্তানেও কয়েকটি স্বপ্নাঞ্চল ঘোরাবার ব্যবস্থা ছিল মনে আছে। সমস্যা হল, সফরের শেষের মতো শুরুও পাকিস্তানেই।

তখন ভারতীয়দের পক্ষে পাকিস্তানের ভিসা পাওয়া আর খাইবার পাসে চড়ুইভাতি

করা যে একইরকম অসম্ভব সেকথা কর্ণধার মশাইকে বোঝালেও তাঁর আশ্বাস— ভিসার ব্যাপারে তাঁর ভ্রমণসংস্থার তরফে নিশ্চয়ই কিছু একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

'ভ্রমণ' পত্রিকায় সফরের সচিত্র বিবরণ লেখা হবে এই শর্তে প্যাকেজ ট্যুরের খরচে অর্ধেক ছাড় তো দিয়েই দিয়েছেন, এরপর ভিসা পেতে পুরো চেষ্টা চালাবেন এ আর এমন কী বেশি! আমাকে শুধু পাসপোর্টের ফটোকপি পাঠিয়ে দিলেই হবে, বাকি সব ব্যবস্থা তাঁর সংস্থাই করে দেবে। প্রতিবছর কয়েকশো বিদেশি পর্যটককে তাঁরা পাকিস্তান সফরে নিয়ে যান, এক ভারতীয় ভ্রমণ-সম্পাদকের জন্য তাঁদের সামান্য এই অনুরোধটুকু কি পাকিস্তান সরকার ফেলতে পারবে!

পৃথিবী কি আর এখন এত সরল পথে চলে! বিশেষত একদা এক-মানচিত্র, পরে তারই ছেঁড়া দু-তিন টুকরো যেসব দেশ, তাদের পরস্পরের প্রতি ভাঙা বিশ্বাস যাতে জোড়া না লাগে, সেদিকে রাষ্ট্রশাসকদের হয়তো বিশেষ নজর থাকে। সেই অভিশাপেই সম্ভবত, আমারও ভিসা মিলল না।

এর প্রায় একযুগ পর, এই ২০১০ সালে, লেবাননের রাজধানী বেইরুটে সারা পৃথিবীর সংবাদপত্র-পত্রিকার প্রকাশক-সম্পাদকদের মহাসম্মেলনে এবার নিমন্ত্রণ।

এবারও সেই ভিসাই বাধা! কয়েকটি ভ্রমণসংস্থায় খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ভারতীয়দের নাকি লেবানন যাওয়ার ভিসাই দেওয়া হয় না।

বাঙালির ছেলে ইতিমধ্যে লংকা জয় করেছি, আনাড়ি পায়ে আন্টার্কটিকা ছুঁয়েছি, পথের ভুলে নর্থকেপ চলে গেছি, কখনও আলাস্কার তুন্দ্রা অঞ্চলে, কখনও মোঙ্গোলিয়ার স্তেপ অঞ্চলে, কখনও আফ্রিকার সাভানা অঞ্চলে, কখনও আমাজনের বৃষ্টিঘন জঙ্গলে ঘুরেছি, সে-তুলনায় লেবানন তো এক লম্ফের পথ!

দিল্লিতে লেবাননি দূতাবাসে টেলিফোনে কথা বলে বোঝা গেল বেইরুটের সম্মেলনে নিমন্ত্রিতদের ভিসা পেতে বাধা নেই।

যত আনন্দ তত উদ্বেগ। কংগ্রেস করব, ফোরামও করব, তারপর ছবিও তুলব? একেবারে একা? রাশিয়ায়ও একই দুর্দশা হয়েছিল। ফলে রাশিয়ার ছবির কী দশা হয়েছিল তা যাঁরা সেই মস্কো-সেন্ট পিটার্সবুর্গের ভ্রমণচিত্র দেখেছেন তাঁরাই জানেন।

যা হওয়ার তা হবে, লেবাননে ঢোকবার ভিসা পেয়েই মনে মনে ভূমধ্যসাগর অভিমুখে ভেলা আমার ভাসিয়ে দিই।

দুঃখের হোক, সুখের হোক, হঠাৎই ই-মেল এল: 'আন-নাহার' সম্মেলনের বিপুল ব্যয়ভার বহনে শেষ মুহূর্তে অসমর্থ হওয়ায় এবছর ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অব নিউজপেপার্স ও ওয়ার্ল্ড এডিটর্স ফোরাম বাতিল করা হল।

ক্ষতিও কখনও কখনও মনের ভার কমায়। সেই মুক্তির স্বাদ মনেই চেপে রেখে এক্সিকিউটিভ মেম্বারের দায়িত্ববোধ ও সহানুভূতি দেখিয়ে ফোরামের ডিরেক্টর পিকিউরিকে লিখলাম: এরকম একটা আচমকা আঘাত হানা খবর শোনার জন্য অন্য অনেকের মতোই আমিও তৈরি ছিলাম না। যতদূর মনে পড়ে ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন অব নিউজপেপার্স-এর ইতিহাসে এরকম ঘটনা এই প্রথম ঘটল। এ-ক্ষতি আমাদের সবাইকে একসঙ্গে বইতে হবে। ইত্যাদি।

সেদিনই পিকিউরির উত্তর এল: 'আপনি ঠিকই বলেছেন, এ ঘটনা এই প্রথম ঘটল, আর এতেই স্পষ্ট হয়ে গেল পিছিয়ে পড়া দেশগুলিতে সংবাদপত্রের সংকট কত গভীর।

'এবছর অক্টোবরের গোড়ায় হামবুর্গে পুনরায়োজিত সম্পাদক সম্মেলনে আপনি আসতে পারবেন না জেনে আমার দুঃখ হচ্ছে। তবে আপনার অসুবিধা আমি বুঝি। ২০১১-র সম্মেলনের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছি, আশা করি আপনি তাতে নিশ্চয়ই অংশ নেবেন।'

ঠিক হল, সম্পাদক-সম্মেলনের দায় যখন স্বয়ং বিদায় নিয়েছে তখন লেবানন আর তার লাগোয়া দেশ সিরিয়ার ওপর ছোট্ট দুটো ভ্রমণচিত্র করার সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া করা যাবে না।

এক-দেশেই রক্ষা নেই, তায় দুই দেশ! তো কী? ক্যামেরা একটা, লোক একটা, কিন্তু তার কি দুটো হাত আর দুই চক্ষু নেই!

'ভ্রমণ'-এ আমাদের উচ্চাশা এরকমই। আকাশমিব দুষ্পারম আর, বাঙালি-সংস্কৃতয়, বাতাসমিব অপ্রতিরোধ্যম! আকাশের মতো দুষ্পার আর বাতাসের মতো অপ্রতিরোধ্য।

সিরিয়ার দূতাবাসেও দিলাম ভিসার একটা দরখাস্ত ঠুকে। যথাসময়ে ভিসা পেয়েও গেলাম।

লেবানন আর সিরিয়ার কয়েকটি ট্র্যাভেল এজেন্সির সঙ্গে বার্তা বিনিময় করে জানা গেল দশ-বারোদিনে গাড়িতে লেবানন সিরিয়া ঘুরিয়ে দেখাবার চমৎকার ব্যবস্থা আছে তাঁদের। খরচের অঙ্কটিও কম চমকপ্রদ নয়। একটি ভ্রমণসংস্থায় বারো রাত-তেরোদিনের খরচ ২,৭৭০ মার্কিন ডলার, সঙ্গে ইংরিজিভাষী গাইডের জন্য দৈনিক ১২৫ ডলার। আরেকটি সংস্থায়ও তেরোদিনের দাম ২,৮৯৪ মার্কিন ডলার। গাইডের খরচ আলাদা। গাইডের খরচ ধরে এঁদের শুধু লেবাননে ছ'দিনের খরচ ২,১৩৩ মার্কিন ডলার।

কলকাতার একটি জনপ্রিয় ভ্রমণসংস্থা ভয়েজার্স ক্লাব ট্যুরস দশ রাত-এগারো দিনের সিরিয়া-জর্ডন বেড়ানোর ব্যয় জানালেন, ইংরিজিভাষী গাইড ধরে, ৪,৮৯৫ ইউ এস ডলার। চার-পাঁচতারা হোটেলে ব্রেকফাস্ট সহ থাকা, বেইরুটের হোটেল থেকে এ সি গাড়িতে দামাস্কাস নিয়ে যাওয়া, এ সি গাড়িতেই ঘোরাঘুরি, যাদুঘরে বা অন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানকার প্রবেশমূল্যও এর মধ্যে ধরা আছে। তবে এর সঙ্গে যোগ হবে রোজ দুবেলার খাওয়াখরচ আর দামাস্কাস-আম্মান একপিঠের বিমানভাড়া।

এতসব খরচ-খরচার নীরস কথা শোনাচ্ছি, যাতে এসব দেশ ভ্রমণে খরচের মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যায়। অবশ্য এত উচ্চহারের ভ্রমণমূল্য একা একটি গাড়িতে ঘোরার জন্য।

২

শেষ পর্যন্ত নিজের ব্যবস্থা নিজে করে, কিছু বা না করেই সাতসকালে এয়ারপোর্টে যাওয়ার পথে মোবাইল ফোনে অফিসের সহকর্মীদের ঘুম ভাঙিয়ে সাত-সতেরো কাজ সারতে সারতে 'জয় বন্ধুভরা বসুন্ধরা' বলে বিমানে চড়ে বসি। দুবাই হয়ে পরদিন সকালে বেইরুট।

হোটেলে ঘর পাওয়া যাবে বেলা তিনটেয়, আমি পৌঁছেছি সকাল ন'টায়। অতএব রিসেপশনে নামধাম লিখে সইসাবুদ সেরে সুটকেস আর ভিডিও ক্যামেরা রেখে শুধু স্টিল ক্যামেরাটি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। রিসেপশনের লাবণ্যময়ী লেবাননি মেয়েটি যদিও দশটার মধ্যেই আমার ঘর তৈরি হয়ে যাবে জানিয়ে লাউঞ্জে বসতে অনুরোধ করলেন। আমি বেরিয়ে পড়লাম বিমানবন্দর থেকে হোটেলে আসার পথে গাড়ি থেকে দ্রুত দেখা দেশটাকে একটুখানি ধরে-ছুঁয়ে দেখবার আশায়।

সব দেশেই বড় শহরের রাস্তার দৃশ্যরূপ অনেকটাই একরকম। তারই মধ্যে চোখে পড়ল একটা পারস্যের কার্পেটের দোকানে চোখ জুড়নো রং-নকশার পাহাড়ে আধশোয়া ইরানি দোকানির দুর্ভাবনামগ্ন দৃষ্টি। ছবি

বেইরুটে ইরানি দোকানে

তুলতে যেতেই সেই সুদর্শন তরুণ সচেতন হয়ে উঠে বসলেন। আমি তাঁর সম্মতি নিয়ে ছবি তুললাম বটে, কিন্তু সে অন্য ছবি। যে মুহূর্তটি আমি তুলতে চেয়েছিলাম সে মুহূর্তটি ততক্ষণে মিলিয়ে গেছে। শুনলাম তিনিই দোকানের মালিক। নাম মজিদ। তেহেরান থেকে অনেক উদার ও খোলামেলা বেইরুটে বেশি বিক্রির আশায় তিনি সওদা নিয়ে এসেছেন, কিন্তু এবছর তেমন বিক্রিবাটা নেই।

আমি কখনও ইরানে যাইনি শুনে বললেন, 'আমাদের দেশে গেলে এসফাহান আর শিরাজ অবশ্যই যাবেন। শিরাজ তেহেরান থেকে ৪০০ কিলোমিটার, আর তেহেরান-শিরাজের ঠিক মধ্যপথে এসফাহান।'

রাস্তার ওপারে মস্ত একটা অট্টালিকার দিকে ক্যামেরা তাক করছি, এমন সময় চারজন লেবাননি পুরুষ দৌড়ে এসে আমার ক্যামেরার সামনে হাত তুলে কিছুটা কড়া গলায় বললেন, 'আপনার মেমরি কার্ড বের করে দিন।'

'কেন?'

'ওই বিল্ডিংয়ের ছবি তোলা নিষেধ।'

'দুঃখিত। কিন্তু সেই নিষেধাজ্ঞা তো লেখা থাকা উচিত ছিল।'

বলে ক্যামেরায় তোলা সবকটি ছবি এল সি ডি স্ক্রিনে দেখিয়ে দিলাম, তাদের রহস্যময় অট্টালিকার কোনও ছবিই সেখানে নেই। আমার কৌতূহল ছিল না তাই ওই বাড়িটিতে কী হয় তা আর জানতে চাইলাম না।

চারজনের প্রধান, একমাত্র তিনিই ইংরিজি বলেন, এবার করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিতে আমি ভদ্রতা রাখতে খুবই আলতোভাবে হাত মিলিয়ে বললাম, 'বিদেশি পর্যটকেরা আপনাদের কাছে আরও নম্র ও সহৃদয় ব্যবহার আশা করে।'

এবার ওদের দুঃখিত হওয়ার পালা। শুধু তাই নয়, ভারত থেকে আসছি শুনে তাঁদের চোখে আনন্দ আর মুখে বারবার শুধু 'ওয়েলকাম, ওয়েলকাম টু বেইরুট।'

বেইরুটের যেখানেই গেছি ভারতীয় বলে সর্বত্র এই স্বাগত শুনেছি।

৩

রাস্তার ধারে 'Big Boos' নামে বড়-সড় একটা শার্ট-টিশার্টের দোকানে বনেদি মুসলমানি শ্মশ্রুগুম্ফশোভিত এক রূপবান বৃদ্ধকে দেখে আলাপ জমাবার ইচ্ছেয় ঢুকে পড়লাম। ভারত থেকে এসেছি শুনে মহা খাতির। বৃদ্ধের 'আব্বাস! আব্বাস!' ডাক শুনে প্রভূত জিনিসপত্রের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন এক তরুণ।

তুর্কি কফি খাব, না লেবাননি চা— জেনে নিয়ে আব্বাসকে তার যোগাড় করতে বলে বৃদ্ধ সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন— 'ক'দিন বেইরুটে এসেছ? থাকছ ক'দিন? কোথায় কোথায় বেড়াতে গেলে? 'আলে' পাহাড়ে অতি অবশ্যই যাবে। সেখানে অন্তত দুটো দিন থাকতেই হবে।'

বিগ বুস-এর মালিক এই বৃদ্ধের নাম জানা গেল আহমেদ। আব্বাস এঁর ভাইপো। এই সবে বেইরুটে এসেছি শুনে বললেন, 'কাল-পরশুই 'আলে' চলে যাও।'

এইসময় আব্বাস চা নিয়ে ঢুকে বলল, 'আলে তোমার নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। বেইরুটকে আমরা প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড বলি।'

'কীভাবে যেতে হয়? আগে থেকে টিকিট কাটা বা হোটেল বুক করতে হবে নিশ্চয়ই।'

বৃদ্ধ উৎসাহে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কাল যাবে, না পরশু? দিন ঠিক করে আমাকে বলো। আমারই ওখানে হোটেল আছে। আলে এখান থেকে মাত্রই কুড়ি কিলোমিটার। আমার গাড়ি রোজ দুবেলা অন্তত দশবার যাতায়াত করছে।'

'গাড়ি আর হোটেলের খরচ কত?'

'আরে, খরচ কিসের! আমার গাড়ি, আমার হোটেল, তুমি ইন্ডিয়া থেকে এসেছ, দুদিন থাকবে, তার আবার খরচ কিসের?'

আমার যাওয়া হবে কিনা জানি না, কিন্তু দেখলাম কাকা-ভাইপো মিলে 'নামমাত্র মূল্যে' একটা টিশার্ট আমাকে গছিয়ে দিলেন।

আব্বাসের একটাই বিয়ে। কাকার ক'টা বিয়ে জিজ্ঞেস করতে বার কতক তিনি 'মেহেরবানি করে জিজ্ঞেস করো না' গোছের জবাব দিয়ে শেষ অব্দি সলজ্জ সগৌরব জানালেন তাঁর চারটে বিয়ে, এগারোটি ছেলেমেয়ে। এর মধ্যে ছজনের বিয়ে হয়ে গেছে। এখন তাঁর একটাই বিবি।

হোটেলে ফিরতে প্রায় সন্ধে, তবে আকাশে অন্ধকার নেই।

৪

পরদিন থেকে শুরু হল আমার লেবানন দর্শন। 'নাখাল' নামে একটা ভ্রমণসংস্থার কথা বলে দিয়েছিলেন বিমানবন্দরে সরকারি পর্যটন দপ্তরের দুই লেবাননি ললনা। তাঁদের একজনের সত্যিই অমিত লাবণ্য। তবে তাঁর মনোযোগ যত না আমার জিজ্ঞাসায় তার চেয়ে বেশি কম্পিউটারে চ্যাট করায়।

পর্যটন দপ্তরের বিভিন্ন পুস্তিকা ও মানচিত্র দেখে হোটেল থেকেই নাখাল-এর দলবদ্ধ প্যাকেজ ট্যুরের আসন বুক করে ফেললাম।

হোটেল থেকে ছোট গাড়িতে প্রথমে সংস্থার অফিসে, সেখানে টাকা মিটিয়ে বড় কোচে যাত্রা শুরু, সারাদিনের সফর সেরে আবার সন্ধের আগেই হোটেলে নামিয়ে দেওয়া— এরকম চারদিনে লেবাননের চারদিক দেখার ব্যবস্থা করা গেল। দিনে তিনটি করে গন্তব্য। সঙ্গে ইংরিজি ফরাসি আরবি ভাষায় লেবাননি গাইড। ঘোরাঘুরির ফাঁকে স্থানীয় রেস্তোরাঁয় মধ্যাহ্নভোজন। এরকম একেকদিনের সফরমূল্য গন্তব্যের দূরত্ব অনুযায়ী ৭৫ থেকে ৯০ ইউ এস ডলার। এমনিতে আটঘণ্টা আলাদা গাড়িতে এরকম ঘোরার খরচ ১৩৫ ডলার, গাইডের জন্য

আরও ৯৫ ডলার! অতএব বেড়াবার পক্ষে এরকম দলবদ্ধ ব্যবস্থা ঠিক আছে, তাছাড়া নানা দেশ নানা ভাষা নানা জাতির মানুষের সঙ্গও একটা বাড়তি পাওনা, কিন্তু ভ্রমণচিত্র তৈরির পক্ষে এ ব্যবস্থা কতদূর অচল, সিদ্ধান্তটাই বা কতটা অবাস্তব— প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে হাড়ে হাড়ে বা হাতে-পায়ে, ঘাড়ে-মাথায় টের পেয়েছি। যতক্ষণ কোনও ধ্বংসস্তূপের হয়তো কোনও ভাঙা খিলানের কারুকাজ ক্যাসেটবন্দি করছি ততক্ষণে আমার গাইডদিদি তাঁর দল নিয়ে বহু দূরে আমার দৃষ্টির বাইরে অদৃশ্য। তখন সমস্যা, কোথায় পাব তাদের? কারও দেখা না পেলে কোন পথে কীভাবে এগোব। তার চেয়েও বড় কথা, হোটেলে ফিরব কীভাবে। সবচেয়ে বড় অসুবিধা একেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যও একেক ঝটকায় পথচলতি ক্যাসেটবন্দি করতে হয়। ফলে সবসময়ই দৌড় দৌড় দৌড়! তার মধ্যে আবার হঠাৎ হঠাৎ হাতের ভারি এইচ ডি ভি ক্যামেরা ক্ষণিক বন্ধ করে কোনওক্রমে স্টিল ক্যামেরা বের করে তার শাটার টেপা। শুধু 'ভ্রমণ' ভিডিও করলে হবে, 'ভ্রমণ'-এর জন্য ছবি চাই না?

প্রথমদিন গেলাম জেইতা, বিবলস আর হারিসা। জেইতায় আমাদের বোরাগুহার মতো পাহাড়ের গুহাগহ্বরে স্ট্যালাকটাইট-স্ট্যালাগমাইটের আশ্চর্য সব ভাস্কর্যের লীলাক্ষেত্র। চিনের লি নদীর কূলে গুইলিনে বা জর্জিয়ার কুতাইসি থেকে গ্রিগোলেথি যাওয়ার পথে সাতাপ্লিয়ার জঙ্গলে এইরকম প্রাকৃতিক ভাস্কর্যগুহায় আমি ঘুরেছি, এই চারটি স্ট্যালাকটাইট-স্ট্যালাগমাইটের রূপলোক আয়তন ও সৌন্দর্যগুণে প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র, তবু যদি আমাকে বিচার করতে বলা হয় তাহলে আমি প্রথম আসনটি দেব জেইতাকে। দ্বিতীয়, গুইলিনের গুহা। তৃতীয় বোরাগুহা আর সবশেষে সাতাপ্লিয়ার জঙ্গলের গুহা।

জেইতা বেইরুটের 'ডগ নদী'র উৎস। এই নদী থেকেই বেইরুটের পানীয় জল সরবরাহ হয়। গুহার মধ্যে তৃষ্ণাহর এই নদীতে ছোট নৌকোয় চড়ে ঘুরতে ঘুরতে অপরূপ সব প্রাকৃতিক ভাস্কর্য চোখের ভেতর দিয়ে সোজা মর্মে গিয়ে বাসা বাঁধে।

জেইতা-গুহায় ছবি তোলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কোনওরকম ক্যামেরা নিয়ে ঢোকাই যাবে না। জেইতার আশ্চর্য ভাস্কর্য দেখে যতই কেন আনন্দে মন দুলে উঠুক, একেকটি দৃশ্যের সামনে দাঁড়াই আর ছবি না তোলার দুঃখ নতুন করে উথলে ওঠে।

আনজারে উমায়েদ শহরের ধ্বংসাবশেষ

জেইতা থেকে এবার যাব বিবলস। বেইরুটের ২৫ মাইল উত্তরে ভূমধ্যসাগরতীরে এখনকার এই ছোট্ট সৈকতশহর আসলে কিন্তু পৃথিবীর প্রাচীনতম শহরগুলোরই একটি। পাঁচ হাজার বছরেরও আগে এ-অঞ্চলে জনবসতির নানা সাক্ষ্য পাওয়া গেছে নব্যপ্রস্তর যুগের এই গ্রামে। বহু রাজরাজড়ার সমাধিসৌধও এখানে পাওয়া গেছে। এও শুনলাম, খ্রিস্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতকের আহিরাম-এর সমাধিপ্রাচীরের শিলালিপির বিভিন্ন বর্ণ থেকে ইউরোপের আধুনিক বর্ণমালার জন্ম। প্রবাদ আছে কানানিয়ার দেবতা বিবলস-এর প্রতিষ্ঠাতা।

এক সময়ের জীবন্ত প্রস্তরশহর এখন শুধুই প্রস্তরীভূত। মসৃণ গোলাকার আকাশস্পর্শী স্তম্ভগুলো তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের দিকে যেন নীরবে চেয়ে আছে।

পর্যটকদের জন্য লেবাননের অধিকাংশ দ্রষ্টব্যই এরকম ইতিহাসের প্রাকৃতিক যাদুঘর। ছোট-বড়-মাঝারি শহর বা রাজত্বের ধ্বংসস্তূপ। কোথাও ফিনিশীয় ধ্বংসস্তূপ, কোথাও রোমান ধ্বংসাবশেষ, কোথাও আরবি স্থাপত্য সাক্ষ্য, কোথাওবা ধর্মযুদ্ধের সময়কার ভগ্নস্তূপ। এর বাইরে আছে প্রায় ছ'হাজার ফুট উচ্চতায় দেড় হাজার বছরের প্রাচীন লেবাননের চিরহরিৎ সিডার অরণ্য।

সব ধ্বংসাবশেষের মতো বালবেক-এ নগরদুর্গ, বড় মসজিদ আর জুপিটার, বাক্কুস ও ভেনাসের মন্দির বেশ সময় নিয়ে দেখলে তবেই ওই প্রাচীন দেশটির ঐতিহাসিক পর্ব-

পর্যটকদের জন্য লেবাননের অধিকাংশ দ্রষ্টব্যই এরকম ইতিহাসের প্রাকৃতিক যাদুঘর। ছোট-বড়-মাঝারি শহর বা রাজত্বের ধ্বংসস্তূপ। কোথাও ফিনিশীয় ধ্বংসস্তূপ, কোথাও রোমান ধ্বংসাবশেষ, কোথাও আরবি স্থাপত্য সাক্ষ্য, কোথাওবা ধর্মযুদ্ধের সময়কার ভগ্নস্তূপ। এর বাইরে আছে প্রায় ছ'হাজার ফুট উচ্চতায় দেড় হাজার বছরের প্রাচীন লেবাননের চিরহরিৎ সিডার অরণ্য।

বেইরুটে পথের ধারে রেস্টুরেন্টের জায়ান্ট স্ক্রিনে ফুটবল খেলা দেখা

খাবার দোকানে সপরিবার শহরবাসীর ভিড়। অনেকেই টেবিলে বসে কাবাব, বিরিয়ানি, চাঁপ ইত্যাদি স্বাদিষ্ট পঞ্চব্যঞ্জনে রাতের খাওয়া সারে। 'বারবার' বলে একটা আরবি রেস্তোরাঁয় দেখলাম ভিড় লেগেই আছে। লেবাননিদের কাছে মনে হয় স্বাস্থ্যের চেয়ে খাদ্যে স্বাদের মূল্যই বেশি। অনেক রূপবান পুরুষ ও রূপলাবণ্যময়ী মহিলারও নেওয়াপাতি ভুঁড়ি। পোশাক দিয়েও ঢাকা যায় না।

পর্বান্তর কিছুটা স্পষ্ট হয়।

যে-কোনও সাম্রাজ্যগর্বী ধ্বংসস্তূপেই মহাকালের মৃদু হাসি লেগে থাকে। আবার এই নীরব ধ্বংসাবশেষে ইতিহাসের নিঃশব্দ দীর্ঘশ্বাসও শোনা যায়। যতই দেখি, মন ভার হয়ে ওঠে।

বালবেকের মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রতিবছর গ্রীষ্মকালে সংগীত নাটক ও লোকনৃত্যের বিরাট আন্তর্জাতিক আসর বসে। শুনলাম সেই সংগীত নাটক নাট্যোৎসবে সারা পৃথিবী থেকে বাছাই করে সেরা শিল্পীদের আনা হয়। তার বিশাল মঞ্চ তৈরি হচ্ছে দেখেই এযাত্রায় আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হল।

একদিন গেলাম এমির বাশির-এর বেইত-এদ্দিন প্রাসাদ দেখতে। প্রাচীন প্রাচ্য স্থাপত্যশৈলীর এ এক সুন্দর নিদর্শন। যেমন প্রাসাদপরিকল্পনা, তেমনই দেওয়ালের কারুকাজ আর মেঝের মোজাইক।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ফরাসি আমলে একদা বাশিরের বসতবাটি— আশ্চর্য সুন্দর এই প্রাসাদটিকে সরকারি কাজে লাগানো হয়। তারপর ১৯৪৩ সালে লেবানন তার স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার পর এটি দেশের রাষ্ট্রপতির গ্রীষ্মকালীন বাসভবনে রূপান্তরিত হয়।

যে-কোনও দেশেই দেখার কি শেষ আছে? প্রথম এলে তো আর কথাই নেই। যতই দেখি, মনে হয় কত কী না-দেখা থেকে যাচ্ছে। লেবাননেও জেইতা, বিবলস, হারিসা, বালবেক ছাড়াও দেখেছি পুরনো দিনের সমুদ্রদুর্গ, পুরনো কালের সাবান তৈরির যাদুঘর, তাইরে-সাইদোনের পুরনো শহর বাজার বা এরকম আরও অনেক কিছু, কিন্তু সব দেশেই যা আসল, চারপাশের চলমান জীবনচরিত, তার কতটুকুই বা দেখা হল!

৫

লেবাননের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই থাকে বেইরুটে, ফলে বেইরুটে সবসময়ই লোকারণ্য আর ট্র্যাফিক জ্যাম। খাবার দোকানে সপরিবার শহরবাসীর ভিড়। অনেকেই টেবিলে বসে কাবাব, বিরিয়ানি, চাঁপ ইত্যাদি স্বাদিষ্ট পঞ্চব্যঞ্জনে রাতের খাওয়া সারে। অনেকে খাবার নিয়েই চলে যায়। ফোনে অর্ডার নিয়ে বাড়িতে খাবার পৌঁছে দেওয়ারও দেদার ব্যবস্থা। 'বারবার' বলে একটা আরবি রেস্তোরাঁয় দেখলাম ভিড় লেগেই আছে। বাড়িতে খাবার সরবরাহের জন্য দোকানের পাশের গলিতে তিরিশ-চল্লিশটা আমাদের অটো ধরনের তিনচাকা গাড়ি সদা প্রস্তুত। লেবাননিদের কাছে মনে হয় স্বাস্থ্যের চেয়ে খাদ্যে স্বাদের মূল্যই বেশি। অনেক রূপবান পুরুষ ও রূপলাবণ্যময়ী মহিলারও নেওয়াপাতি ভুঁড়ি। পোশাক দিয়েও ঢাকা যায় না।

রাস্তার ধারের জনপ্রিয় রেস্তোরাঁগুলোতে যেমন গরু ভেড়া খাসি মুরগির নানান সুপক্ক সুগন্ধি পদ, তেমনই আবার বড় হোটেলের ব্রেকফাস্টে সরস সুমিষ্ট ফলের সম্ভার। সুপক্ক পিচ, প্লাম, চেরি, অ্যাপ্রিকট আর হলুদবরণ সবুজবরণ কলা তরমুজ খেয়ে শুধু পেটই ভরে না, মনও ভরে। আমি তো সুপার মার্কেট থেকে এইসব কিনে এনে মনের সুখে রাতের খাবারও ফলাহারেই সেরেছি। লেবাননের অনেক মিষ্টিই মূলত তিলবাটা ও বাদাম। তবে খাওয়ার শুরুতে একবাটি সালাদ জাতীয় শাক-সবজি আর অতি সুস্বাদু একবাটি বেগুনবাটা দেয়, সঙ্গে পাতলা রুটির গুচ্ছ, প্যাকেজ ট্যুরের মধ্যাহ্নভোজে খেয়েছি, বেশ ভালো।

বেইরুট শহরের প্রাণকেন্দ্রে বিকেলে-সন্ধেয় ঘুরে বেড়িয়ে এখানকার মনখোলা আড্ডাবাজ মানুষদের ভালো লাগে। শহরকেন্দ্র প্রদক্ষিণের আগে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র-সজ্জিত এক ফরাসিভাষী লেবাননি সেনার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, এই মসজিদ, গির্জা, রেস্তোরাঁ, মানুষজনের ছবি তোলায় কোনও বাধা আছে কি?

প্রথমেই ভাষা সমস্যা। তাঁর প্রশ্ন— অ্যারাবিক?

মানে, আরবি ভাষা জানি কিনা। জানি না জানাতে এবার প্রশ্ন— কোন দেশ থেকে এসেছ?

ভারত থেকে।

বুঝলাম তিনি ইংরিজি বলতে পারেন না। পরের প্রশ্ন— ফ্রাঁসে?

অর্থাৎ ফরাসি চলে?

চলে, একটু একটু। উই, আঁ পু দ্য ফ্রাঁসে।

সৈনিক খুশি। ব্রে বিঁয়া।

ফরাসিরা অনেক কাল রাজত্ব করে গেছে এদেশে, ফরাসি এদের দ্বিতীয় ভাষা। এবার আমার আংশিক অবোধ্য তাঁর দ্রুত ফরাসিতে আমাকে বেইরুটে স্বাগত জানিয়ে গর্বসহকারে শহরের নানা গুণবর্ণনার ফাঁকে আমার সঙ্গে প্রায় আড্ডা জমিয়ে দিলেন। আমিও এরপর স্থিরচিত্রের সন্ধানে নিশ্চিন্ত মনে সেদিন ডাউনটাউন চষে ফেললাম।

পরদিন আবার এলাম, এবার ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে। ইউরোপের মতো রেস্তোরাঁ সামনের রাস্তায়ও সম্প্রসারিত। সেখানে পানাহারের সঙ্গে গড়গড়ায় সুগন্ধি তামাকসেবন চলছে। পুরুষদের মতো মেয়েরাও গড়গড়ায় সমান অভ্যস্ত— এক্ষেত্রে অন্তত নারী-পুরুষের সমান অধিকার।

অফিসে দোকানে বাজারে হোটেল-রেস্তোরাঁয় বা বিমানবন্দরেও দেখেছি পুরুষের মতো মহিলারাও স্বচ্ছন্দে কর্মরত, মেয়েরা প্রায় কেউই বোরখা-পরা নয়, অনেকেরই পরনে জিনস। কারও কারও ধর্মীয় অনুশাসন বা ঐতিহ্যে মস্তক সম্পূর্ণ আবৃত, একটা চুলও দেখা যাবে না কিন্তু প্যান্ট জিনসের।

শহরকেন্দ্রেই লেবাননের বিরাট জাতীয় যাদুঘর দেখে কাছেই নিহত প্রধানমন্ত্রী ফারুক হারিরির স্মৃতিভবনে গেলাম। হারিরির ছবির সামনেই লেবাননিদের বুকভাঙা হাহাকারের ছবি, নীচে ফুলে ঢাকা বোধহয় হারিরির কবর। প্রিয় প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু যেন আজও মানুষ মেনে নিতে পারেনি— এমনই জীবন্ত এই স্মরণকক্ষ।

লেবাননের সমুদ্রসৈকতে তো কথাই নেই, কী শহরে বা ধ্বংসস্তূপে, ওপরের আকাশ সারাদিনই নীল। প্রায় মঙ্গোলিয়ার আকাশের মতো। দেখি আর ভাবি যে-দেশের মানুষের চেহারায় লাবণ্য, চিরহরিৎ অরণ্যে লাবণ্য, স্থাপত্যের রঙে-নকশায় লাবণ্য, সে-দেশের যুদ্ধ-বিরোধহীন স্থায়ী সুখ-শান্তির লাবণ্যময় ভবিষ্যৎ কেন হবে না!

এটা হয়তো কুটিল আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ, লেবাননের ইতিহাস সম্পর্কে আনাড়ি, দায়হীন এক পর্যটকের অলীক কল্পনা, তবে মানুষের মন তো মানুষের পৃথিবীতে শান্তির স্বপ্নই দেখতে চায়।

আপাতত চারদিকে ছড়ানো সেই স্বপ্নভঙ্গের বেদনা নিয়ে, লেবাননকে বিদায় জানিয়ে দুপুর দুটোয় একটা ট্যাক্সিতে চড়ে বসলাম, যাব পাশের দেশ সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাস। দুই সীমান্তের দুই বেড়া পেরনোর বিরতিটুকু ধরে বেইরুট-দামাস্কাস ঘণ্টাতিনেকের পথ। আমি থাকব ওল্ড দামাস্কাসে। কিন্তু সে অন্য কাহিনী।

বেইরুটের কাফেতে

প্রথম প্রকাশ 'ভ্রমণ' শারদীয়া সংখ্যা
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১০

ছবি: লেখক

অনলাইনে কিনতে ▸www.swarnakshar.in

বইমেলায় ২৭৮নং স্টলে

দুচাকায় দুনিয়া

বিমল মুখার্জি

১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন
প্রথম ভারতীয় ভূ-পর্যটক বিমল মুখার্জি।
তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত। পঞ্চম মুদ্রণ। ₹১৫০

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), ***স্টার মার্ক***-এর সব দোকান
ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

স্বর্ণাক্ষর

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ **ফ্যাক্স:** ২২৮৭-৬৪৪৮ **ই-মেল:** info@swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষরের বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন: www.swarnakshar.in

পঁচাত্তর বছর আগের একটি ছোট গল্প

কানাইলাল চক্রবর্তীর

অজ্ঞাত ক্ষত

'চলো দেখে আসি', 'কুমির হয়ে জলে গেল', 'চড়ুইয়ের সঙ্গে' —এই তিন ক্ষীণায়তন শিশুপাঠ্য পুস্তক রচনার বহুকাল আগে কানাইলাল চক্রবর্তীর বেশ কয়েকটি ছোট গল্প ১৯৩৯-৪০-এ তখনকার পূর্ববঙ্গের রংপুর থেকে প্রকাশিত 'পল্লীবাণী' মাসিকপত্রে ছাপা হয়েছিল। 'অজ্ঞাত ক্ষত' পরে অধুনালুপ্ত 'অমৃত' সাপ্তাহিকে পুনর্মুদ্রিত হয়।

মানিকদা জন্ম থেকেই অন্ধ। চোখের ঢেলা দু'টো চামড়ার নীচে এদিক ওদিক শুধু ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু মানিকদার বুঝি কোনও দুঃখ নেই সেজন্য। যা সে কোনওদিন দেখেনি তার চেহারাও সে জানে না। যা কিছুর অস্তিত্ব সে শোনে তার চেহারাও সে তার নিজের মতো করে কল্পনা করে নেয়। মানুষ এইরকম। এমনি করে পা দিয়ে সামনের দিকে হাঁটে। হাত দিয়ে কাজ করে। ফুল এইরকম। এমনি করে গাছে ফুটে থাকে। এমনি করে বাতাসে দোল খায়। এছাড়া অন্যরকম করে ভাববার দরকার হয় না তার। হাসির কথা শুনলে সে-ও হেসে ওঠে। দুঃখের কথাতেও মুখখানা তার কালো হয়ে যায়। মানিকদা যে অন্ধ, তার মুখ দেখে তখন তা ভাবাই যায় না।

মানিকদার সঙ্গে পরিচয় অল্প দিনের। তাদের একেবারে লাগা বাড়িটাও রেসিডেন্সিয়াল— টিউশনি নিয়ে আছি। এ গ্রামের ছোট একটা ইস্কুলে মাস্টারি পেয়েছি। দু'দিনেই মানিকদা আমাকে খুব পছন্দ করে ফেলেছে। আমার সঙ্গে সে যেমন মন খুলে কথা বলে, তেমনি করে আর কারও সঙ্গেই পারে না। কে-ই বা কথা বলবে ওর সঙ্গে। সকলের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, ঘৃণা-অবজ্ঞা নিয়েই তো বেঁচে আছে।

সারা দিন বাইরে একটা বেঞ্চিতে বসে থাকে। সামনে দিয়ে গ্রামের পথ। চেনা-মানুষের গলা শুনলে ডেকে আলাপ করে। আমার ইস্কুলে যাবার সময় হলে সীমানার বেড়াটুকু হাত দিয়ে দেখে দেখে এসে দাঁড়ায় আমার দরজায়। বলে— ইস্কুলে যাচ্ছো নাকি মাস্টার?

—হ্যাঁ মানিকদা। ওবেলা এসো, কেমন।

—আসব বইকি।

আমার ছাত্র ক-টা পেয়ারা রেখে গিয়েছিল আমার জন্য। ওবেলা খাব বলে রেখে দিয়েছিলাম। তা থেকে একটা পেয়ারা এনে মানিকদার হাতে দিলাম। মানিকদা হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখে বলল, পেয়ারা।

—হ্যাঁ, খাও। তুমি তো পেয়ারা খেতে ভালোবাসো।

খুব খুশি হয়েই খেতে লাগল মানিকদা। চিবোতে চিবোতে বলল, এরকম ডাঁসা পেয়ারা খেতে কার না ভালো লাগে বলো।

আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখছিলাম।

খেতে খেতে আবার বলল— কিন্তু যার দাঁত নেই, তার কী দুঃখ বলো তো মাস্টার। এরকম ডাঁসা পেয়ারার স্বাদ সে কি পায় কখনও?

অবাক হলাম ওর কথা শুনে। যার দাঁত নেই তার দুঃখ বোঝে। অথচ নিজের চোখ না থাকার দুঃখ তো বলে না কখনও।

ছুটির পরে বাড়ি এলে মানিকদা বুঝতে পারে। অমনি তার চেনা পথটুকু হাত দিয়ে দেখে দেখে আমার দরজায় এসে দাঁড়ায়। আমি হাত ধরে ঘরে নিয়ে আসি। তারপর হাতমুখ ধোয়ার জন্য একটুক্ষণের ছুটি চাইলে বলে— হ্যাঁ-হ্যাঁ, যাও। আমি বুঝি একটু আগেই এসে পড়েছি! বলেই আবার বলে— কী করব মাস্টার, সারাটা দুপুর ভূতের মতো একা একা আর কাটে না।

হাতমুখ ধুয়ে এসে খবরের কাগজ পড়ব। মানিকদা শুনবে। দেশ-বিদেশের খবর শুনতে ওর ভারি আগ্রহ। দুর্ভিক্ষের খবর কিংবা রেল দুর্ঘটনার বীভৎস খবর শুনলে মানিকদা প্রায় লাফিয়ে ওঠে। বলে— ইস! কী সাংঘাতিক!

একদিন কাগজ পড়ছি। মানিকদা মনোযোগ দিয়ে শুনছে। এক ভিখিরি দুয়ারে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে চাইতেই মানিকদা বলে উঠল— আঃ, চুপ করো—

—আমি অন্ধ বাবা—

—অন্ধ তা কী করব? আগে যাও। খুব বিরক্ত হয়ে বলল মানিকদা।

তাড়াতাড়ি আবার আমার দিকে মুখ

ফিরিয়ে এনে বলল, তারপর? তারপর কী হল মাস্টার? পড়ো তো— পড়ো তো—

আমি আবার পড়তে লাগলাম।

পাড়ার ছেলেমেয়েরা মানিকদাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করত, আমার সামনে হলে বারণ করতাম। কাজ কী ওর মনে ব্যথা দিয়ে। যেটুকু নিয়ে ওর তৃপ্তি সেটুকু নিয়েই থাক না নিজের মনে।

ক-দিন থেকে একটা ভালো বই চলছিল সিনেমায়। ভাবলাম, দেখে আসব। শুনে মানিকদাও সঙ্গী হতে চাইল। বলল, কোনওদিন সিনেমা দেখিনি মাস্টার। কেউ নিয়ে যায় না আমাকে।

ওর আগ্রহ দেখে না করতে পারলাম না। বললাম— বেশ, চলো।

খুব খুশি হল মানিকদা। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে এল। তৈরি মানে— তার ভালো কাপড়টুকু পাড় ওঠা। আর খাটো মাপের জামা। কোচাটি হাঁটু পর্যন্ত ঝুলিয়ে দিয়ে বার বার পাট করতে করতে বলল, খুব রাত হবে নাকি মাস্টার?

—না। ফার্স্ট শোতেই তো যাচ্ছি—

মাথার উসকো-খুসকো চুল হাত দিয়ে পাট করতে করতে আবার বলল— আমার টিকিট লাগবে না?

—আমি কেটে নেব। চলো।

—চলো। বলে তার লাঠি ঠুক-ঠুক করতে করতে আমার পিছন পিছন চলতে লাগল। আমি তার হাত ধরে আছি।

রমেনবাবুর সঙ্গে দেখা। মানিকদাকে নিয়ে সিনেমায় যাচ্ছি শুনে মুখ টিপে একটুখানি হাসলেন। পাছে কিছু বলে বসেন সেই ভয়ে ইশারায় বারণ করলাম তাঁকে।

ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট নেই। সেকেন্ড ক্লাসের পিছনের দিকে দুজনে বসলাম। সামনের সিটের সবাই ফিরে ফিরে চাইছিল মানিকদার দিকে। তাদের দৃষ্টিতে কৌতূহল।

একটু পরে ঘন্টা বাজতেই মানিকদা বলল— এই বুঝি আরম্ভ হবে?

—হ্যাঁ, শোনো।

শো আরম্ভ হল।

ডায়লগ শুনে শুনে 'বাঃ, বেশ' বলে ভালো সমঝদারের মতো মাঝে মাঝে তারিফ করতে লাগল মানিকদা।

সামনের সিটের লোকগুলো মানিকদার দিকে চেয়ে চেয়ে খুব হাসছিল মুখ চেপে।

দেখে অস্বস্তি লাগছিল আমার। কিন্তু কিছু বলতে পারছিলাম না কাউকে।

একটা দৃশ্য দেখে সবাই হাততালি দিয়ে উঠল। মানিকদাও অমনি শব্দ করে

কিশোর-বয়সি একটি ছেলে মানিকদার দিকে একবার তাকিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। মানিকদা তাকেই জিজ্ঞেস করল— কী ভাই, হাসছো কেন? কী হয়েছে বলো তো? ছেলেটি হাসতে হাসতেই বলল, না— এই এমনিই— মানিকদার মন মানল না। বলল, আমাকে দেখেই বুঝি ওরা হাসছে—

হাততালি দিল তাদের সঙ্গে।

সামনের সিটের লোকগুলো এবার হো হো করে হেসে উঠল।

হলের ওধার থেকে একজন বিরক্ত হয়ে রেগে বলে উঠল— কী হচ্ছে ওখানে। অত গোলমাল কীসের! হাসবার কী আছে এখানটায়?

যারা হাসছিল তাদেরই একজন হাসতে হাসতেই উত্তর দিল— ওখানে না থাক, এখানে যে আছে। দেখে যান না একবার—

কথাটা শেষ হতেই মানিকদা বলল— কী মাস্টার, কী বলছেন ওরা?

—কিছু না। তুমি শোনো।

কিশোর-বয়সি একটি ছেলে মানিকদার দিকে একবার তাকিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল।

মানিকদা তাকেই জিজ্ঞেস করল— কী ভাই, হাসছো কেন? কী হয়েছে বলো তো?

ছেলেটি হাসতে হাসতেই বলল, না— এই এমনিই—

মানিকদার মন মানল না। বলল, আমাকে দেখেই বুঝি ওরা হাসছে—

—ও কিছু না। তুমি শোনো।

মানিকদা চুপ করে বসে রইল। আমি লক্ষ্য করছিলাম, ওর মুখে আর খুশির চিহ্ন নেই। কেমন বিশ্রী দেখাচ্ছিল ওকে।

একটু পরে মানিকদা জিজ্ঞেস করল— আর কত বাকি— মাস্টার?

—এই ঘণ্টাখানেক। কেন, ভালো লাগছে না?

—তা, মন্দ কী। একটা নিশ্বাস ছেড়ে বলল মানিকদা।

বললাম, বাইরে যাবে মানিকদা?

—শেষ না হলে কি যাওয়া যায়?

—কেন যাবে না। চলো না, একটু ঘুরে আসি।

—তবে চলো। বলেই উঠল পড়ল। যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল।

বাইরে গিয়েও মুখের চেহারা বদলাল না মানিকদার। চুপ করেই ঘুরতে লাগল আমার সঙ্গে। একটু পরে বললাম, চলো, আবার বসি গে।

—তুমি যাও মাস্টার। আমি এখানেই একটু বসি। ভেতরটা বড় গরম।

একাই ঢুকতে হল আমাকে। কিন্তু আমারও আর ভালো লাগছিল না। মানিকদার কথা মনে পড়তে লাগল বার বার। একটু পরেই আবার বেরিয়ে এলাম। কিন্তু মানিকদা তো সেখানে নেই। ব্যস্ত হয়ে তাকে খুঁজতে লাগলাম।

একটু দূরে রাস্তার ধারে বসে এক অন্ধ ভিখিরি গান গাইছিল—

অন্ধ হয়ে ভাই
কত কষ্ট পাই
কাহারে জানাব
জানেন ভগবান

এগিয়ে গিয়ে দেখি, মানিকদা তার কাছে বসে তন্ময় হয়ে গান শুনছে। মুখের দিকে চেয়ে মনে হল, গানের এ সুরটি তার হৃদয়ের তারটিতে যেন শতগুণ শব্দে আজ ঝংকার তুলে দিয়েছে। এমনি করেই সেটি এতদিন বাঁধা ছিল। কিন্তু মানিকদা তা টের পেল আজ।

ধীরে ধীরে মানিকদার কাছে গিয়ে হাত ধরে বললাম, চলো মানিকদা বাড়ি যাই।

একটা ভারী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মানিকদা উঠে এল। দেহটা টেনে তুলতে যেন তার কত কষ্ট হল আজ।

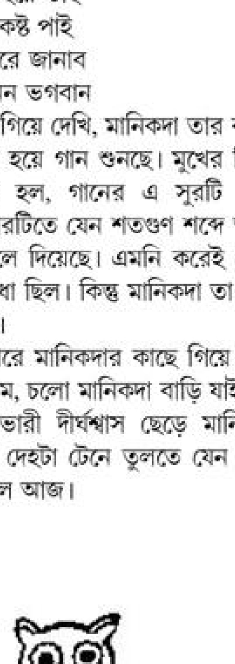

"গুন্টার গ্রাস কলকাতায় আসছেন। আমি তাঁর নাম শুনেছি। তিনি শুধু অত্যন্ত খ্যাতিমান জার্মান লেখকই নন, তিনি অত্যন্ত নামী মূল স্রোতের ভাস্কর ও চিত্রী। আমার তখনই মনে মনে 'ইউরেকা' শব্দটা ভেসে উঠল। গ্রাস আসছেন শুনে আমি আমার ইচ্ছার কথা কলকাতায় ম্যাক্সমুলারের কর্তৃপক্ষকে জানাই। তাঁদের সঙ্গে তো সহজ সম্পর্ক অনেকদিনের। তাই তাঁরা তাঁর আগমনের অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সেদিনের সেই সন্ধ্যায় বহু লোকের মাঝখানে আমি আলাপ করি গুন্টার গ্রাসের সঙ্গে। আমি আমন্ত্রণ করি আমার খুদে আর্ট কলেজ দেখতে। ছাত্রদের সঙ্গে মিলিত হতে। পরদিন ফোন ম্যাক্সমুলার থেকে। উনি সস্ত্রীক আসতে চান কলেজ স্ট্রিটে আমার কলেজ পরিদর্শনে। প্রাক্ সন্ধ্যায় গুন্টার গ্রাস, স্ত্রী উটে গ্রাস এবং দু'জন অতিবিখ্যাত সাংবাদিক আর অতিবিখ্যাত গ্যালারির কর্তাকে সঙ্গে এনেছিলেন।"

১৪

সে সময় স্থানীয় এবং সর্বভারতীয় সংবাদপত্র, বিভিন্ন পত্রপত্রিকা জুড়ে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নানান আজগুবি রসালো টিটকারি মন্তব্য, লেখালিখি চলেছিল। কখনও আমি গুরু হিসেবে ছাত্রদের বশীকরণে অভ্যস্ত, কখনও বহু বিখ্যাত মানুষের সঙ্গে আমার পরিচিতি দেখিয়ে এক সন্দেহভাজন রহস্যময় মানুষ হিসেবে উপস্থাপিত করা, এসব চলেছিল বেশ কিছুদিন। আমি কিছুতেই ভাবতে পারি না এরকম যোগসূত্রহীন, মিথ্যা ঘটনাকে নিয়ে মানুষ কেন প্রচার চালায়? রাজনীতির মানুষদের বা ক্ষমতালিপ্সু মানুষদের নামে হয়তো বিরোধীপক্ষরা এরকম করে থাকে। আমি এত সামান্য মানুষ, ছাত্ররা আমাকে এত ভালোবাসে, তাদের আমি শেখাই, চেষ্টা করি তাদের মূলস্রোতে আনার। বিনিময়ে পাই মাসে পনেরো টাকা, অনেক ছাত্র তাও দিতে পারে না। প্রায় মাসে আমার নিজের টাকা দিতে হয় এই প্রতিষ্ঠান চালাবার জন্য। এ আমার একান্ত ইচ্ছা, স্বপ্নের তাগিদ। কিন্তু তবুও একটা মিথ্যা রটনা আর পাঠকের কাছে রহস্যগল্প তুলে

ধরার চেষ্টা। এই দুঃখের মাঝে সংবেদনশীল কিছু মানুষের সাহচর্য, একান্ত ভালোবাসা চোখের জল মুছিয়ে দেয়। এসব ঘটনা মিটে যাওয়ার প্রায় এক-দেড় মাস পর তৎকালীন কেন্দ্রীয় যোগাযোগমন্ত্রী রামনিবাস মির্ধা একটি বিশেষ আলোচনায় যোগ দিতে আমায় আমন্ত্রণ জানান কলকাতার রাজভবনে। বিষয়টা ছিল এরকম: যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা গুরুত্বপূর্ণ পোস্টাল বিভাগের বড় কর্তা প্রস্তাব রেখেছিলেন, ডালহৌসি পাড়ায় অবস্থিত প্রাচীন প্রধান ডাকঘরটি ভেঙে ফেলে একটি আধুনিক বড় মাপের চোদ্দোতলা অফিস গড়ে তোলা হোক। তাঁরা কারণ দেখিয়েছিলেন, এই প্রাচীন হর্ম্যটি টিকিয়ে রাখা অত্যন্ত ব্যয়বহুল, নানা সময় কর্মচারীদের অসুবিধা হয়, সঠিক সংরক্ষণ করা সাধ্য নয় তাঁদের। অপরপক্ষে চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় স্থানের অকুলান ইত্যাদি। এই ব্যাপারে তিনি কিছু সজাগ শহরপ্রেমী বিভিন্ন পেশায় যুক্ত মানুষকে আহ্বান করেছিলেন মতামত জানানোর জন্য। মনে আছে সাংবাদিক এম জে আকবর, আই টি সি-র বড় কর্তা মিঃ বোস, আরও কয়েকজনের সঙ্গে আমরাও ছিলাম। অন্যদিকে পোস্টাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ মানুষেরা। আমরা সজোরে প্রতিবাদ করি। মনে করি, জি পি ও-র মতো এরকম ঐতিহ্যশালী স্থাপত্যকীর্তি স্থান-অছিলায় ভেঙে দেওয়ার প্রস্তাব হাস্যকর। যে প্রসঙ্গে এ প্রসঙ্গ আনলাম সেখানে ফিরে আসি।

শুধু দিনটি চিহ্নিত করার জন্য পরিপ্রেক্ষিত জানিয়ে সেই মনে-গাঁথা ঘটনাটি 'আমার ছবিজীবনে' প্রকাশ করতে চাই। মিটিং সেরে রাজভবনের পূর্বদ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে আছি শিপ্রা আমি দু'জনে, বাস বা ট্যাক্সি ধরার জন্য। বিগত সময়ের ঘটনাগুলো আস্তে আস্তে অনুচ্চারিত হয়ে এসেছে। সে সময়ে চোখে পড়ল একজন বয়স্ক পথচারী রাস্তার ওপার থেকে আমাকে লক্ষ করছেন। অতি দ্রুত হেঁটে আসছেন আমাদের কাছে। কাছাকাছি আমাদের দিকে এসেও আবার কিছুটা এগিয়ে যান দ্রুততার সঙ্গে। আবার পিছিয়ে আসেন। উল্টোদিকে এগিয়ে যান। আমাদের গা ঘেঁষে। আমরা কিছুটা হতচকিত হই। এরপরে উনি আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েন। বলিষ্ঠ চেহারা, ষাটোর্ধ্ব বয়স। হাতে একটা থলি ও ছাতা। আমার দিকে তেরচাভাবে তাকিয়ে সজোরে বলতে শুরু করলেন, 'এই সেই আপনি শুভাপ্রসন্ন, ছাত্রহন্তা শিল্পী। আপনারা সমাজের উঁচু মাথায় থেকে প্রভাব খাটিয়ে খালাস পেয়ে যান। আমি আন্দামানে থাকি— শিক্ষক, ছাত্রের ব্যথা বুঝি— আমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সব খবর রাখি সংবাদমাধ্যম থেকে। শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকের দুর্নাম আমি সহ্য করতে পারি না। আপনাদের মতো মানুষদের সাজা হওয়া উচিত' ইত্যাদি। সম্পূর্ণ এক অপরিচিত মানুষ, চেহারা দেখে কখনও খারাপ মানুষ বলে মনে হয়নি। অথচ আমার চেহারা চিনতে পেরে সংবাদপত্রে খবর জেনে আমাকে প্রকাশ্যে ধিক্কার দিলেন! আমি তাঁকে কীইবা বোঝাতে পারি? কোথা থেকে শুরু করব? আমাদের দুঃখ, বেদনা, বিস্ময় একাকার হয়ে গেল। কিছু পথচারী ভাবলেন, আমরা কোনও এক বিতণ্ডায় জড়িয়েছি বা কোনও গন্ডগোল ঘটিয়েছি। ভদ্রলোক বেশি সময় নেননি। আবার কিছুটা এগিয়ে উল্টো ফুটপাতের দিকে দ্রুততার সঙ্গে জনারণ্যে মিলিয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে অনেক পথ অতিক্রম করে ফেলেছি। সে ঘটনা থেকে যোজন যোজন দূরে চলে এসেছি। কিন্তু সেই দূরত্ব ছাপিয়ে আজও সেই ভুলবোঝা ভদ্রলোকটিকে দেখতে পাই। দিনটাকে শনাক্ত করতে পারি। হয়তো জীবনপরিক্রমার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেই শব্দগুলো থেকে যায়। একটি মিথ্যা অভিযোগ কীভাবে মানুষকে প্রতারিত করে! আমাদের মন তা মুছতে দেয় না।

জীবনের এইসব অপ্রীতিকর ঘটনা উল্লেখ না করে কী করে থাকি? এসব কেন হয়, কী করে হয় এত বছর পেরিয়েও ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারি না। কত দিন ধরে এসবের জন্য রাগ, অভিমান জমা থাকত। আজ তা আবছা হয়ে গেছে। তবে ঈর্ষা এক ভয়ংকর জিনিস। সামনের কেউ একটু ব্যতিক্রম হলে অনেক অকথিত স্থিতধী, প্রাজ্ঞ, সফল, উচ্চকোটি মানুষরাও মেনে নিতে পারেন না। শরীরের সমস্ত রসায়নে উপযুক্ত পাচক-ক্রিয়া সহায়তা করলেও ধারণক্ষমতার বাইরে কোনও বেপরোয়া খাদ্য প্রবেশ করলে যেমন অম্লতায় ভুগতে হয়, তাকে দমন করার জন্য যেমন শরীরের নির্দিষ্ট রসায়নকে বিলোপ করার অর্থ হয় না, তাকে রেখেই প্রতিকার করতে হয়, তেমনই ঈর্ষার প্রতিষেধক কী জানি না। ঈর্ষা, আমাকেও পীড়িত করে মাঝে মাঝে। তা দিয়ে আমি অন্তরে উত্তেজনা অনুভব করি। কিন্তু সে উত্তেজনা প্রকাশ করে উদ্দিষ্ট কারণে কাউকে আঘাত দিতে চাই না। আমার জীবনে যা কিছু ঘটনা নিজের কাছেই আঘাতের মনোবেদনার এবং হেনস্থার তা সবই তাঁরা

> নাডকার্নি আমার প্রদর্শনীতে বসে আলাপচারিতায় এক পরামর্শ দেন। শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচারিয়া— ইট ইজ টু লং টু রাইট। বেটার টু কাট ইট। শুভাপ্রসন্ন ইজ এনাফ। ইত্যাদি ইত্যাদি। আমিও ভেবে দেখি, সেই মতো স্বাক্ষর-সুবিধায় বাদ দিয়ে দিই ভট্টাচার্য।

দিয়েছেন, যাঁরা মনে করেছেন আমার আচরণে স্পর্ধা আছে। আমি তাঁদের ছত্রছায়ার বাইরে চলে গিয়েছি, তর্জনীকে অস্বীকার করে। কিন্তু আমি তো আমার নিজেরই তাল, লয়ে হেঁটেছি, হাঁটতেই থাকি। আমার জীবনের সবচেয়ে উত্তাল সময় ১৯৭৮ থেকে শুরু করে প্রায় ১৯৮৮ পর্যন্ত। দশ বছর। একদিকে বিপুল জনপ্রিয়তা, নানা ঘটনাপ্রবাহ, অন্যদিকে শত্রুতা, সফলতা গ্রাহ্য না করে পরিকল্পনাকে সফল করার এক উদগ্র বাসনা আমায় খ্যাপা করে রেখেছিল। কোনও বাধা না মেনে ঝাঁপিয়ে পড়তাম স্বপ্ন-ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার কাজে। একদিকে বিরুদ্ধ পরিবেশে পিতৃবলয়ে থেকে ছবিজীবন, রুজিরোজগার, অন্যদিকে, কলেজ ও ভিশুয়াল আর্টস গড়ে তোলা, বহু ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ানো, ব্যক্তিগত প্রদর্শনীর সঙ্গে ছাত্রদেরও প্রদর্শনী ও অন্যান্য কাজে জড়িয়ে থাকা, বিদেশভ্রমণ, নিশ্চিত-অনিশ্চিতের দোলাচলে জীবনযাপন। সভাসমিতি, লেখালেখি, নানা মানুষের আবদারে জড়িয়ে পড়া আর প্রণয় তো ছিলই।

প্রণয়-বিবাহ-যৌবনতরঙ্গে তাপাঙ্কের তাপ, অন্যদিকে বাড়তি স্বপ্ন আর্টস একর গড়ে তোলা, বিখ্যাত মানুষদের সান্নিধ্য, রবিশঙ্কর থেকে গুণ্টার গ্রাস, সত্যজিৎ রায়, শম্ভু মিত্র— এইসব কালজয়ী মানুষের শুধু সান্নিধ্যই নয়, কাছে পাওয়া, অফুরান সময় আলাপচারিতার সুযোগ। আবার, কমার্শিয়াল গ্যালারিকে এড়িয়ে স্বাধীনভাবে প্রদর্শনী,

নামাঙ্কন করে দিলেন গৌরকিশোর ঘোষ— 'আর্টস একর'। কবি বুদ্ধদেব বসুর বিখ্যাত গ্রন্থ 'অ্যান একর অব গ্রিন গ্রাস' থেকে। সন্তোষকুমার ঘোষ সেই ইচ্ছা-স্বপ্নের কথাগুলো লিখে দিয়েছিলেন, ভিত্তিপ্রস্তরে তা খোদাই করে রাখা হয়েছে।

ম্যুরাল করা, কখনও কখনও ভাস্কর্য— এরকম বহু বিচিত্র কাজ আর বিপুল অর্থের জোগান। এসবই অনেক ভারী ওজনের যা বহন করা সত্যিই কঠিন। কিন্তু করেছি। একদিকে সম্মান, ভালোবাসা, ঘরে-বাইরে— অন্যদিকে নিন্দা। আঘাত, শত্রুতা, উন্নাসিকতা সবই পাশাপাশি। এই ঘটনার পরম্পরা আজও আছে। হয়তো যে সঠিক পরিপ্রেক্ষিতের সময় পেয়েছি, আজকের জন্য তা অপেক্ষার বিষয়।

দুটো ঘটনা পরোক্ষভাবে আমাকে বা আমার অবচেতনকে উসকে ছিল। তার ফল আর্টস একর-এর ভাবনা। ১৯৭৫ কী ১৯৭৬ সালের গোড়ায় আমি বম্বের জাহাঙ্গির আর্ট গ্যালারিতে আমার প্রদর্শনী সাজিয়ে আছি। দুপুর থেকেই এই গ্যালারিতে লোকের আনাগোনার বিরাম নেই। পাশেই এক চিলতে বারান্দায় 'সামোভার' নামে একটি অতি জনপ্রিয় রেস্তোরাঁ। জাহাঙ্গির আর্ট গ্যালারির অবস্থান আর ললিতকলা জগতে নানা কারণে তার বিশিষ্টতা শুধু মুম্বই নয় ভারতবর্ষের সব শিল্পীর কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় আজও। সত্তরের দশকে এর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে উঠেছিল। ভারতবর্ষের প্রবাদপ্রতিম শিল্পীরা প্রত্যহ আনাগোনা করতেন এই শিল্পাঙ্গনে। মূলত এর অবস্থান এটির আরও বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠার কারণ হয়েছিল। এম এফ হুসেন, হেব্বার, তায়েব মেহেতা, আরা, সাবাবালা, গাইতন্ডে প্রমুখ অসংখ্য চিত্রশিল্পীর নিয়ত আনাগোনা ছিল। সঙ্গে মঞ্চ ও পর্দার বিখ্যাত নটনটী, পরিচালক, কলাকুশলী, সর্বোপরি বুদ্ধিজীবীদের জমাট ঘাঁটি ছিল জাহাঙ্গির আর্ট গ্যালারি আর গর্ভে অবস্থিত সামোভার রেস্তোরাঁ, যার মালকিন ছিলেন বম্বে সোসাইটির অন্যতম ডাকাবুকো এক সিন্ধি মহিলা। অশোককুমার, তাঁর তনয়া, বাসুদা (বাসু ভট্টাচার্য), রিঙ্কিদি থেকে শুরু করে সবরকমের শিল্পসমালোচকদের আনাগোনায় মুখরিত থাকত জাহাঙ্গির গ্যালারি। কোনও প্রদর্শনী অসফল হয়ে ফিরে আসত না। নিদেনপক্ষে অন্তত দু-চারটি ছবি বিক্রি হত। অন্যদিকে নাডকার্নি, বাসুদেব প্রমুখ সমালোচকরা কিছু না কিছু লিখতেন বহুলপ্রচারিত সংবাদপত্রগুলিতে। আমার মনে আছে, ৭২-৭৩ সাল। তখন নিউজপ্রিন্টের আকাল চলছে। সব সংবাদপত্রই পাতা কমিয়ে দিয়েছে টানাটানির জন্য। নাডকার্নি আমার প্রদর্শনীতে বসে আলাপচারিতায় এক পরামর্শ দেন। শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচারিয়া— ইট ইজ টু লং টু রাইট। বেটার টু কাট ইট। শুভাপ্রসন্ন ইজ এনাফ। ইত্যাদি ইত্যাদি। আমিও ভেবে দেখি, সেই মতো স্বাক্ষর-সুবিধায় বাদ দিয়ে দিই ভট্টাচার্য। এরকম এক দুপুরে এলেন মুল্করাজ আনন্দ। জাহাঙ্গিরের প্রায় উল্টোদিকে তাঁর পত্রিকা-অফিস। বিখ্যাত 'মার্গ' পত্রিকার তিনি সম্পাদক। ফাঁক পেলেই চলে আসেন ছবি দেখতে। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ দিল্লিতে। ঢুকেই সজোরে বলতে থাকেন, দেয়ার আর টু ইডিয়েটস ইন আওয়ার কান্ট্রি। ওয়ান ইজ রজনী প্যাটেল অ্যানাদার ওয়ান সিদ্ধার্থশঙ্কর রে। দে হ্যাভ নো আইডিয়া অ্যাবাউট আর্ট অ্যান্ড কালচার। ইউ আর দ্য ইয়ং স্টার, দ্য পেইন্টার, ইউ শুড ডু সামথিং ফর আর্টিস্ট। ক্রিয়েট এ কমিউন অব আর্ট, গ্র্যাব এ পিস অব ল্যান্ড নিয়ার ক্যালকাটা এয়ারপোর্ট। আস্ক দ্য গভর্নমেন্ট টু অ্যালট দ্য ল্যান্ড। ইফ নট লেটস হাঙ্গার স্ট্রাইক। অ্যান্ড আই উড জয়েন দেয়ার। ডু ইট নাউ। আমি এক উত্তেজনা অনুভব করেছিলাম। তার পরের ঘটনা কয়েক বছর পরে। জার্মানিতে থাকাকালীন কয়েকজন শিল্পীবন্ধুর অনুরোধে যাই ডর্টমুন্ট। প্রায় চোদ্দোজন শিল্পী একত্র হয়ে অপূর্ব শিল্পী-কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। নিষ্পাপ, সবুজ ক্ষেত্র। দোতলা-একতলা মিলিয়ে কুটিরের আকারে গড়ে উঠেছে শিল্পীদের আবাসস্থল আর চর্চাস্থল। সেখানে কেউ ছবি আঁকেন, কেউ মূর্তি গড়েন। বিভিন্ন মাধ্যমে কাজ করে যান তাঁরা। সপ্তাহ শেষে ঘোষণা মতো বহু মানুষ দেখতে আসেন, সময় কাটান। মূর্তি ও ছবি বিক্রি হয়। মতবিনিময় হয়। স্বপ্নের মতো সেই ক্ষেত্র আমায় বেবাক করে তুলেছিল। আমি সেখানে সহজ বন্ধুত্বের সময় কাটিয়েছি। সেই অভিজ্ঞতা আমাকে উসকে দিয়েছিল— বাস্তব থেকে চিরস্থায়ী স্বপ্নে।

কলকাতায় কলেজ অব ভিশুয়াল আর্টস নিয়ে উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল। যে ছাত্রছাত্রীরা পাঁচ বছর কাটিয়ে আমার দৈনন্দিনের সঙ্গী হয়ে থাকত তাঁদের জড়ো করে এক সন্ধ্যায় আমার স্বপ্নের কথা জানাই। আমরাও যদি একটা শিল্পীগ্রাম গড়ে তুলতে পারি। শুধু স্বপ্ন নয়, ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম জমির সন্ধানে। দমদম বিমানবন্দরের ধার ঘেঁষে গোপালপুর মৌজায় খুঁজে পেয়েছিলাম জমি। এক স্থানীয় ফল বিক্রেতা সন্ধান দিয়েছিল তার। ধু-ধু করছে মাঠ, শুধু খেত। কাছাকাছি কোনও জনবসতি ছিল না। এক বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায় সেই অলৌকিক জমি দেখেছিলাম এক ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে। বহু দূরে দেখা যায় এয়ারপোর্টের বেষ্টনী। ভালোমন্দ বিচার না করে মালিকের উৎস সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি। জানা গেল ওই জমি আমাদের একান্ত শ্রদ্ধাভাজন আর কাছের মানুষ শিবনারায়ণ রায়ের পারিবারিক জমি। বহুকাল আগে বরিশাল থেকে এসে ওই গ্রামে সংস্কৃতজ্ঞ এবং পণ্ডিত শিববাবুর পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায় টোল করেছিলেন। ওই জমিটির মাঝামাঝি ইটের টিলায় একটা ধ্বংসস্তূপের অস্তিত্ব ছিল। সন্ধান পেয়েই চলে যাই শিববাবুর কাছে। উনি তখন ওঁর জীবনকথা জানান। সে প্রসঙ্গে বলেছিলেন, যুদ্ধের সময় ইংরেজরা বিমানবন্দর-সংলগ্ন ওই জায়গাটিতে মিলিটারিদের ঘাঁটি করেছিল। সে জন্য তাঁর পিতার সমস্ত পুঁথিপত্র গুঁড়িয়ে দিয়ে মাঝখান দিয়ে চওড়া রাস্তা গড়ে তুলেছিল। আর নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল তাঁদের জন্মভিটা। স্বাধীনতার পর স্বাধীন সরকার সেগুলো উদ্ধার করেন। আর পুরনো রেকর্ড অনুযায়ী তাদের পরিবার ফেরত পায় সেই জমি। ইতিমধ্যে তাঁরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এবং এই খণ্ডটি ওঁরই পাটনানিবাসী এক ভাইঝিকে দান করে দিয়েছিলেন তাঁরা। এই সূত্র ধরেই আমরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করি। তিনি সম্মতি দেন, আমরা কিনে নিই সেই জমি। আমাদের জীবনের চলার পথে কতবার যে 'ইউরেকা' উচ্চারণ করি তা বলার নয়। আমি আমার ছাত্র-সহযোগীদের একত্র করে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ি। স্বপ্নের শিল্পীগ্রাম গড়ে তোলার কাজে।

১৯৮৪-এ 'আর্টস একর'-এর স্থাপন অনুষ্ঠানে বাঁদিক থেকে মৃণাল সেন, চিন্তামণি কর, সন্তোষকুমার ঘোষ, শুভাপ্রসন্ন, পণ্ডিত রবিশঙ্কর, শিবনারায়ণ রায় এবং অশোক মিত্র

আজ ভাবলে অবাক লাগে কত মানুষের ভালোবাসা, উৎসাহ আর অদম্য শক্তিতে, মনোবলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম সেই কাজে। এখন শুধুই ইতিহাস সব। আমরা নিজেদের সঞ্চিত কিছু টাকা জড়ো করে সেই জমি কিনে কল্পনার ট্রাস্ট তৈরি করে পণ্ডিত রবিশঙ্করকে অনুরোধ করি, সেই স্বপ্নের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার জন্য। কলকাতা থেকে তখন তার দূরত্ব অঙ্কে নয়, কিন্তু অজানা মনে পাড়ির মতো, তেপান্তরে পৌঁছনোর মতো চিহ্নহীন এক প্রান্তরে সেই জমি। যেখানে ছায়া দেওয়ার মতো কোনও বৃক্ষ ছিল না! ৩ মার্চ ১৯৮৩, নির্দিষ্ট দিনেই সেই শিল্পীগ্রামের সূচনা হল। পণ্ডিত রবিশঙ্কর, মৃণাল সেন, সন্তোষকুমার ঘোষ, গৌরকিশোর ঘোষ, চিন্তামণি কর, অশোক মিত্র, শিবনারায়ণ রায়, ভবেশ সান্যাল, অম্লান দত্ত— কে ছিলেন না! কত মানুষের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ সাহায্য, ভালোবাসা পেয়েছি। চিন্তামণি কর তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'শুভার কাছে নিশ্চয় আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ আছে, তা না হলে এই ধু-ধু প্রান্তরে শিল্পীগ্রাম গড়ে তোলার ভাবনা করছে কী করে। আমার চোখের সামনে অসংখ্য বিখ্যাত মানুষকে কী কৌশলে জড়ো করেছে শুভা! ঢাকা আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ আমিনুল ইসলাম থেকে শুরু করে কত মানুষ, কত শিল্পী জড়ো হয়েছেন এখানে।' নামাঙ্কন করে দিলেন গৌরকিশোর ঘোষ— 'আর্টস একর'। কবি বুদ্ধদেব বসুর বিখ্যাত গ্রন্থ 'অ্যান একর অব গ্রিন গ্রাস' থেকে। সন্তোষকুমার ঘোষ সেই ইচ্ছা-স্বপ্নের কথাগুলো লিখে দিয়েছিলেন, ভিত্তিপ্রস্তরে তা খোদাই করে রাখা হয়েছে। সমস্ত সংবাদপত্র পরদিন প্রথম পাতায় সে ঘটনার খবর গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করেছিল। একদিকে আমরা, আমার ছাত্রছাত্রী আর হ্যাঁ, শিপ্রাকে নিয়ে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় মেতে উঠি। অন্যদিকে চলে পরিকল্পনা। নকশা আর অন্যান্য বহু কাজের। চারদিকে আমি রঙিন বুদবুদ দেখি। হাওয়ার ধাক্কায় কিছু কিছু মিলিয়ে যায়। আবার সেজে ওঠে নিটোল বুদবুদ। আমরা ভিত গড়তে নামি, মাটির তলায় ঢুকে যায় হাজার হাজার টাকা। বুনিয়াদ তো মজবুত করতে হবে। দায়িত্ব দিয়েছি আমার বহুকালের চেনা এক রাজমিস্ত্রি সইফুদ্দিনকে, মজুর হিসেবে আমাদের কলেজ রোর বাড়িতে কাজ করতে এসেছিল। আস্তে আস্তে সে রাজমিস্ত্রি হয়। পরে তার দক্ষতা, স্বাভাবিক বুদ্ধিতে, নির্মাণকৌশল এত ভালো জেনেছিল যে, তাবড় তাবড় স্থপতি বা নকশাকারকেও ওর কাছে হার মানতে হত। আমি খুব নিশ্চিন্ত ছিলাম ওকে দায়িত্ব দিয়ে। কত বার খেটে সময়মতো মজুরি না পেয়ে যেসব মানুষেরা একদিন উৎসাহ দিয়েছেন, বাহবা দিয়েছেন তাঁরা ক্রমশ নানান অপপ্রচার দিতে চেষ্টা করলেন। তার যে কত চাপ কত বার তা দেখেছি, বিস্মিত হয়েছি। আর্টস একর গড়ে তোলা সেই সময়ের সামাজিক প্রেক্ষাপটে কত বড় চ্যালেঞ্জের ছিল, তা এখন ভাবলে অবাক লাগে। আমি এগিয়ে চলি। সে সময় ক্যালকাটা পেন্টার্স আর কনটেমপরারি আর্টিস্ট এইসব দলের মানুষদের সঙ্গে আমার কিছুটা দূরত্ব হতে থাকে। আমার কোনও ফুরসত নেই। ছাত্রছাত্রী আর আর্টস একরকে নিয়ে সকাল-সন্ধ্যা কাটে, কিন্তু বিরোধী শক্তিরা এমনি-এমনিই ডালপালা বিস্তার করতে থাকে। আমাদের এ বসুন্ধরা যত উর্বরই হোক না কেন, মুক্ত আকাশ যতই নিষ্কলঙ্ক হোক না কেন, এই প্রকৃতি যতই উদার হোক না কেন, সেই আকাশ আর শ্যামলিমার মাঝে যে মনুষ্যসমাজ সে সমাজ কখনই নিষ্কলঙ্ক না, সরল না। এ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে যেমন সহজভাবে শ্যাওলা বিস্তারলাভ করে, তেমনি সমাজে বিস্তারলাভ করে কুটিলতা, জটিলতা,

১৯৮২। শিল্পমেলার উদ্বোধনে এম এফ হুসেন (মধ্যে) এবং পরিতোষ সেন

ঈর্ষাকাতরতা, শত্রুতা— এমনি এমনি গজিয়ে ওঠে গুল্মের মতো। কতটা আর আমরা এড়িয়ে চলতে পারি? সে আগাছা থেকে কত আর সাবধানে চলতে পারি? আমাদের পথ তো সেই গুল্মের জঙ্গল দিয়ে ঘেরা। সারা বছর মেতে থাকি নানান পরিকল্পনা নিয়ে। ছাত্ররাই তখন আমার ভাবনা-চিন্তা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেরণা-ভরসার একমাত্র সহায়, উৎস। এর মধ্যেই ছবি আঁকা চলে। বিভিন্ন প্রদর্শনীর ডাক পাই। সুযোগ পাই। ডাক আসে বিদেশে যাওয়ার। সেখানে বিদেশি শিল্পীবন্ধুদের কাছে আর্টস একরের কথা পাড়ি। কত বন্ধু উৎসাহিত করে। তারাও এগিয়ে আসে সাহায্য করার জন্য। আমাদের দেশেও রাজ্যের বিভিন্ন শিল্পীরা খুব আশাবাদী হন। কলেজ অব ভিশুয়াল আর্টসের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে, আর্টস একরের সমভাবী শিল্পীদের নিয়ে মেলা করি। পার্ক হোটেলের সুবিখ্যাত শিল্পপতি জিৎ পাল মহাশয় আমাকে প্রশ্রয় দেন। তাঁরই অফিসের তলায় পার্ক হোটেলের পাশে পার্ক স্ট্রিটের রাস্তার ধারে ওঁদের ছোট্ট ভূখণ্ডে সবাইকে জড়ো করে মেলার আয়োজন হয়। সাজিয়ে দেন জিৎ পাল। ছাত্রছাত্রীরা খুব উৎসাহিত বোধ করে। ছবি বিকিকিনি হয়। একবার মেলা সাজাচ্ছি, পরদিন তার উদ্বোধন। হঠাৎ দেখি, ওপার থেকে রাস্তা ক্রস করে খালি পায়ে হুসেন এগিয়ে আসছেন। ঝপ করে তাঁকে ধরি। বলি, আগামীকাল সন্ধেবেলা আপনাকে আসতে হবে আর এই মেলার উদ্বোধন করতে হবে, রাজি হয়ে যান। সাধারণত উনি খুব সচেতন ও খেয়ালি। কথা দিলেই যে আসবেন তা নয়। আমি বলেছি, উনি কথা দিয়েছেন— কিন্তু উনি আসবেন বলে গেলেও উত্তেজনা রাখিনি। আমাদের মধ্যে পরিতোষ সেন যিনি প্রবীণ আর সকলের সুপরিচিত তাঁকেও জানিয়ে দিলাম মেলার উদ্বোধক হিসেবে আসতে। সময়মতো যখন উদ্বোধনের মুহূর্ত এল— পরিতোষবাবু উল্টোদিকে দাঁড়িয়েছেন— আমরা পাশে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় হুসেন এসে উপস্থিত। তখন আমি বুদ্ধি করে ডেকে নিয়ে যৌথভাবে কাঁচি ধরিয়ে ফিতে কাটার ব্যবস্থা করি। মেলা জমে যায়। পরোক্ষভাবে আর্টস একরের পরিচিতি বাড়তে থাকে। তখনও বাড়িঘর গড়ে ওঠেনি। ভিতের কাজ চলছে। কীভাবে সম্পূর্ণ হবে সেই দুশ্চিন্তায় দিন কাটে। মনে হয় এবার ফুরিয়ে আসছে দাতাদের সংখ্যা। কখনও ভাবি, প্রদর্শনী করে যদি অর্থ সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু সে-ই বা ভাবি কী করে? এমন সময় কাগজে জানতে পারি, গুন্টার গ্রাস কলকাতায় আসছেন। আমি তাঁর নাম শুনেছি। তিনি শুধু অত্যন্ত খ্যাতিমান জার্মান লেখকই নন, তিনি অত্যন্ত নামী মূল স্রোতের ভাস্কর ও চিত্রী। আমার তখনই মনে মনে 'ইউরেকা' শব্দটা ভেসে উঠল। বহুদিন আগে স্বপ্নের বীজ যখন অঙ্কুরিত হচ্ছিল, তখন ভেবেছিলাম কোনও এক জগদ্বিখ্যাত শিল্পীকে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে নিয়ে আসব। প্রথম দিকে প্যারিসে থাকাকালীন যখন মার্ক শ্যাগল, ম্যাক্স আর্নেস্ট এঁরা জীবিত, খুব ভাবতাম, এঁদের সঙ্গে দেখা করি। আমার পুরনো আকাঙ্ক্ষা জেনেভা থেকে। যেমন জেনেভায় থাকাকালীন চার্লি চ্যাপলিনের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত আমার সুইস বন্ধুটিকে ঠিকঠাক দিন বলতে না পারায়, কিংবা বোঝাতে না পারায়, তাঁর সঙ্গে শেষপর্যন্ত দেখা হয়নি। সে ক্ষোভ স্মৃতির মাঝে চাপা। তেমনই ইচ্ছে মনে রাখলেও শ্যাগল বা আর্নেস্টের কাছে পৌঁছনোর কোনও চেষ্টা করা আর হয়ে ওঠেনি। মনে মনে ভেবেছিলাম, এইরকম মানুষদের যদি আনতে পারি কলকাতায়! তা আর বাস্তবে হয়নি। কিন্তু গ্রাস আসছেন শুনে আমি আমার ইচ্ছার কথা কলকাতায় ম্যাক্সমুলারের কর্তৃপক্ষকে জানাই। তাঁদের সঙ্গে তো সহজ সম্পর্ক অনেকদিনের। তাই তাঁরা তাঁর আগমনের অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সেদিনের সেই সন্ধ্যায় বহু লোকের মাঝখানে আমি আলাপ করি গুন্টার গ্রাসের সঙ্গে। আমি আমন্ত্রণ করি আমার খুদে আর্ট কলেজ দেখতে। ছাত্রদের সঙ্গে মিলিত হতে। পরদিন ফোন ম্যাক্সমুলার থেকে। উনি সস্ত্রীক আসতে চান কলেজ স্ট্রিটে আমার কলেজ পরিদর্শনে। আমার কী সৌভাগ্য! যাঁকে চেয়েছি মনে মনে তিনি আমার কাছে পৌঁছে গেলেন। প্রাক্ সন্ধ্যায় গুন্টার গ্রাস, স্ত্রী উটে গ্রাস এবং দু'জন অতিবিখ্যাত সাংবাদিক আর অতিবিখ্যাত গ্যালারির কর্তাকে সঙ্গে এনেছিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা কলেজে রইলেন ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে। আলাপচারিতায় কাটল সে সুন্দর সময়। প্রায় উল্টোদিকে আমার স্টুডিও আর বাড়ি। রাত্রে আহারের আমন্ত্রণ করেছিলাম। সবে আমাদের কন্যা হয়েছে। তার বয়স ১ বছরের কাছাকাছি। শিপ্রা রান্নাবান্না করেছে। ওঁরা আসেন। আমার ছবি খুব কৌতূহলী হয়ে দেখেন। খাওয়া-দাওয়া হয়। বন্ধু হয়ে যান অল্প সময়ে। মুগ্ধ হয়ে যান আতিথেয়তায়।

ক্রমশ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য একটি সাক্ষাৎকার

অ.চ. আপনি এখন কী লিখছেন?

স.ভ. জীবনানন্দ সম্পর্কে লিখছি। জীবনানন্দের কবিতা নিয়ে দশটা প্রবন্ধ লিখবো, কবিতার পঙক্তি ধ'রে ধ'রে আলোচনা। অনেক কবিতায় দেখছি— একই পঙক্তি থেকে ভিন্ন-ভিন্ন অর্থ উঠে আসছে, আমি সেভাবেই লিখছি, ঠিক 'কবিতা-পরিচয়'-এর মতো নয়।

অ.চ. জীবনানন্দ নতুন করে পড়তে গিয়ে আপনার কীরকম ধারণা তৈরি হচ্ছে? আগে যা ছিল তার চেয়ে অন্যরকম কিছু?

স.ভ. আমার ধারণা ডেভেলপ করছে। আমি সেসময় বলেছিলাম জীবনানন্দ আমাদের যুগের কবি। আমার সে-ধারণা এখনো ঠিকই আছে। এখন, আমার মনেই ডেভেলপ করছে ওঁর কবিতা, না ওঁর কবিতাতেই সেই ডেভেলপমেন্টের বীজ আছে, সেটা আমি ঠিক বলতে পারি না। এখনো যখন আমি 'বনলতা সেন' পড়ছি, অন্য মানে পাচ্ছি— আগে যা ব্যাখ্যা করেছিলাম তা থেকে ভিন্ন।

অ.চ. আপনি বললেন, 'জীবনানন্দ আমাদের যুগের কবি', 'জীবনানন্দের সমসাময়িক আর-কোনো কবি সম্পর্কে একথা আপনার মনে হয় না?

স.ভ. না। জীবনানন্দ আমাদের মনে, বিশেষ করে আমার মনে, যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন, আর কোনো কবি তেমন নয়। তাঁদের কবিতা আমার মনে হয়েছে বানানো কবিতা।

মা.ব. 'আমাদের যুগ' বলতে আপনি কী বোঝাচ্ছেন?

স.ভ. চারের দশক পর্যন্ত, তিন আর চারের দশক— এই সময়টা। চারের দশকে অরুণ মিত্র একবার ঘোষণাই করেছিলেন, জীবনানন্দ আমাদের কবি। এর মধ্যে অনেক কবিই জীবনানন্দের দ্বারা খুবই প্রভাবিত হয়েছেন— যাঁরা কমিউনিস্ট-দলে যান নি তাঁদের অনেকেই, বা যাঁরা কিছু কিছু অন্য ধরনের কবিতা লিখতে চেষ্টা করেছেন। তাছাড়া সবচেয়ে বড় হচ্ছে ভাষা। একবার প্রেমেন্দ্র মিত্র আমাকে বলেছিলেন, 'জীবনানন্দ যে-ভাষায় লিখছেন সেই ভাষাটা হাওয়ায় ছিল, এটা হয়তো আমরা সবাই লিখতে পারতাম কিন্তু প্রথম লিখলেন জীবনানন্দ।' প্রেমেন্দ্র মিত্রও পারেননি, অন্য কেউও পারেননি। আমাদের যে-ভাষায় কথা বলা উচিত ছিল, সে-ভাষা আমরা বলতে পারিনি। প্রথম পেরেছেন জীবনানন্দ।

অ.চ. এই দিক থেকে আপনার নিজের কবিতা সম্পর্কে আপনার কী মনে হয়?

স.ভ. তুমি যদি কবিতা লিখে থাকো, তুমি জানো, সবাই স্বতন্ত্র হতে চায়।

অ.চ. প্রবন্ধ ছাড়া, যাকে বলে ক্রিয়েটিভ লেখা, সেরকম কিছু লেখার কথা এখন ভাবছেন না?

স.ভ. সেরকম আমি খুব সম্প্রতি একটা লিখে দিয়েছি একটা কাগজে— ছোট মতন উপন্যাস; এটা বড় হতো, তবে ওঁদের অনুরোধে আমি এটাকে শেষ করে দিয়েছি।

অ.চ. আপনার নিজের অতৃপ্তি বোধ হয়নি যে অন্যের তাগিদে লেখা ছোট করতে হলো?

স.ভ. কী করবো, আমার টাকার দরকার ছিল। লেখাটা আমি আবার বাড়াবো, লেখাটার নাম বারান্দা, এ-নামই পালটে যাবে।

অ.চ. কবিতায় আপনি কি খুব বেশি অদল-বদল করার পক্ষপাতী?

স.ভ. না।

অ.চ. 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত আপনার 'বৌ' কবিতাটি 'উর্বর উর্বশী' বইয়ের অন্তর্ভূত করার সময় তো কবিতাটিতে অনেক বদল ঘটিয়েছিলেন, এমনকি নাম পর্যন্ত?

স.ভ. অন্যায় হয়েছে।

মা.ব. তাহলে কি 'কবিতা'য় যেটা ছিল সেটাই আপনার বেশি পছন্দ?

স.ভ. হ্যাঁ, 'কবিতা'য় যেটা ছিল, সেটাই ভালো ছিল।

সু.রা.চৌ. কেন আপনি কবিতায় পরিমার্জনার পক্ষপাতী নন?

স.ভ. কারণ পরে যে-বদলটা হচ্ছে সেটা রীজন-এ হচ্ছে— কবিতা রীজন-এর ওপর নির্ভরশীল নয়।

অ.চ. কবিতার সবটাই রীজন-এর ওপর নির্ভরশীল নয়— এই কি আপনার বক্তব্য?

স.ভ. সবটা কেন, কোনোটাই নয়। এই শতকে, এই ইনডিটারমিনিজম-এর যুগে কার্যকারণ, রীজন— এই সবের কি কোনো মূল্য আছে? সায়েন্টিফিক ওয়ার্ল্ড তো প্রায় মিস্টিক ওয়ার্ল্ডে চলে যাচ্ছে। এলিঅটের 'ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এ আছে না যে, 'কোনো ক্রপ বুনেছিল কি, যার ফসল হলো?' সেইরকমই যেন মানুষের বীজ থেকে একটা গাছ হয়ে যেতে পারে। এও একটা সম্ভাব্য ব্যাপার। যাই হোক, কবিরা এতে মজা পায়। হয়তো কবিদের সবাই পাগল— যাকে বলে উৎকেন্দ্রিক। তাহলে আইনস্টাইনও উৎকেন্দ্রিক, ম্যাক্স প্লাঙ্কও তা-ই, জেমস জীনসও— তাঁরা সবাই।

অ.চ. 'প্রবেশ-প্রস্থান' কবে বেরিয়েছিল?

স.ভ. বছর দুয়েক হলো। 'প্রবেশ-প্রস্থান' আমার শেষ সত্যিকারের উপন্যাস। ওটা আমি কারো অনুরোধে লিখিনি, নিজের জন্য লিখেছিলাম। বেশ বড় লেখা। তারপর যেগুলো লিখেছি সেগুলো টাকার জন্য লিখেছি— গল্পকে একটু বড়-করা। 'খবর' নামে একটা উপন্যাস লিখেছিলুম, গল্প বড়-করা, গল্পও হতে পারতো। তারপর আর-একটা লিখেছি 'যদিও সন্ধ্যা', ওটাও গল্প হতে

পারতো। এগুলো পত্রিকার জন্য লেখা। ওঁরা চেয়েছিলেন, আমারও টাকার দরকার, তাই লিখে দিয়েছি। 'বারান্দা' আমি নিজে থেকেই লিখছিলাম, কিন্তু আমারও টাকার দরকার, ওঁরাও চাইলেন, তাই আর ওটাতে কিছু ক'রে ওঠা গেল না। এগুলো ঠিক উপন্যাস নয়, এগুলো আমার দেরাজের মধ্যে পড়ে আছে, বইআকারেও ছাপিনি।

অ.চ. গল্পকে বাড়িয়ে যখন উপন্যাস করেন, তখন সেই বাড়তি অংশগুলো কীভাবে আসে?

স.ভ. মূল গল্পটার যে বক্তব্য ছিল, সেটা থাকে; কিছু কিছু পার্শ্বচরিত্র আনা হয়— গল্পটাকে একটু কালারফুল করার জন্যে। পার্শ্বচরিত্রগুলো হয়তো একেবারে অবান্তর হয় না, মূল চরিত্রগুলোর সঙ্গে তাদের যুক্ত করে লেখাটা কিছু-কিছু বাড়িয়ে দেওয়া হয়। গল্প সরল রেখায় চলে যায় আর উপন্যাস একটু ছড়িয়ে বসতে চায়, তাতে ছোটগল্পের মতো অতোটা গতি থাকে না। গতি কমাবার জন্যে চরিত্র কিছু বেশি আনতে হয়। গল্পে একটা সিচুয়েশন হয়তো একটা অনুচ্ছেদে ব'লে গেলাম, উপন্যাসে তাই নিয়ে একটা পরিচ্ছেদ হয়ে গেল। বাড়াতে গেলে এইরকম হয়। এ আমার খুবই খারাপ লাগে। তবে নেহাৎ আমার দরকার হয়ে পড়েছিলো—

মা.ব. উপন্যাসে কি গল্পের অংশটা প্রধান ব'লে আপনার মনে হয়?

স.ভ. আমার উপন্যাস সম্পর্কে মোটের ওপর এই বলতে পারি যে, আমি কোনোদিন গল্প ভেবে উপন্যাস লিখিনি। আমি চরিত্র ভেবে উপন্যাস লিখি।

মা.ব. একটা বিশেষ সময়ের মধ্যে কতকগুলো চরিত্র— এই রকম?

স.ভ. বিশেষ ক'রে একটা চরিত্র। আমি 'সৃষ্টি'তে চরিত্রের চেয়ে বড় কিছু ধরেছিলাম— একটা মানুষ। একটা মানুষকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা— কতভাবে দেখা যায়।

অ.চ. আপনার উপন্যাস বা বিশেষ কোনো উপন্যাস অন্তত পরোক্ষভাবেও কি আত্মজীবনীমূলক?

স.ভ. হ্যাঁ। আমার আত্মজীবনী খানিকটা আছে 'মৌচাক'-এ, খানিকটা আছে 'সৃষ্টি'তে, আর খুব বেশি আছে 'প্রবেশ-প্রস্থান'-এ। তবে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের একটা অসুবিধা আছে। একজনের জীবন নিয়ে লেখা অথচ মৃত্যু ছাড়া তার শেষ হয় না। প্রবেশ-প্রস্থানে সেই কারণেই একজন উপনায়ক তৈরি করা হয়েছে। একটা পরিচ্ছেদ নায়ক ব'লে যাচ্ছে, একই সময়ে আবার তার বন্ধুও ব'লে যাচ্ছে। এ-লেখাটার টেকনিক 'সৃষ্টি'রই মতো, কিন্তু পুরোপুরি নয়।

অ.চ. এই যে বিশেষ একটা উপন্যাস লেখার সময় বিশেষ একটা টেকনিক আপনি গ্রহণ করেন, সেটা আপনার মাথায় কীভাবে আসে?

স.ভ. আমি উপন্যাস লিখবো ভাবিনি, কেননা আমার মনে হতো— উপন্যাস তো অনেকদিন ধ'রেই লেখা হচ্ছে, তাহলে আমি আর কেন লিখবো? তখন আমি এই একটা দেখলাম যে বাঙলা উপন্যাসে টেকনিক নিয়ে কাজ হয়নি। সেসব সরল রেখার ধরনে বা সময়ের পুরনো ধারণা থেকে লেখা: সময় একটা সরল রেখার মতো পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি ভাবলাম, আমি একটা প্রেমকাহিনী লিখবো বা আর-কিছু লিখবো, যা-ই লিখি, অন্তত টেকনিকটা নতুন করবো। উপন্যাসে আমি সময়ের নতুন ধারণা প্রয়োগ করলাম— সময় যেন একটা বৃত্তের মতো; উপন্যাসটার নামও 'বৃত্ত'। ফর্মটা তৈরি হয়েছে আমার বিষয়বস্তু থেকে, তা নয়; টেকনিক ভেবেছি, বিষয়বস্তু দিয়ে ভরতি করা হয়েছে। আমার দ্বিতীয় বা তৃতীয় উপন্যাসও এভাবে লেখা। তারপর যেগুলো লিখেছি, সেখানে বিষয়বস্তু টেকনিক তৈরি করেছে।

অ.চ. কিছুকাল পূর্বে আপনি যে-উপন্যাসটা শেষ করলেন, ওটা লিখতে গিয়েও কি আপনাকে টেকনিকের সমস্যা নিয়ে নতুন ক'রে ভাবতে হয়েছে।

স.ভ. এখানে সমস্যাটা টেকনিকের নয়। আমি ভেবেছিলাম ওখানে একটা নতুন ধরনের চেতনাপ্রবাহের প্রবর্তন করবো। আমার মনে হয়েছে, একটা মেয়ের চেতনার প্রবাহ যা, যেরকম হয়, একটা ছেলের তা হয় না; একটা শিক্ষিত লোকের যা হয়, একটা অশিক্ষিত লোকের তা হয় না। আমার এই ধারণা— ধারণা নয়, শিক্ষা— হয়েছে ভার্জিনিয়া উলফ বা অন্যান্যদের লেখা প'ড়ে— একটা মেয়ে যখন নিঃসঙ্গ অবস্থায় ভাবছে, তখন তার কোনো বাক্যের পর যতি থাকে না। অথচ ব্যাপারটা সরলভাবেও চলে না, জটিল বহুমুখী রূপ তার। আবার তার থেকে কিছু কমিউনিকেটেড হয়ও বটে। অনেকটা এইভাবে ভাবতে চেষ্টা করেছিলাম, তবে লেখাটা তো মাঝপথেই থেমে গেল। লিখতে লিখতে হয়তো অন্যরকম হয়ে যেতো। সব সময়ে ঠিক করে বলা যায় না, কবিতার মতোই।

অ.চ. লেখার সময় আগেকার বাঙলা সাহিত্যের অভিজ্ঞতা কীভাবে আপনি ব্যবহার করেন?

স.ভ. বাঙলা উপন্যাসের কথা আমি ভাবিনি। কোনো উপন্যাস লিখতে বাঙলা উপন্যাসের কথা ভাবি না। কবিতা লিখতেও বোধহয় আমার সামান্য যা বিদেশী কবিতা পড়া তার কথাই আমি ভাবি।

অ.চ. আপনি উপন্যাসে যে নানারকম টেকনিকের কথা ভেবেছেন, কবিতার ক্ষেত্রে সেরকম কিছু ভেবেছেন?

স.ভ. আমি যখন কবিতা লিখতে শুরু করি, তখন আমি জানতাম না, আমি কী কবিতা লিখছি। ৩০ সালে আমি বি এ পাশ করি, ৩২ সালে 'পূর্বাশা' বার হয়। তখন আমি ঠিক মতন কবিতা লিখতে শুরু করি— কাগজের জন্য। তখন কয়েকটি কবিতা ছাপা হয় সুধীন্দ্রনাথের 'পরিচয়' পত্রিকায়। ছাপা হয়, কিন্তু কী ধরনের কবিতা আমি লিখতাম সে-সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। এই ধরনের কবিতা লিখবো কি অন্য ধরনের কবিতা লিখবো— তেমন ভাবনা আসেনি। তারপর সুধীনবাবুর মুখে আমার কবিতার প্রথম সমালোচনা শুনি। তিনি বলেছিলেন, 'আপনার লিরিকগুলো নৈর্ব্যক্তিক হয়।' কথাটা আমাকে অনেক ভাবিয়েছে, পরে আমি বুঝতে পেরেছি। আমার লিরিককে তিনি তখনকার দিনে উৎকৃষ্ট বলে মনে করতেন; যদিও বিন্দুমাত্র মেলে না আমার কবিতা তাঁর কবিতার সঙ্গে। যাই হোক, তাঁর কথা থেকেই আমি বুঝলাম, এগুলি লিরিক হচ্ছে এবং নৈর্ব্যক্তিক হচ্ছে। তখনো এই কবিতাগুলি বড় হতো না। বড়জোর চোদ্দ কি ষোল পঙক্তি। কিন্তু আমি লিরিক

লিখবো, না অন্য কিছু লিখবো, আগে থেকে কখনো আমি তা ঠিক করিনি।

অ.চ. কবিতা লেখার প্রথম পর্বে নিজের মধ্যে আপনি কি অন্য কোনো কবির প্রভাব বোধ করেছিলেন?

স.ভ. না।

অ.চ. আপনি নতুন কিছু লেখারই চেষ্টা করতেন?

স.ভ. হ্যাঁ, চেষ্টা করতাম যাতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব না আসে। আর কারো কথা মনে হয়নি। বুদ্ধদেব তখন 'বন্দীর বন্দনা' ইত্যাদি লিখছেন। আমার ওসব ভালো লাগতো না। তাই আমার কবিতা হতো ভিন্ন ধরনের। একেবারেই ওঁদের মতো নয়।

অ.চ. আপনার মনে যে আবেগ আসে, আপনি কি তাকে সরাসরি কবিতায় ধরে দিতে চান, না কি তাকে বুদ্ধিগত স্তরে নির্বাচন বা পরিমার্জনা ক'রে নিয়ে রূপ দেন?

স.ভ. কবিতা লেখবার তো কোনো সময় নেই। কোনো সময় হয়তো টেন্স হয়ে এলো আমার মনটা— হয়তো কবিতার একটা পঙক্তি এলো, একটা দুটো তিনটে কি চারটে পঙক্তি এলো, কোনোরকম চেষ্টা নেই কিছু নেই— আগে আসতো সমস্ত কবিতাটাই, আমি লিখে ফেলতাম— কেউ যেন ডিকটেট করে গেলো, আমি লিখে গেলাম।

মা.ব. অর্থাৎ রিলকে প্রভৃতি যাকে অটোমেটিক রাইটিং বলেন আপনি বোধহয় তার কথাই বলছেন?

স.ভ. ও-জিনিসটা বোধহয় এখন ঠাট্টার ব্যাপার হয়ে গেছে, রোমান্টিক কবিরা ছাড়া এখন অটোমেটিক রাইটিং কেউ লেখেন না। যাই হোক, কবিতার মধ্যে একটা রীজনও প্লে করে। হয় কি, আমি হয়তো চারটে পঙক্তি লিখলাম ওতে একটা কিছুই হয়তো দাঁড়ালো না, হয়তো একটা খসড়া হলো, তখন রীজন আসে। হয়তো ভাষার কথা ভাবতে হচ্ছে, একটা ওয়ার্ড-এর কথা ভাবতে হচ্ছে— কলমটা একটু থামলো, আর না হয় হয়ে গেলো তো হয়েই গেলো। আমি সচেতনভাবে সিম্বল বা ইমেজ তৈরি করার চেষ্টা করিনি, যদি ওসব এসে গেলো তো গেলো।

সু.রা.চৌ. আপনি বলছেন যে উপন্যাসের ব্যাপারে যেরকম সচেতনভাবে টেকনিক নিয়ে ভেবেছেন, কবিতায় সে-রকম করেন নি? কবিতা কি আপনার কাছে বেশি স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়?

স.ভ. কবিতা সম্বন্ধে আমি একসময় বলেছিলাম, যা আমি কোনো প্রবন্ধে লিখতে পারিনি বা উপন্যাসে বলিনি তা-ই কবিতায় বলেছি। এখনো এই কথা বলি।

মা.ব. কবিতা, না উপন্যাস, লেখক হিশেবে কাকে আপনি প্রাধান্য দেবেন? প্রকাশের মাধ্যম হিশেবে কোন পদ্ধতিকে আপনার বেশি অনিবার্য মনে হয়েছে?

স.ভ. এটা তো আমি ঠিক ভেবে দেখিনি।

অ.চ. কবিতা ও উপন্যাস লেখায় আপনার কি আনন্দের তারতম্য ঘটে?

স.ভ. দু-একটা কবিতার বেলা তা হয়েছে, লিখে আনন্দ পেয়েছি।

অ.চ. আপনার 'পৃথিবী' বেরিয়েছিল ১৩৪৬-এ। ১৩৫৪ সালে প্রকাশিত 'সংকলিতা'য় অন্যান্য কবিতার সঙ্গে 'পৃথিবী' ও 'সাগর' থেকেও কিছু কবিতা ছিল। 'সাগর' কোন সালে বেরিয়েছিল?

স.ভ. ১৯৩৭-এ। সেই আমার প্রথম কবিতার বই।

মা.ব. এরকম দাবি করা হয় যে 'কল্লোল' কবিতায় গল্পে উপন্যাসে নতুন সাড়া এনেছে, আপনি মানেন?

স.ভ. কল্লোলের লেখকেরা ইনডিভিজুয়াল, তাঁদের মধ্যে বোঝাবুঝি ছিল কিন্তু এটাকে কোনো মুভমেন্ট বলা যাবে না। তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে কল্লোল যুগের লেখকদের মধ্যে যৌনমুক্তির চেষ্টা ছিল। বিশেষ ক'রে যুবনাশ্বের গল্পে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যেও সেই চেতনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, মানিকের তাই যদি কোনো ঐতিহ্য থেকে থাকে তবে তা যুবনাশ্বের।

সু.রা.চৌ. 'পূর্বাশা' প্রকাশের পেছনে কোনো আন্দোলন-বোধ ছিল কি?

স.ভ. সেটা হয়েছিল চল্লিশে। প্রথম দিকে ছিল, নতুন লেখকদের জন্য।

সু.রা.চৌ. 'পূর্বাশা'য় আপনার রাজনৈতিক মত কাজ করতো কি?

স.ভ. সেটা হয়েছিল চল্লিশের পর। আমরা চেয়েছিলাম, দেশের মধ্যে একটা হার্ড থিঙ্কিং আসুক। আমরা বুঝেছিলাম, স্বাধীনতা আসবেই। স্বাধীনতার জন্য মানসিক প্রস্তুতির দরকার। সমাজ, অর্থনীতি, শিল্প-সাহিত্য— সব ক্ষেত্রে।

অ.চ. 'পূর্বাশা'র সেই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে বলে আপনার মনে হয়?

স.ভ. সর্বৈব বিফল। কেন যে এমন হলো জানি না। এটা ইনডিটারমিনিজম-এর যুগ। আমরা কি চেয়েছিলাম এর পর অবধূতের সাহিত্য হোক?

মা.ব. হালের বাঙলা উপন্যাস আপনার কীরকম লাগে?

স.ভ. হালের উপন্যাস আমি পড়িনি। একজন একটা পড়তে বলেছিলো, সমরেশ বসুর 'প্রজাপতি'। 'বিবর' নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছিলো দেখে পড়তে শুরু করেছিলাম, পাতা আষ্টেক পড়ে ছেড়ে দিলাম, ভালো লাগলো না।

অ.চ. আপনি যে এতদিন লিখছেন, সাহিত্যের মাধ্যম হিশেবে বাঙলা ভাষাকে আপনার কখনো কি অনুপযোগী মনে হয়েছে?

স.ভ. না। আমার এই মনে হয়েছে যে, ভাষাটাকে হয়তো আমি পুরোপুরি জানি না বুঝি না ব'লে, অনেক সময় আমি ব্যর্থ হয়েছি।

অ.চ. বাঙলা ক্রিয়াপদের শৈথিল্য নিয়ে আপনার কখনো অসুবিধে হয়নি?

স.ভ. যতোটা সম্ভব ক্রিয়াপদ এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। সম্ভব কিনা জানি না। ভাষা নিয়ে আমি অতো ভাবিনি। যা বলতে চাই, ভাষার প্যাটার্ন সেই অনুযায়ীই তো হবে। তবে ভাষা যতটা সম্ভব সহজ হলেই ভালো হয়— আমার অভিজ্ঞতা থেকে এই বুঝেছি, এখন কবিতায় যা বোধ করছি। কঠিন শব্দ, যা বিষ্ণু দে ব্যবহার করেন, আমি আনতে চাই না। শব্দগুলো যতোটা আমাদের কথ্যভাষার লাগোয়া হয়, ততোই ভালো। আমরা তো কথ্যভাষায় কঠিন শব্দ ব্যবহার করি না। রবীন্দ্রনাথ করতেন।... আমি কি কথ্যভাষার মতো করতে চাইছি, না কী, বুঝতে পারছি না। আমি চাই সহজ ভাষা।

সু.রা.চৌ. আপনার উপন্যাসে যেমন প্রেম বা অন্য সব সম্পর্ক আসছে, সেই রকম রাজনীতি, ছাত্র-আন্দোলন বা সমাজ-চিন্তা কীভাবে আসছে?

স.ভ. আমি নানাসময় ওসব কথা

উপন্যাসে বলেছি। কখনো সমসাময়িক যুগের প্রতিক্রিয়ায়, কখনো ধূর্জটি মুখোপাধ্যায় বা কারো সঙ্গে আলোচনার ফলে সোশ্যাল কনটেন্ট আমার উপন্যাসে এসেছে। চাষী, মজুর, এরা সব এসেছে। তবে ধূর্জটিদা যেমন বলেছিলেন, এদেশে এখনো বুর্জোয়া উপন্যাসই হলো না, তো কম্যুনিস্ট উপন্যাস। ধূর্জটিদার সেকথা মনে ছিলো, যখন আমি 'দিনান্ত' উপন্যাসটা লিখি। কবিতার ব্যাপারে কিন্তু ওরকম কিছু হয়নি।

অ.চ. অর্থাৎ উপন্যাস আপনি লেখেন বাইরের ঘটনার প্রতিক্রিয়া থেকে আর কবিতায় তাকে আপনি মূল্য দেন না। তাহলে কি উপন্যাসে আপনি সামাজিক জীব হিশেবে কর্তব্য করেছেন?

স.ভ. শেষের দিকের উপন্যাসে তা নয়। যেগুলোতে আত্মজীবনের ছোঁয়া লেগেছে সেগুলোতে ওরকম হয় কী ক'রে? সামাজিক পরিচয় বাদ দিয়ে আমি মানুষ অর্থাৎ জীবনের রহস্যময়তাকে ধরবার চেষ্টা করেছি; এই ভাবে দেখা আমার উপন্যাসে পরে এসেছে।

অ.চ. আপনি যে উপন্যাসে সোশ্যাল কনটেন্ট-এর কথা বললেন— সে-সময় ঐ প্রবণতা তো হাওয়ায় ছিলো— তার ফলে বাঙলা সাহিত্যে ভালো বা মন্দ কোনো ফল হয়েছে কি?

স.ভ. কী হিশেবে ভালো বা মন্দ? ওর কোনো ইমপ্যাক্ট হয়েছে ব'লে আমার তো মনে হয় না কার ওপর ইমপ্যাক্ট হবে? চাষী-মজুররা তো ওঁদের লেখা পড়ে না। আর ইনটেলেকচুয়ালরা ওঁদের উপন্যাস পড়ে, অনেকটা রহস্য-উপন্যাস পড়বার মতো। জিনিসটা তাঁদের জীবনের নয়। হয়তো পড়েনও না।

অ.চ. একজন লেখকের ক্ষেত্রে তাঁর স্বাভাবিক প্রতিভার সঙ্গে তাঁর পড়াশোনার কি কোনো অবিচ্ছেদ্য যোগ আছে?

স.ভ. আছে, নিশ্চয় আছে। প্রতিভা দিয়ে একটা সীমা পর্যন্ত যাওয়া যায়। এর একটা বড় উদাহরণ নজরুল।

অ.চ. আপনি তো একসময়ে নতুন সাহিত্যের সঙ্গে খুবই জড়িত ছিলেন। এখনকার নতুন-সাহিত্য, যা-নাকি আপনাদের পরেও নতুন, সে বিষয়ে আপনার কী ধারণা? কোনো আস্থা তৈরি হয়েছে কি?

স.ভ. আস্থা-অনাস্থার কথা নয়। আমি খুবই খুশি হতাম, যদি এখনকার সাহিত্যে কোন কোন নতুন প্রবণতা এসেছে তার সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত হ'তে পারতাম এবং সেই প্রবণতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে লিখতে পারতাম। তবে কেউ- কেউ বলছেন, আমার কোনো-কোনো লেখা হয়তো এখনকারও। তা যদি হয়ে থাকে খুব বড়ো ব্যাপার হয়েছে। আমি তো ঘরের মধ্যেই থাকি; তবে হয়তো হাওয়া আসে, এর জন্য লিখতে পারি।

অ.চ. এমন কোনো ভাবনা বা অভিজ্ঞতা আপনার মনে কি তৈরি হচ্ছে, যাতে আপনি মনে করছেন একটা কোনো নতুন লেখায় আপনি হাত দেবেন?

স.ভ. এরকম কোনো ভাবনা বা চাপ আমি বোধ করছি না।

অ.চ. এখনকার লেখকদের লেখায় নতুন অভিজ্ঞতার কি কোনো পরিচয় পাচ্ছেন?

স.ভ. আমি এখনকার কবিতা পড়ি, পত্র-পত্রিকা মারফৎ যা পাই, গদ্য লেখা বাঙলায় বড় পড়ি না। কবিতা পড়ি আর বুঝতে চেষ্টা করি। প্রত্যেক মানুষই তো স্বতন্ত্র। এখনকার লেখকদের আর আমাদের যুগও তো আলাদা। এখনকার তরুণেরা যে-পরিবেশে যৌবনে এসে পৌঁচেছে, আমরা তো সে-পরিবেশ থেকে যৌবনে এসে পৌঁছোইনি। এখনকার একটি যুবকের মনকে আমার যৌবন দিয়ে আমি ধরতে পারছি না।

অ.চ. এখনকার বাঙলা কবিতায় যে জটিলতা এসেছে, সে কি সময়ের পরিবর্তনের ফলে যে মানসিক অভিজ্ঞতার পরিবর্তন ঘটে গেছে, তার জন্যে হয়েছে মনে করেন?

স.ভ. পঞ্চাশের কোনো-কোনো কবি খুব যন্ত্রণার কথা বলেন— যন্ত্রণা শব্দটাই তাঁরা বারবার ব্যবহার করেছেন,— যেন তাঁরা খুব সাফার করছেন, এই সাফারিংটা আমি কোনোদিন অনুভব করিনি। বাস্তব জীবনে আমি খুব সাফার করেছি। কিন্তু তা আমার কবিতায় আসেনি।

অ.চ. রবীন্দ্রনাথের পরে কোন কবিকে আপনার সবচেয়ে সম্পূর্ণ মনে হয়েছে?

স.ভ. জীবনানন্দ।

অ.চ. আর কোনো কবি?

স.ভ. না। আমি সুধীন্দ্রের কথা ভাববো না, বুদ্ধদেবের কথা ভাববো না, বিষ্ণু দে'র কথা ভাববো না, প্রেমেন্দ্রের কথা ভাববো না। কেবল জীবনানন্দই একটা সম্পূর্ণতা লাভ করেছিলেন।

অ.চ. এখনকার কবিদের মধ্যে কাকে আপনার ভালো লাগছে? ধরুন, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়—

স.ভ. এঁদের ওপর আমি একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম, সেটা কিছুই হয়নি। এঁদের সকলেরই কিছু-কিছু ভালো লাগে। কিছু-কিছু দুর্বোধ্যও মনে হয়।

অ.চ. দুর্বোধ্যতা কি তাঁদেরই অক্ষমতার জন্যে ব'লে আপনার মনে হয়?

স.ভ. সেটা আমি কী ক'রে বলবো? এখন, কেউ যদি র‍্যাবোর মতো শুধু ড্রিম-ইমেজ ব্যবহার ক'রে যান, কোনো কোনো ড্রিম আমার কাছে কমিউনিকেটেড হয়তো হলো না— এটা আমার ত্রুটি হতে পারে, কবিরও ত্রুটি হতে পারে। কবিতা যখন আমি সমালোচনা করবো, পাঁচবার সাতবার ভেবে একটা কিছু বলবো— এবং, হয়তো, কমিট করবো না কিছুই।

অ.চ. বাঙালি পাঠকদের কাছ থেকে আপনি কি সন্তোষজনক সাড়া পেয়েছেন বলে মনে করেন?

স.ভ. না। আমার একটা দুর্নাম আছে প্রথম থেকেই— আমি দুর্বোধ্য, আমি মোটেও প্রাঞ্জল নই, আমায় বোঝা যায় না। এটা হচ্ছে যারা আমার প্রতি, যাকে বলে আক্রমণাত্মক, তাদের কথা। আর যারা বন্ধু হয়ে আমাকে বিপন্ন করেছে, তারা বলেছে যে, ওসব ইনটেলেকচুয়াল লেখা। ফলে আমার একেবারে কোনো পাঠক নেই। এবং আমার সাহিত্য সম্বন্ধে আমার শেষ কথাটা আমি ব'লে নিই। আমার শেষ কথা এই: হয় আমি সাহিত্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, না-হয় বাঙলা দেশের পাঠক এবং সমালোচকেরা সাহিত্য বিষয়ে নেহাৎ নির্বোধ। এই সিদ্ধান্তে আমি উপনীত হয়েছি, আমার যাট বছর বয়সে। আর এক ছত্রও লিখতে ইচ্ছে করে না আমার।

'সারস্বত' দ্বিতীয় সংখ্যা। জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫ থেকে পুনর্মুদ্রিত। *বানান অপরিবর্তিত।*

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

রাজ্যপাট

সুব্রত মুখোপাধ্যায়

পূর্বানুবৃত্তি

আলিপুর সদর মহকুমার এস ডি ও বিমল। সামনে নির্বাচন থাকায় মহকুমায় আইনশৃঙ্খলাজনিত নানা সমস্যা নিয়ে সে জেরবার। দুপুরে বিশ্রামের মধ্যেই জেলাশাসকের জরুরি ফোন পেয়ে তাকে ছুটতে হয় বিষ্ণুপুর-১ ব্লকে। সেখানে অকাল কালীপুজোকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক সমস্যা দেখা দিয়েছে। ঝুঁকি না নিয়ে এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে অফিসে ফিরেই বিমল খবর পেলেন আয়কর রিটার্ন জমা না করায় তাঁর নামে ভিজিল্যান্স দপ্তরের চিঠি এসেছে। আলস্যের কারণে যে কাজ এতদিনেও তাঁর দ্বারা হয়নি, বিল-ক্লার্ক ভবেশবাবুকে ডেকে সেটা দ্রুত করে ফেলার নির্দেশ দিলেন বিমল। তাঁর সম্পত্তি বলতে সীমার সঙ্গে জয়েন্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, যাতে হাজার তিনেক টাকা পড়ে আছে। এদিকে অফিসে আসন্ন নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি তুঙ্গে। এমন সময় একটি ফোন তাকে বিচলিত করে। ফোনের অন্য পারে এক মহিলার কণ্ঠস্বর। বিমলের মহকুমার একজন পুলিশ অফিসার তাকে ক্রমাগত বিরক্ত করছে বলে তার অভিযোগ। কিন্তু মহিলার কণ্ঠস্বর শেষের দিকে গায়ে পড়া মনে হয় বিমলের। ফোন ছেড়ে সে ও সি-র কাছে সংশ্লিষ্ট অফিসারের সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়।

৪

মুনি তার ঘরে বসে গান গাইছে। মা তার পাশের ঘরে থাকে। প্রায় সবসময় চলন্ত এফ-এম রেডিওটা এখন বন্ধ করে দিয়ে চুপ করে নাতনির গান শুনছে। মা হয়তো মনে মনে ভাবছে নিজের কিশোরী বেলার কথা। তার অসাধারণ গানের গলার কথা সবাই বলত। পুরনো মানুষরা এখনও বলে। বিমলের মনে আছে ছোটবেলায় কাঁচরাপাড়ায় দাদুর রেল কোয়ার্টারে থাকাকালীন এক-একদিন সন্ধেবেলা মা হারমোনিয়াম পেড়ে খুব নিচু গলায় গান গাইছে। এটা দাদু অর্থাৎ মা-র বাবার কিনে দেওয়া। অর্ডার দিয়ে কলকাতার সাহেববাড়ি থেকে বানানো। পরে বিমল এটা সারিয়ে সুরিয়ে নিয়েছে। একপাট বেলোকে সাতপাট করিয়ে নিয়েছে। যন্ত্রটার সুর ভারি বিষন্ন আর গম্ভীর। বাজলে কেমন যেন মন ভারী হয়ে যায়। মা বলে— হারমোনিয়ামটার আওয়াজ আমার জীবনের মতো।

আর প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে না। মা-বাবার দু'জনেরই প্রায় গোটা জীবন খণ্ডযুদ্ধে বয়ে গেছে। কারণ বলতে সবই অমূলক। তবে মূল ছিল মা-র বাপের বাড়ির প্রসঙ্গ। বাবা কেন জানি ও-বাড়ির নাম সইতে পারত না। আর সেই নিয়েই ভয়ঙ্কর বিবাদ, দু'জনারই উপবাস, কথা বন্ধ। একই বাড়িতে থেকেও মুখ দেখাদেখি নেই। মা কোথাও একটানা বেশিদিন থাকতে পারে না। নাকি ভাই বোনেদের বাড়িতেও মাঝে মাঝেই পালা করে গিয়ে থাকে।

মুনি গাইছে এখন, 'কোন কূলে আজ ভিরল তরী সোনার গাঁয়ে, এ কোন আমার ভাটির তরী আবার কেন উজান যেতে যায়...'

বিমল মনে মনে মা-র গান শুনছে সেই ছেলেবেলায় গিয়ে, 'সূর্য অস্ত হো গয়া, গগন মস্ত হো গয়া...'

সরোজিনী নাইডুর ভাই হারিন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গান। যা রেডিওয় শুনে শুনে তুলে নিয়েছে।

মুনির এখনকার এই নজরুল গানের সঙ্গে মা-র গানের কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম মিল আছে। সেই তুলনার বিচার করার ক্ষমতা বিমলের নেই। হাজারো গান শুনেও এগুলি আয়ত্ব করা যায় না। এ জন্য শিক্ষা দরকার।

এন ভি এফ ভবতারণবাবু এসে দাঁড়ান দরজার পাশ ঘেঁষে। উপস্থিতি জানাতে বার দুই গলা খুক্ খুক্ করেন। রোগা মানুষটি এবার একমাথা কলপ করা আঁচড়ানো চুল আর কাটাছেঁড়া মুখে পান চিবোনো চাপতে চাপতে বলেন, সার—

বিমল শুধু বলে, হুঁ।

ম্যাডাম বলছিলেন কালীঘাট বাজারে যেতে—

কথাটা শেষ না করতে দিয়ে বিমল বলে ওঠে, আমার পড়ার টেবিল থেকে মানি ব্যাগটা এনে দিন।

ভবতারণ মিষ্টি মিষ্টি হাসেন। কেননা সে জানে এরপর সাহেবের কি অর্ডার হবে। তিনি চলে যেতে বিমল ভাবে মানুষটি ধারালো বুদ্ধিধারী। বাজারের দিকে গেলে সাহেবেরও তো কিছু আনার থাকতে পারে। তাই এক কাজে একজোড়া কাজ সেরে নেওয়ার ব্যবস্থা করে নিল।

ভবতারণ ব্যাগ এনে সামনে ধরে। বিমল তার থেকে কিছু টাকা বার করে তার হাতে দিয়ে বলে, একটা ডি এস হাফ, আর খানিকটা ছোলা-বাদাম ভাজা।

ভবতারণ ঘাড় কাত করেন। তারপর বলেন, সার, চপ-বেগুনি কি আনতি হবে?

—আপনার ম্যাডামকে জিজ্ঞেস করে যান।

ভবতারণবাবু চলে যান। খানিক পরেই তাঁর কিঞ্চিৎ ছায়া ছায়া আর অতীব রোগা মূর্তিখানি বাংলোর সম্মুখের গেটবরাবর আড়াআড়ি হাঁটা ধরে। আড়াআড়ি গেলে পুলিশ লাইন ডাইনে রেখে সামান্য গেলেই কালেক্টরেট এলাকা। সেটি পার হয়ে কিছুটা পথ গেলে কালীঘাট বাজার এলাকা। সেখানেই যেতে হবে তাঁকে।

বিমল এখানে— এই বারান্দার চেয়ারে বসে অপার মাঠখানি চেয়ে চেয়ে দেখছে। আকাশে সামান্য চাঁদের ছটা। বাঁয়ে লম্বা উঁচু খালপাড়— বয়ে গেছে সিধে। তার বুকে কতিপয় এলোমেলো তাল আর খেজুর গাছ। ঝাঁকড়া বাবলা কাঁটার বন। এই রাতেও দু'টি একটি স্থানীয় ছেলে বাঁধপাড়বরাবর এদিক সেদিক যাচ্ছে। খালের ওধারে মস্ত মস্ত আকাশপ্রত্যাশী ফ্ল্যাট। ঝকঝকে আলো জ্বলছে খোলা জানলা পথে। কেউবা ঝুল বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে আছে। ঘরের

দেওয়ালে টিভির আলো দপ্ দপ্ চমকাচ্ছে। ওধারে মাঠের ওপারে পরপর কয়েকটি একতলা ঘরের নিঝুম আলো। সেই কলাগাছ ঘেরা, সামনে বেড়াটানা বিশেষ ঘরটিও। আর একটু রাত হলেও ওই ঘরের সেই বিশেষ বউটি ম্যাক্সি পরে কানে সেলফোন এঁটে পায়চারি আরম্ভ করবে। এই ব্যাপারটা চলবে টানা প্রায় মাঝরাত অবধি। মাঝে মাঝে খালের পাশ থেকে দু-একজন লোক এসে তার সঙ্গে কথা বলবে। সেই বউটি তারপর একজনকে ঘরে ডেকে নিয়ে যাবে। নিয়মমাফিক তার রোগাপটকা স্বামীটি দূর মাঠের এক কোণে বসে বিড়ি টানছে। মাঠময় জোনাকি উড়ছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। এখানে বসে কালীঘাট এলাকার ডামাডোল শোনা যাচ্ছে। বাস-ট্রাম ইত্যাদি। তারই মধ্যে মুনি এবার সরগম রেওয়াজ করতে আরম্ভ করেছে। সন্ধ্যা পারের রাগ মারোয়াঁ। আকাশে কয়েক খণ্ড তারা ফুটেছে। অল্প অল্প হাওয়া দিচ্ছে।

মোবাইল বাজে। সামনের ফ্ল্যাট থেকে ফোন করেছে তরুণ চৌধুরী। ও এখন বিধাননগরের এস ডি ও। তবে বেশিদিন থাকবে না। কোথাও এ ডি এম হয়ে চলে যাবে। মোবাইলে তার নাম ভেসে। তার গলার স্বর ও কথা বলার ভঙ্গি যথারীতি আদুরি আদুরি, বাচ্চা বাচ্চা।

— কী দাদা? কী খবর?

— ভালো। তোমার?

— খুব ভালো দাদা। মানে বিন্দাস আর কি।

বিমল একটু থেমে তারপর বলে, হুঁ, বলো।

— কী করছেন? গান শুনছেন নাকি?

— না না, এমনি বসে আছি।

— আপনি তো বাড়িতে থাকলেই গান শোনেন আর মাল খান।

— দুটোর কোনওটাই এখন করছি না।

— ইলেকশনের পর তো আমি এ ডি এম হয়ে যাচ্ছি।

— বাঃ।

— তার চার-পাঁচ বছরের মধ্যেই ডি এম। আপনার জেলা, মানে নর্থ চব্বিশ পরগনায় ডি এম হয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাব।

— ওয়েলকাম।

— আচ্ছা দাদা, এবার আসল কথাটা বলি। খচে যাবেন না যেন।

— কী কথা?

— মানে— এবার ইলেকশনে অপোনেন্ট পার্টির দ্বিজেন ঘোষ একটু আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। উনি তো রিটায়ার্ড আই এ এস অফিসার।

—এখনও তো কোনও দলই ক্যান্ডিডেটদের নাম অ্যানাউন্স করেনি ভাই।

— আরে দাদা, সে সব তো অফিসিয়াল ব্যাপার। আপনি ভিতরের খবর কিছু রাখেন না। আমায় তো রাখতে হয়।

— ঠিক ঠিক। তা না হলে তুমি পরপর ওপরে উঠবে কেমন করে!

— তরুণ এবার যথারীতি তার সেই সাজানো ন্যাকা ন্যাকা হাসি হাসে। তারপর বলে, হ্যাঁ দাদা, সবাই আমায় আড়ালে বলে আমি একখানা জিনিস।

বিমল কষ্টে হাসে, তা বলতে পারব না তরুণ।

— আরে আপনি কী বলবেন। আমিই তো বলছি। তা ছেড়ে দিন ওসব কথা। এখন বলুন মিস্টার ঘোষের সঙ্গে কবে দেখা করবেন? উনি আপনার বাংলোতেই আসতে চান।

বিমলের মেজাজ এবার ভয়ঙ্কর গরম হয়ে যায়। সে তবু, অনেক কষ্টে রাগ চেপে বলে ওঠে, তুমি এক কাজ করো। ওঁকে একদিন আমার অফিসে দেখা করতে বোলো। একটা ফোন করে যেন আসেন।

— কেন দাদা! বাংলোয় হবে না!

— না ভাই। সেটা সম্ভব নয়। আমি অফিস বাড়িতে নিয়ে আসি না। এখানে আমি বইটই পড়ি, গান শুনি।

তরুণ চৌধুরী হঠাৎ কথার ভাঁজ পাল্টায়। খিক্ খিক্ হাসতে হাসতে বলে, যাক গে দাদা। অফিস আর বাংলো দুটো ঘরই তো সরকারি।

— হুঁ। ওটা পাবলিক প্লেস। আর বাংলোটা একেবারেই প্রাইভেট। এখানে গান শোনা, বই পড়া এইসব হয়। তাছাড়া ফ্যামিলিকেও তো একটু সময় দিতে হয়।

— তাহলে গান শুনবেন কখন দাদা?

বিমল তার কথার এই উত্থান-পতনে একটু থমকে যায়।

তরুণ আবার বলে, আপনার কাছে শোলের সিডিটা আছে দাদা?

— আমার তো সিডি প্লেয়ার নেই। সবই রেকর্ড।

— ও, মানে রেকর্ড প্লেয়ার। ওসব তো এখন উঠে গেছে। ক্যাসেটও আর বেশিদিন নেই। এখন সব সিডি দাদা। আচ্ছা দাদা, রাখি। আপনি আমার কথাটা একটু ভেবে দেখবেন। আমার আলিমুদ্দিনেও যোগাযোগ আছে আবার ও দলেও।

বিমল শুকনো হাসে, আমার তো ভাই আর হাতে গোনা বছর চাকরি। কোনওদিন পলিটিক্যাল যোগাযোগ ছিলও না আবার থাকবেও না। এই করেই কাটিয়ে দিচ্ছি। এক্সট্রা কোনও চাপ নেই।

তরুণ হেসে বলে, তাহলে দাদা, গান শুনুন এবার। চাপের চ'ও থাকবে না।

সীমা বাটিতে করে মুড়ি আর এক গ্লাস চা নিয়ে দাঁড়ায়।

বিমল তার দিকে তাকায়, কী হল? চপ, বেগুনি আনতে দাওনি?

সীমা উত্তর না দিয়ে সামনের মোড়াটা টেনে নিয়ে বসে। মুনি তার মুড়ির বাটি আর চা দিয়ে যায়। বিমল বলে, কি রে, তোর রেওয়াজ হয়ে গেল?

মুনি মাথা হেলায়, হ্যাঁ, এখন পড়তে বসব। সামনে সেমিস্টার আছে।

কম কথা বলা মেয়ে সামান্য হেসে চলে যায়। ও ঘরে মা। এইমাত্র ট্রানজিস্টর খোলে। কোন একটা চ্যানেলে পুরনো হিন্দি ছবির গান বাজে, প্যার হুয়া ইকরার হুয়া হ্যায়...। মান্না দে ও লতার বিখ্যাত গান। আসলে ভালো গান হলেই মা শোনে। শোনার পাশাপাশি মনে মনে জাবর কেটে খায় নিজস্ব স্মৃতির।

সীমার দিকে তাকিয়ে বিমল মুড়ি মুখে দেয়, কী খবর?

সীমা বলে, অদ্ভুত কথা। খবর আবার নতুন করে কী থাকবে!

— না, এই বললাম আর কী।

সীমা তার চোখের দিকে পূর্ণ তাকায় এবার, তুমি ক-বছর ধরে রোজ রাতে ড্রিঙ্ক করছো কেন বলো তো?

বিমল সামান্য নড়ে বসে, হঠাৎ!

— এমনি। জানতে চাইছিলাম আর কী।

— না— অনেকদিন তো হল। মানে— সেই বিয়ের পর থেকেই ধরে নিতে পারো।

— তার মানে— কুড়ি-বাইশ বছর হয়ে গেল।

বিমল মুড়ি চিবোতে চিবোতে চায়ে চুমুক দেয়।

সীমা বলে, তোমার তো মনের জোর আর পাঁচজনের চেয়ে ঢের বেশি বলেই জানি।

— হবে।

— হবে নয়, সত্যি কথা।

— আসলে বংশের ধারা তো।

— ধারা আবার কী। তোমার দাদু তো ড্রিঙ্ক করতেন না। পণ্ডিত মানুষ বলে বই ছাড়া আর কোনও নেশা ছিল না বলেই শুনেছি।

বিমল হাসে, বাবার জিন তো। সেটাই বয়ে চলেছে আমার রক্তে।

— তোমার যখন মনের জোর এত, এটা ছাড়তে না পারার তো কোনও কারণ দেখছি না।

— কে বলল বেশি।

— তাছাড়া দিন দিন তোমার ফ্যাট বেড়ে যাচ্ছে। প্যান্টগুলো কেবলই অল্টার করাতে হয়।

— ফ্যাট! ওটা তো মাতৃকুলের দেওয়া। তাছাড়া আমি তো রামদেব সাধুর প্রেসক্রাইব করা লৌকি, মানে লম্বা লাউয়ের রস রোজ সকালেই খাই।

— ও তো ঘোড়ার ডিম কাজ হবে। রোজ রাতে ওটা খাওয়া না ছাড়লে—

বিমল তাকে শেষ করতে না দিয়ে বলে ওঠে, আরে বাবা, ডাক্তাররা বলেন মেপে দু-তিন পেগ রোজ খেতে। ওতে হার্ট ভালো থাকে।

সীমা মাথা নিচু করে, আমার ভয় করে। তার ওপর সারাদিন অল্প রুটির ওপর থাকো। রাতে সামান্য ভাত। এরকম খাটনি। কী করে শরীরে দেবে!

সীমা উঠে যায়।

খানিক পরে ভবতারণবাবু দোকান সেরে বাইরে থেকে ফিরে আসেন। যথা-স্বভাব কিঞ্চিৎ অবনত হয়ে সামনে দাঁড়ান। তারপর প্যান্টের পকেট থেকে কাগজে মোড়া বোতলটি আলগোছে বিমলের দিকে বাড়িয়ে দেন। তুলে দেন বাদাম, ছোলার প্যাকেট দুটো।

বিমল এবার উঠে ঘরে এল। ঘড়িতে দেখল সাড়ে আটটা। রেকর্ডের তাক থেকে বেছে নিল কুমার গন্ধর্বের রাগ দুর্গা। প্লেয়ার খুলে রেকর্ড চড়িয়ে পিন রাখল। গ্লাসে মাপ মতো মদ ঢালল। জলও— বোতল থেকে। গান আরম্ভ হয়। মধ্যলয়ের গান। বোল হল, মাঙ্গোনা সাবু রে...

বিমল গানের ব্যাকরণ না জানলেও শুধুমাত্র সুরের মায়ায় শাস্ত্রীয় গান শোনে। এমনকী কোনও গান শুনে চট করে রাগের নাম বলে দিতে পারে না। তবে অনেক সময় সেই রাগটির ওপর গাওয়া কোনও গান শুনলে মূল রাগটি বলে দিতে পারে। যেমন এই খেয়ালটি শুনতে শুনতে সে চোখ বুজে রেকর্ডে নাম না দেখেও বলে দিতে পারে। এই যেমন এখন তার মনে পড়ে গেল জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামীর গাওয়া সেই গানটি, 'দুর্গা দুখহারিণী ভবভয়নিবারণী...' গানটির কথা। অমন দাপুটে স্বর বাংলা মার্গ গানে আর শোনা যায় না। মাত্র তেতাল্লিশ বছর বেঁচে ছিলেন। অতীব মদ্যপান করতেন। শোনা যায়, শেষের দিকে এক অস্বাভাবিক হতাশা তাঁকে গ্রাস করেছিল। এবং এও শোনা যায় এবং রটনা আছে যে তিনি বিষ্ণুপুরের বাড়িতে আফিং খেয়ে আত্মহত্যা করেন।

কুমার গন্ধর্বর দুর্গা আস্তে আস্তে পাখনা মেলছে, আমোনা রে...। কী এক আশ্চর্য আর্ত আর জোরালো ধাক্কা দেওয়া স্বর। ওঁকে বলা হত Rebel of Indian Classical Music. কোনও প্রথাগত ধরাবাঁধা গৎ তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে গান করতেন। যাঁরা বিশুদ্ধবাদী তাঁরা ওঁর গান পছন্দ করত না। পণ্ডিতরা বলেন, উনি নাকি প্রায়শই গানের ব্যাকরণ মানতেন না। আবার রসিক শ্রোতারা বলেন এই বাঁধা গৎ-এর বাইরে যাওয়াটাই ওঁর গানের সৌন্দর্য ছিল।

কেন জানি এমন সব সৌন্দর্য আর বিষণ্ণ গান শুনলে বিমলের কেবলই মন চলে যায় হালিশহরের বাড়িতে। বাবা তো সবে গেছেন। এখন ওই নিঝুম পুরনো অট্টালিকায় ওড়িয়া পূর্ণকাকা থাকে। তার আধপাগল জোয়ান ছেলেটিও বাবার সঙ্গে থাকে। দেশ থেকে মাঝে মাঝে বাবা-ছেলের বউরা এসে থাকে কিছুদিন। তারা ফিরে গেলে বাড়িটা আবার চুপচাপ। বাড়িটার চিলের ছাদে একটা টিনের টবে ফণীমনসা গাছ আছে। ওটা নাকি বজ্রপাত থেকে বাড়িকে রক্ষা করবে বলে পুরনো সংস্কার।

সেলফোনে এবার এ ডি এম জেনারেল প্রবীর মিত্র। দোতলা থেকে ফোন করেছেন বোঝা গেল। কারণ, একটু আগেই গাড়ি তাঁকে নামিয়ে দিয়ে গেছে। বিমল রেকর্ড প্লেয়ারের ভল্যুম কমিয়ে দিয়ে বলে, গুড ইভনিং সার—

— ইভনিং এস ডি ও সাহেব। অসময়ে একবার বিরক্ত করলাম তো। গান শুনছিলে তো?

— না না সার, বলুন—

— বলছিলাম ডি এম ম্যাডামের কাছে একটা কমপ্লেন করেছেন যাদবপুরের রুলিং পার্টির ক্যান্ডিডেটের বিপক্ষে যিনি দাঁড়িয়েছেন। এখন রিটায়ার্ড আই এ এস। বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা।

— হ্যাঁ সার, একজন ইনসার্ভিস আই এ এস-এর কাছে কমপ্লেন করেছেন একজন এক্স।

—রাইট। তবে আমিও তো ওই আপনাদের ভাষায় ভিন দাঁড়ি। এ নিয়ে আমার কোনও হেডেক নেই সে তো আপনি জানেন।

— কিন্তু কমপ্লেনটা কী সার?

— যাদবপুর এসি-র কয়েক হাজার নাম নাকি আপনি ডিলিট করে দিয়েছেন। তারা নাকি সব জেনুইন ভোটার।

ক্রমশ

স্বর্ণাক্ষরে পত্রিকা

কর্মক্ষেত্র

ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত
সব সাপ্তাহিক পত্রিকার মধ্যে
সারা ভারতে পাঠকসংখ্যায় ১ নম্বর*

ভ্রমণ

ভারতে সবচেয়ে বেশি পড়া ভ্রমণ পত্রিকা*

কালের কষ্টিপাথর

নতুন মাসিক সাহিত্য পত্রিকা

ছেলেবেলা

ছোটদের পরমাশ্চর্য মাসিক পত্রিকা

****

কিংবদন্তি পত্রিকার
সংরক্ষণযোগ্য সংকলন
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
কবিতা-পরিচয়

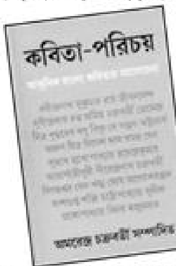

রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে
থেকে শুরু করে শক্তি চট্টোপাধ্যায়,
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার
পর্যন্ত ২১ জন কবির ৪০টি কবিতা
নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন
বুদ্ধদেব বসু, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন
দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
প্রমুখ কবি। ₹১৫০

****

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
গল্প ও কবিতা সংকলন
নিমফুলের মধু ₹৬০
মৃত্যুর অধিক এই মেরে ফেলা ₹৫০
নদী জানে, কচি নিমপাতারাও জানে ₹৩০

আমাদের সব বই ও পত্রিকা
অনলাইনেও পাওয়া যায়:
www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kol-19
Phone: 2283-2320 Fax: 2287-6448
Website: www.swarnakshar.in
E-Mail: info@swarnakshar.in

*তথ্যসূত্র: *IRS (Indian Readership Survey) 2012 Q4*

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

নীলকণ্ঠ ঘোষাল

অধ্যায় ১

পর্ব ১

ছুটি নিতে চায় না আমার মন। চাকরি জীবনেও যা, এখনও তাই। আমার মুখে ছুটির কথা শুনে অম্বু চুপ করে গেছিল। দু-বার হ্যালো বলার পর বলেছিল— ইয়ার্কি নয় সঞ্জুদা, ভীষণ জরুরি একটা কথা আছে, ঘণ্টা খানেক আগে আসতেই হবে তোমাকে।

বললাম— ইয়ার্কি নয় রে, শরীরটা খারাপ।

অম্বরিষ আবার চুপ করে গেল। আবার হ্যালো হ্যালো করতে হল। বলল— কেন এমন করছ সঞ্জুদা? তোমার ছুটি চাই? তোমার শরীর খারাপ? এমন ট্র্যাজিক মোচড় দিয়ো না শিল্পী, এই অভাগা মহড়াওলা খাবি খেতে খেতে মরে যাবে।

— এই! মহড়াওলা বলে তুই আমাদের নাটককার-পরিচালককে খাটো করতে পারিস না। ধমকানির ঢঙে বললাম।

— তুমি যে নিজেকে বাজনাদার বলো, তার বেলা?

— তাছাড়া আমি কী?

— তুমি আমার কাছে কী জান না? তোমার শরীর খারাপ, ছুটি চাই— কথাটা ভাবাই কঠিন। কখনও শুনেছি বলে মনে পড়ে না।

— বয়েসটা ইদানীং ওয়ার্নিং দিচ্ছে রে অম্বু।

— কী হয়েছে বলো দাদা? ব্যবস্থা করতে হবে তাহলে।

— না। তোরা কিছু ইয়ে করিস না। ডাক্তার বলেছে বেশ কয়েকটা দিন পুরো রেস্ট নিতে হবে। কিছু ওষুধ দিয়েছে। ছুটি চাইতেই হয়, তোদের গ্রুপের নিয়ম।

— কী হয়েছে একটু বলো না।

— বুঝতে পারছি না। নানারকম অসোয়াস্তি— না যন্ত্রণা, না জ্বর, কিন্তু দারুণ এক অস্বস্তি শরীরটায়, বলে বোঝানো মুশকিল।

— দাদা— বলেই চুপ করে গেল অম্বরিষ। ওর লম্বা শ্বাস টানার শব্দ শোনা যায়। বললাম— চিন্তা করিস না। ঠিক হয়ে যাবে।

অম্বরিষ বলল— যে মানুষটাকে কখনওই অসুস্থ দেখিনি, তার মুখে এই কথা শুনলে বড়— সন্ধেবেলা আমরা আসছি।

আমি বললাম— না, না অম্বু। পাঁচকান করিস না এটা। এলে তুই একা আসবি। কাউকে জানাতে ইচ্ছে করে না।

— বুড়ো বললে তুমি বিরক্ত হও। আমরাও চাই তুমি থাক চিরকাল এমনই।

খাটো হলেও আমার কাছে এই ছুটি বা বিশ্রামটা লম্বা মনে হল। থাকা গেল না। কারও বারণ না শুনে একদিন বেরিয়ে পড়লাম— গ্রুপে যাব। দেরি হয়েছে বেরোতে। জোরে হেঁটেও টাইমে পৌঁছনো গেল না। ব্যতিব্যস্ত হয়ে রকের ধাপে পা ছুঁইয়েই আমাকে থমকে দাঁড়াতে হল। রক ফাঁকা! ভিতরে মহড়া শুরু হলে রকের টুল-চেয়ারগুলো ডবল্-সিঙ্গল্ মানুষে ভর্তি হয়ে থাকে। চওড়া বারান্দা, সবাই রক বলে। ফাঁকা কেন ওগুলো এখন? কী ব্যাপার?

কান পাততেই সবচেয়ে মান্য কণ্ঠটি শোনা গেল। স্বর এমনিতে পাতলা। এখন বেয়াড়া

রকমের ভারী। রকে উঠে দাঁড়ালাম। আড়ালে চোখ বুজে শুনছি। আমি বলে দিতে পারি— অম্বরিষের গলার দু'পাশের শিরাগুলো এখন ফুলে উঠেছে। ওর বাঁ-হাতের চারটে আঙুল, বুড়োটা বাদে, একসঙ্গে তালুতে মাথা কুটছে বারবার। ওর অভ্যাসে এটা সুলভ। পুরনো ছকের এই বক্তিমে দেওয়ার রহস্যটা বুঝতে অসুবিধে হল না। আজকের ভাষণটি গৌরবে বহুর উদ্দেশে ভাষিত বা ঘোষিত হলেও আসলে তা নয়। ভাষণে বকুনি, ধমকানি, হুঁশিয়ারির নির্যাস দরকারের চেয়ে বেশি ঝরছে। যেন বলছে— সাবধান! আমি সব জানি, সব দেখছি। সেই সঙ্গে বাচিক শিল্পের ঢঙে যথারীতি বাচিত হচ্ছে এই নাট্যগ্রুপের ঐতিহ্য, আদর্শ এবং সমাজের কাছে শিল্পীদের দায়বদ্ধতা ইত্যাদি। এখুনি অম্বরিষের চোখদুটো আমার দেখতে ইচ্ছে হল। দেখতে ইচ্ছে হল, ওর চোখ এখন কোন কোন মুখের ওপর দিয়ে ঘুরছে বেশি। আমি জানি— ওই মুখ দুটি। একটি ছেলের, একটি মেয়ের। ওরা আছে কিনা— আছে নিশ্চয়। নইলে অম্বরিষ এত ব্ল্যাংক ফায়ার করার লোক নয়। ও ভালো জানে, সভার মাঝে কথা পড়বে, যার ব্যাপার তার গায়ে বাজবে। কিন্তু আমি জানি, এসব এক্সটেম্পোর আউটবার্স্ট দিয়ে কোনও ফল ফলবে না। এই নাটক লিখিয়ের সবকিছুতেই নাটক। ভাষণ শেষ। গোটা ঘরে তার ওম আছে। এখন জমেছে নীরবতা। মজা লাগল। নাটুকে পরিবেশ! আমারও নাটক করতে ইচ্ছে হল। হাতের গিটারটা যেন আপনা থেকেই বেজে উঠল টুং টাং। বাজাতে বাজাতে ঢুকে পড়লাম। নিশ্চল শরীরগুলো নড়েচড়ে উঠল। একটা দর্শনীয় অ্যাকশন দেখা গেল— আমি এভাবে ঢুকছি, পলকে সেটা দেখে নিয়ে প্রায় সকলে ত্বরিতে তাকায় অম্বরিষের দিকে। তাদের মতো আমিও। দেখলাম ওর চোখদুটো কটমট করছে। ও দেখছে গিটার আর বাজনায় রত আমার হাতদুটোকে। নাকের ডগা ওর ফুলে উঠেছে। অম্বরিষকে বুঝে নিয়ে রি-অ্যাকশন দিলাম আমিও। লম্বা-চওড়া একটা নিঃশব্দ হাসি বিছিয়ে দিয়ে বললাম— প্রায় সব কথা আমি তোর শুনেছি অম্বু, ভিতরে ঢুকিনি, ডিসটার্বড হয়ে যেতিস তুই। সুপার্ব রেনডিশন! বিলক্ষণ জানতাম, এতেই কাজ হবে। তাই দ্বিগুণ জোরে বাজাতে বাজাতে আমার বসার জায়গাটার দিকে পা ফেললাম। যে ওখানে বসেছিল, সে সরে গেল পাশে। আমি বসলাম। দেখলাম, অম্বরিষের চোখদুটো নিজের পায়ের দিকে নেমে গিয়েছে। এক

এই নাটক লিখিয়ের সবকিছুতেই নাটক। ভাষণ শেষ। গোটা ঘরে তার ওম আছে। এখন জমেছে নীরবতা। মজা লাগল। নাটুকে পরিবেশ! আমারও নাটক করতে ইচ্ছে হল।

মুহূর্ত পরেই তার আসল গলা বেজে উঠল— হিঁক হিঁক করে ও হেসে উঠেছে। আমার বাজনা থেমে গেল। ভুল করলাম নাকি? এভাবে ও হাসে কেন? হাসি থামিয়ে অম্বরিষ বলে— তুমিও? তুমিও ভড়কানি মারছ গুরু! নির্লিপ্ত ঢংয়ে বললাম— কীসে?

একটু থমকে গেল অম্বরিষ। তারপরেই একটু গলা তুলে বলল— নয়? তোমার অসুখ? ছুটি নেওয়া! এখন বেশ তো খোশমেজাজে আছ দেখছি গুরু।

— কীরকম থাকব ভেবেছিলি?

আমার এমন শুকনো কথায় ও যে হাসিটা হাসল, সেটাও শুকনো। মুখ না তুলে বলে উঠল— চা। বুঝলাম, কথা পাল্টালো অম্বরিষ।

এক কোণে জড়ো হয়ে থাকা কুশধ্বজ, মানে কুশো তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে মাথা গুনতে শুরু করেছে। আমার দিকে তার চোখ পড়তেই মাথা নেড়ে বোঝালাম— চা খাব না। অন্য অনেকে বলল— আমি না... আমিও না।

গুনে নিয়ে চলে গেল কুশো লম্বা পায়ে একে ডিঙিয়ে, ওর কাঁধে ভর দিয়ে।

আবার একটা নীরবতা। সেটা ভাঙবার জন্য গিটারে টুং টাং আওয়াজ তুলে বললাম— নাঃ! এসরাজটা আনলেই ভালো হত, বল পমি? প্রমিতার দিকে তাকালাম। দু'পাশে মাথা হেলিয়ে সে বলল— তোমার হাতে সবই ভালো। পমি নয়, মিতা। হেসে বললাম— এই শোন, বৃথা চেষ্টা করবি না। বেশি ইয়ে করলে প্রেমী বলে ডাকতে শুরু করব, বুঝবি। নতুন বায়না ধরলি কেন? বলতে বলতে আমার চোখ পড়ল অম্বরিষের মুখে। একটা হাসির রোল উঠল ঘরে। সেটাকে ছাপিয়ে প্রমিতার গলা শোনা গেল— গিটারটা বাজাও না জয়দা, শুনি। কথা শুনে শুনে মাথাটা ভারী হয়ে গিয়েছে। বলেই ঠোঁটে দাঁত চাপে প্রমিতা এবং আড়চোখে অম্বরিষকে দেখে নেয়। মনু, মনন বলে লাজুক ভঙ্গিতে— আ-আপনি একটু বা-জান না জয়-ম-শাই। বেশ লাগছে।

মনুর দিকে চাইলাম, হেসে বললাম— বলছ? বেশ, বাজাচ্ছি। তবে তোমাকে 'মশাই' বলাটা ছাড়তে হবে। ওদের 'মশাই' বলা ছাড়াতে গিয়ে টায়ার্ড হয়ে গিয়েছি। রাজু অর্থাৎ স্বরাজ কথা বলল— সঞ্জুদা, ওকে একটু সময় দাও। সবে এসেছে ও গ্রুপে।

— মনু, তুই যদি জয়দার এসরাজ শুনিস না, পাগলা হয়ে যাবি। মনুকে ঠেলা মেরে শেখর বলল পিছন থেকে। মনন আগে থেকেই শেখরের পরিচিত। ওদের পিছন থেকে কেউ বলল— শেখর, সঞ্জুদা আরও কটা যন্ত্র বাজান সেটা বল। যাতে হাত দেন, তাতেই সোনা ফলে।

আমি বাজাতে শুরু করেছি ইতিমধ্যে। প্রমিতা বলে ওঠে— ওহ বুধো, এখন চুপ করো, ওটা সবাই জানে।

বুধো অর্থাৎ বোধন মাথা নামিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে— না, মনুকে জা-না-নোর জন্যই বললাম। বাজানো থামিয়ে অম্বরিষের দিকে চেয়ে বললাম— অম্বু, আমাদের নতুন শিল্পী মননের সৌজন্যে একটু বাজাই? রিহার্সাল হবে নাকি আজ?

— নাঃ। আজ আর মুড নেই। গানা-বাজানাই হোক আর কী! অম্বরিষ বলল। একটা উল্লাস বয়ে গেল।

প্রমিতার গলা শোনা গেল তার মধ্যে— গানাও? অম্বুদা, আপনিই রেডি থাকুন তাহলে। বোধন বলে ওঠে— মিতাদি, তুমি বাদ যাবে মনে করেছ? রেডি হও।

— এই চোপ। প্রমিতা বোধনকে ধমকানোর ভান করে।

কী মুডে পেয়েছিল আমাকে জানি-না, আমি পরপর কয়েকটা বাজনা বাজিয়ে গিটারটা নামালাম। দু'হাতে মুখ ঘষে নিলাম। ঘষতে ঘষতে শুনলাম প্রমিতা বলছে— মননদা, তোমার ভাগ্যেই আমরা এমন বাজনা শুনলাম। অনেকদিন এমন—

— যদি আজ এসরাজ বা বেহালাটা থাকত জয়দার হাতে, মিতা? শেখর বলল।

— ওঃ! বোধনের গলা— বাড়ি যেতে পারতাম না।

স্বরাজ জিজ্ঞাসা করল— কেন রে বুধো?

— মাতাল হয়ে রাস্তায় গড়াগড়ি দিতাম হয়তো।

সকলে হেসে ওঠে।

— অ্যাঁ! মাল না খেয়েই? খাস নাকি আজকাল? ফট করে স্বরাজের মন্তব্য।

হাসির হররা উঠল, মেয়েদের দিক থেকে বেশি করে।

হঠাৎ স্বরাজ গম্ভীর স্বরে বলে উঠল— এই চুপ! আমি কথা বলছি।

হাসি থেমে গেল। স্বরাজ গভীর ভাবে আমার দিকে চেয়ে আছে কিছু বলার ভঙ্গি নিয়ে। ঘরের সব মুখগুলো ঘুরে গেল তার দিকে।

গাঢ় গলায় স্বরাজ বলে— সঞ্জুদা, তুমি তোমার বাজনা দিয়ে মনে হচ্ছে আজ আবার কাউকে স্বাগত জানালে? কিন্তু স্প্যানিশ গিটারের ওপরে যা জবরদস্তি চালালে ও কি তা সইতে পারে। স্বরাজের কথায় হাসলাম। কিন্তু ওর প্রথম কথাটা কৌতুকের, কৌতূহলেরও বটে। চোখ নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—

— প্রথমে কী বললি রাজু? স্বাগত-টাগত কী একটা বললি?

স্বরাজ বলল— সেটাই তো বললাম। কোন সুবাদে তুমি এমন সব বাজনা এখন বাজালে?

— মনুর, মননের—

— নাঃ।

— না কেন? ও বলল বলেই তো—

— আগে বলেছে তো মিতা।

— তাহলে দুজনের জন্যই—

—সঞ্জুদা, তোমাকে চিনি, তোমার বাজনাও চিনি, সবটা না হলেও অনেকটাই।

— বলছিস? হেসে বললাম।

— হ্যাঁ, বলছি। তুমি এমন বাজনা বাজিয়েছিলে, আমার মনে আছে— যেদিন দেশ থেকে জরুরি অবস্থা উঠে গেল। তার পরে বাজিয়েছিলে— যেদিন রাজভবনে নতুন মন্ত্রিসভা শপথ নিল।

— বাব্বা!

—বলো সঞ্জুদা, সেদিন এমনই বাজিয়েছিলে কিনা?

স্বরাজকে জবাব না দিয়ে আমি আবার একটা সুর একটুখানি বাজালাম। প্রমিতা গেয়ে উঠল— বাজাও আমারে বাজাও/বাজালে যে সুরে প্রভাত আলোরে/সেই সুরে মোরে বাজাও। গান ছেড়ে সে বলল— আমি জানি, ওই গানটা। স্বরাজ বাধা দিয়ে বলে— দাঁড়া মিতা, তোর গান শুনব'খন। আগে সঞ্জুদাকে ঝেড়ে কাশাই। বলো সঞ্জুদা, ঠিক বলেছি কিনা?

হাত বাড়িয়ে স্বরাজের কাঁধে চাপড় দিয়ে বললাম— তোর কান আর মনটা শিল্পীর রে রাজু।

— আর আমার? প্রমিতার জিজ্ঞাসা।

— তোরও। শোন, তোদের বলি, কোনও ভালো ঘটনা, কোনও কথা, কোনও একটা সময় যদি আমার ঝিমনো প্রাণটাকে জাগিয়ে দেয়, মনকে নাড়িয়ে নাচিয়ে দেয়, তখন ভিতরে জমে থাকা সুরগুলো বেজে ওঠে। না বাজিয়ে পারি না। ওই— ওই যে অম্বু তখন আবেগে অধীর হয়ে ভাষণ দিচ্ছিল না— বলছিল, কত কষ্ট কত তিতিক্ষায় আমরা নাটকের এই গরিব দলটাকে বাঁচিয়ে রেখেছি, তোমরা বুঝবে না। সয়েছি কুটিল বাধা, নানা চক্রান্ত, আক্রান্তও হয়েছি। ও বলেছে— আজ যেন একটা নতুন সকাল আলো ছড়াচ্ছে। তাই তো সেদিনের মতো বাজাচ্ছিলাম রে রাজু।

বাজাতে লাগলাম আবার। একটু বাজাতেই অম্বরিষ গেয়ে ওঠে— ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়/তোমারই হউক জয়। বাজনা থামিয়ে হাসলাম। অম্বরিষ আমার কথায় হাওয়া খেয়েছে। হালকা হয়ে গেয়ে উঠেছে।

স্বরাজ হঠাৎ গলা তুলে বলে— দেখ, তোমাদের এইরকম বেলুন মার্কা উৎ-শ্বাস গায়ে এসে লাগলে আমার চুলকানি হয়। চুপ করে যেতে হল। বুঝলাম অন্য স্বরাজ বেরিয়ে পড়েছে— আবেগ উচ্ছ্বাস একটু বেশি দেখলেই ও নেগেটিভ হয়ে ওঠে। 'উৎ-শ্বাস' বলে আমাদের টিটকারি দিল।

আমরা নীরব। দেখে ও বলল— অ। নতুন সকালের জন্মদিন পালন করছ? ফালতু। আরে সেই ছেচল্লিশে, তারপর আটচল্লিশে আমরা তো হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে ছিঁড়ে উড়িয়ে দিয়েছিলাম তার জন্য। এসছে— নতুন— সকাল! কাকে বলে রে নতুন সকাল?

— বলা যায় আর এক স্বপ্নের দিন। আমি বললাম।

— স্বপ্নের! কার স্বপ্ন?

— জাতির।

— কোন জাতির?

— দেশের।

— কোন দেশের?

— এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি— চোখ বুজে গেয়ে উঠেছিলাম। মৃদু হাসির অনেক রকম আওয়াজ কানে আসতেই হুঁশ এল— আমি আপন ঘোরে গাইতে শুরু করেছি। আমার মাথা নাচিয়ে গাওয়া দেখে সবাই হাসছে। থেমে গেলাম। বলতে গেলাম, কী বলি বুঝতে পারছি না। জিজ্ঞাসা করলাম— অম্বু, কী যেন বলছিলাম? স্বরাজকে জিজ্ঞাসা করলাম না ইচ্ছে করেই। অম্বরিষ বলে, বলছিলে স্বপ্নের কথা।

— স্বপ্ন? হ্যাঁ স্বপ্ন। স্বপ্ন দেখার সাতাশ বছর পূর্তি!

— কী করে? স্বরাজের প্রশ্ন এল চড়া গলায়।

— কী— ক-র‍্যা। ন্যাকামি হচ্ছে। জানিস না সাতাশ বছর আগে একটা বিরাট মউ— না, ডিড অব কন্ট্র্যাক্ট— মানে বলা উচিত স্বপ্ন পূরণের দলিল বিলি করা হয়েছিল। দিল্লির রাজসভা থেকে দেশের বড় বড় কয়েকশো মাথাওলা লোক সেটার একটা করে কপি ব্যাগে পুরে নিয়ে বাড়ি এসেছিল তাদের বউদের দেখাবে বলে। হাসির আওয়াজ উঠল জোরে। স্বরাজকে আউট করার জন্য গুগলি দিলাম এটা।

— এই! হাসছিস কেন? যেখানে সেখানে হাসলেই হল, না?

— ওটা স্বপ্নের দলিল কেন হবে? এবার স্বরাজের জিজ্ঞাসাটা নরম।

— আলবাত হবে। ওটা স্বপ্নে ঠাসা, লক্ষ লক্ষ স্বপ্ন। দেশে যত রকমের মানুষ, তত রকমের স্বপ্নের একটা ঝুলি। স্বপ্ন আর ইচ্ছাপূরণের মন্তর লেখা আছে ওতে।

— একটা ভুল হচ্ছে সঞ্জুদা।

— ভুল হচ্ছে? হতেই পারে। কী? এবার মোলায়েম স্বরে জিজ্ঞেস করলাম।

— মানুষের, মানে দেশের স্বপ্ন জন্ম নিয়েছিল তো সেই কোন কালে, শত বছর আগে। তারপর তার ফুল ফুটে শুকিয়ে, ঝরে— স্বরাজ লাইনে এসে গেছে বুঝলাম।

— ঝরে, আবার ফোটে। হ্যাঁ, সেগুলো থেকে বেছে বেছে তুলে এনে নিংড়ে চটকে ওই দলিলের মধ্যে ঢোকানো হয়েছে ঠেসে। তারা ঠাসাঠাসি, গুঁতোগুঁতি, ঠেলাঠেলি করছে, গুমরে গুমরে মরছে। সাতাশ বছর ধরে মাথা কুটে কুটে—

কথা থেমে গেল আমার, দেখলাম স্বরাজ অম্বরিষের দিকে ঝুঁকে পড়ে ঘসঘস করে কিছু বলল। অমনি অম্বরিষ হারমোনিয়াম টেনে নিল, প্যাঁ প্যাঁ করে নিয়ে গান ধরল— 'যুগে যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিল সে। সেই বুঝি মোর পথের ধারে রয়েছে বসে। আজ কেন মোর পড়ে মনে, কখন তারে চোখের কোণে দেখেছিলেম অফুট প্রদোষে, সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েছে বসে। ... গোটা গানটাই গাইল অম্বরিষ। ঠিক সময়ে গেয়েছে ও। মনটা আমারও হালকা হল। বিশুর গান, 'রক্তকরবীর, নন্দিনীর ভাষায় পথ চাওয়ার গান।'

ক্রমশ

কবিতা-পরিচয়

নষ্ট নীড়: সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

অরুণকুমার সরকার

কৃষ্ণচূড়া নিষেধে মাথা নাড়ে,
কুলায় খোঁজে শুক:
চৈত্রশেষ সূচিত হাড়ে হাড়ে,
সূর্য অধোমুখ।
কেবলই দূর মুখর তবু পবনে,
কোথায় যেন নিবিদ বলে যবনে;
চিরায়মাণ নির্বাপিত হবনে
কালের কৌতুক
বিরত মহাশূন্য ওই গোধূলি ধীরে ঝাড়ে:
কৃষ্ণচূড়া তাড়ায়, ওড়ে শুক।।

কখন ওঠে, পাতালভেদ করে,
অসম্ভূত অমা:
বায়ুর বেগ সহসা যায় ম'রে;
দ্রাঘিমা দেয় ক্ষমা।
জ্যোতির্গামী কিন্তু সেই তমসও
তারার ফেনা উৎসারিত ক্রমশ;
মৌনে পড়ে তীর্থামৃত লোমশও,
স্বয়ংবর প্রমা।
তাহলে কেন বিরহী শুক নিরুদ্দেশে ঘোরে,
মজায় কাকে অনাত্মীয় অমা?

প্রথমেই কবিতাটিকে শাদামাঠা ঈষৎ-বিস্তারিত সরল গদ্যে রূপান্তরিত করলে কী দাঁড়ায় দেখা যাক:

পাখি নীড় খুঁজছে, আশ্রয় নেই। কৃষ্ণচূড়ার শাখা মাথা নেড়ে বলছে: এখানে না, এখানে না। যৌবন যে গেছে তা হাড়ে-হাড়ে টের পাওয়া যাচ্ছে। এদিকে সন্ধ্যা আসন্ন, সূর্যের সে-তেজও আর নেই। আশ্রয়ের খোঁজে পাখি উড়ে চলেছে দূর থেকে দূরে তার ডানার আঘাতে যা-কেবলই-দূর সেই অস্পষ্ট ভবিষ্যৎ (অতীত হওয়াও সম্ভব) বাতাসে মুখর হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেই ভবিষ্যতের ভাষা দুর্বোধ্য তথা অসভ্যের। ('নিবিদ: তথাকথিত প্রাগৈতিহাসিক ভাষা যাতে অনার্য দেবতাদের বিষয়ে মন্ত্রাদি লিখিত হত। আমার ব্যবহারে ওটার অর্থ অসভ্যের ভাষা।' —সুধীন্দ্রনাথ দত্তের চিঠি থেকে উদ্ধৃত। পত্রটি ১১.৬.৫৬ তারিখে বর্তমান লেখককে লিখিত।)

বর্তমান নিরাশ্রয়, ভবিষ্যৎ অশ্রদ্ধেয়, আর অতীত? পাখি তার কৃতকর্মের দিকে পিছন ফিরে তাকায়। দ্যাখে, সব যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকাণ্ডের শেষ ফল একমুঠো ছাই। মহাকাল কোনো কীর্তিকেই স্থায়ী মূল্য দেয়নি, বিদ্রূপ করছে সবকিছু প্রয়াসকে। (চিরায়মাণ: আদি-অন্তহীন, চিরকালের। সাধারণ অভিধানে না থাকলেও শব্দটি রবীন্দ্রনাথও ব্যবহারও করেছেন; 'ক্ষণিকা'র একটি কবিতার শিরোনাম: 'চিরায়মানা'। হবন: হোম, যজ্ঞ।)

এমতাবস্থায়, ভূতভবিষ্যৎবর্তমান যখন সমান ভরসাহীন, সেই সন্ধিক্ষণে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। গোধূলি যেন আর-একটি বিরাট পাখি, ধীরে ধীরে এক বীতস্পৃহ মহাশূন্যতাকে তার গা থেকে ঝেড়ে ফেলল। সেই অর্থহীন শূন্যতায় আশ্রয়-প্রত্যাখ্যাত পাখি উড়ে চলে। ('ঝাড়ে' শব্দটির প্রয়োগে পাখির ডানা ঝাড়ার ছবিই ফুটে ওঠে।)

উড়তে-উড়তে দ্যাখে নিচ থেকে পাতাল ভেদ করে এক ভুঁইফোঁড় অন্ধকার উঠে আসছে। তারপরেই হঠাৎ বাতাস থেমে যায়, দূরদূরান্ত ক্রমে ছোটো এবং অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। পাখি অবাক হয়ে দ্যাখে যে ঐ অপরিচিত অন্ধকারও চেষ্টা করছে আলোর দিকে উঠে আসার। অসংখ্য একক তারার আলো ক্রমশ চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয়। (অসম্ভূত অমা: primeval darkness—আদি অন্ধকার, যা থেকে নক্ষত্রমণ্ডলীর জন্ম। বায়ুর বেগ সহসা যায় ম'রে: বাসনাকামনাদির আবেগ ম'রে যায়। দ্রাঘিমা দেয় ক্ষমা: দৈর্ঘ্য সংকুচিত হয়ে আসে, দূর নিকটবর্তী হয়।) সেই নবজাত নক্ষত্রালোকে, পাখি দেখল, এমনকী লোমশের মতো মহাপ্রাজ্ঞ, ভুয়োদর্শী, বহুভাষী ব্যক্তিও অন্তর্মুখী হয়ে উঠেছেন; কোনো যুধিষ্ঠিরের কাছে নয়, নিজের অভিজ্ঞতার কথা নিজের কাছেই বর্ণনা করছেন। তাই দেখে পাখি উপলব্ধি করল যে প্রমা বা নিশ্চয়জ্ঞান অন্তরউৎসারিত, স্বাধীন। (লোমশ : মহাভারতের প্রায় গোটা বনপর্বটাই লোমশবর্ণিত তীর্থমাহাত্ম্য। প্রমা: যথার্থ জ্ঞান; অবিদ্যা এবং মিথ্যাজ্ঞান দূরীভূত হলে যার উৎপত্তি।)

এই সত্যোপলব্ধির পর কেন আর অনর্থক নিরুদ্দেশে, অন্ধকারে মজে, ঘুরে বেড়াতে যাবে এই বিরহী পাখি? (তাহলে কেন বিরহী শুক: 'তাহলে' শব্দটি লক্ষণীয়। 'তাহলে'র পরিবর্তে 'তবুও' লিখলে কবিতাটি অনিশ্চয়তায় শেষ হত। তা হয়নি। মজায় কাকে: 'মজা' শব্দটির অর্থ দ্বিবিধ: বিপদে ফেলা এবং মুগ্ধ হওয়া। আমার মতে পরে 'কাকে' শব্দটি থাকায় প্রথম অর্থটিই এ-ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ, যে-লোকের প্রমাজ্ঞান হয়েছে, জাগতিক অন্ধকারে বিপদে পড়বার পাত্র নয় সে। অবশ্য দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করলেও ক্ষতি নেই। তাতে মানেটা দাঁড়ায়: অসার

সংসারের আকর্ষণে কে আর মুগ্ধ হবে?)

'নষ্ট নীড়' কবিতাটি স্বল্পাক্ষর এবং গূঢ়ার্থব্যঞ্জক; একাধারে প্রতীকী এবং চিত্রকল্পাশ্রয়ী। তবুও 'কৃষ্ণচূড়া'-কে যৌবনের এবং 'শুক'-কে বার্ধক্যের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করলে এই কবিতার একটি আপাতগ্রাহ্য সরল অর্থ খুঁজে পাই। মনে করা যাক এক বৃদ্ধ যৌবনের কাছে আশ্রয় খুঁজছে: 'চৈত্রশেষ' তার বসন্তদিনের সমাপ্তি সূচনা করছে; 'হাড়ে হাড়ে' শব্দ-দুটি তার শারীরিক অক্ষমতার এবং 'অধোমুখ সূর্য' তার হীনজ্যোতি বিগততেজের ইঙ্গিত দিচ্ছে। 'কেবলই দূর মুখর তবু পবনে,/চিরায়মাণ নির্বাপিত হবনে/কালের কৌতুক।' —বৃদ্ধের মনে অতীতের স্মৃতি কথা বলছে, স্মৃতি ছাড়া আর-কিছুই তো তার নেই। কিন্তু সেই মৃত অতীতেও সান্ত্বনা কোথায়? অতীতের কথাও তাই তার কাছে অসভ্যের প্রাচীন দুর্বোধ্য ভাষা বলে মনে হচ্ছে। তা ছাড়া কালগ্রাসে সব কীর্তিই তো ছাই হয়ে গেছে। অতীত এবং বর্তমানে আশ্রয় না পেয়ে এক নিরালম্ব মহাশূন্যতায় বৃদ্ধের মন ভেসে বেড়াতে লাগল। 'কখন ওঠে, পাতালভেদ ক'রে/অসম্ভূত অমা: বায়ুর বেগ সহসা যায় ম'রে;/দ্রাঘিমা দেয় ক্ষমা।' —নিরবলম্ব বৃদ্ধের মনে সহসা এক অভূতপূর্ব অন্ধকার দেখা দিল। যৌবনের জন্য যে-আবেগ এতক্ষণ সে অনুভব করছিল তার তীব্রতা কমে গেল; ছোটো হয়ে এল তার পৃথিবী, আত্মমগ্ন এবং কেন্দ্রীভূত হল।

'জ্যোতির্গামী কিন্তু সেই তমসও,/তারার ফেনা উৎসারিত ক্রমশ/মৌনে পড়ে তীর্থামৃত লোমশও,/স্বয়ংবর প্রমা।' —বাসনাকামনাহীন নিরাসক্তির অন্ধকারে বৃদ্ধের অন্তরালোক উদভাসিত হয়ে উঠল। যে-বার্ধক্য এবং তদবস্থ নিরাশ্রয় হতাশাকে তার শূন্য অন্ধকার মনে হচ্ছিল সেটাই জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল তার কাছে, ক্রমশই অর্থপূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল। সঞ্চিত অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশে তার আর উৎসাহ নেই, সে এখন অন্তর্মুখী, আত্মমগ্ন। বোধির আলোয় তার প্রমাজ্ঞান হয়েছে। 'তাহলে কেন বিরহী শুক

বৃদ্ধের মনে অতীতের স্মৃতি কথা বলছে, স্মৃতি ছাড়া আর-কিছুই তো তার নেই। কিন্তু সেই মৃত অতীতেও সান্ত্বনা কোথায়? অতীতের কথাও তাই তার কাছে অসভ্যের প্রাচীন দুর্বোধ্য ভাষা বলে মনে হচ্ছে। তা ছাড়া কালগ্রাসে সব কীর্তিই তো ছাই হয়ে গেছে।

নিরুদ্দেশে ঘোরে,/মজায় কাকে অনাত্মীয় অমা।' —নিজের ভিতরেই বৃদ্ধের আশ্রয় মিলেছে। যৌবনের বহির্মুখী উচ্ছলতা থেকে বার্ধক্যের জ্যোতির্ময় উপলব্ধির জগতে পৌঁছেছে সে। কেনই বা সে আর নিরুদ্দেশে ঘুরে বেড়াতে যাবে? বার্ধক্যের অন্ধকার মজাবে কাকে?

এই সরলীকৃত ব্যাখ্যা কী জানি আমার ঠিক মনঃপূত নয়। কিন্তু বিশ্লেষণের প্রয়োজনে কবিতাটিকে নানা দিক থেকে আক্রমণ করা দরকার বলেই সম্ভাব্য ব্যাখ্যাটি উপস্থিত করলাম।

একটি কবিতায় নানা বিচ্ছিন্ন আবেগ এবং চিন্তার সংযোগ কিছু অস্বাভাবিক নয়। একই কবিতার অর্থ এবং আবেদন, তাই, পাঠকে-পাঠকে ভিন্নতর হওয়া সম্ভব। আমার কাছে 'নষ্ট নীড়ে'র 'শুক' বৈষ্ণব-সাহিত্যের শুক-সারির শুক নয়, কী রূপকথার সেই প্রাজ্ঞ পাখি। এই কবিতার 'শুক', আমার বিবেচনায়, এক চিরকালের অনিকেত মানবাত্মা, নিঃসঙ্গ নিরুদ্দেশযাত্রী আবহমানকালের বলেই বয়োবৃদ্ধ। 'কৃষ্ণচূড়া' শিকড়াশ্রয়ী রূপরসগন্ধস্পর্শময় পৃথিবী, অর্থাৎ, সংসার এবং তৎ-জাত বাসনাকামনাদির আশ্রয়। 'অমা' শব্দটির আগে দু'বার দুটো বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে: অসম্ভূত' এবং 'অনাত্মীয়'। বলা বাহুল্য, শব্দটি দু'জায়গায় দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'অসম্ভূত অমা' হল সেই শাশ্বত অমা যা জ্যোতির্গামী, যা নীহারিকাপুঞ্জের সৃষ্টি করে। এই অমা অশুভ বা অমঙ্গলসূচক নয়, তা জ্যোতির্ময় উপলব্ধির অবলম্বন। এই অমাকে সঙ্গে নিয়েই মানুষের জন্ম। তত্ত্বকথায় না গিয়েও বলা যায় এই অমা নিগূঢ় আত্মজিজ্ঞাসায় পীড়িত এক শূন্যতাবোধ, বিষয়াসক্তিতে যাকে ভুলে থাকা যায়, ভুলে থাকার অবিরত চেষ্টা করা হয় কিন্তু হঠাৎ এক নিরাশ্রয় গোধূলিলগ্নে পাতাল ভেদ করে অবচেতন থেকে তার আবির্ভাব ঘটে। পক্ষান্তরে 'অনাত্মীয় অমা' হল আমাদের সেই অতিপরিচিত অমা, সূর্য অধোমুখ হলেই যার দেখা পাওয়া যায় অথবা যা কিনা সংসারাসক্তির অন্ধকার অথবা পার্থিব অভাববোধজাত অজ্ঞান বা অবিদ্যার অন্ধকার। এই কবিতায় লোমশ-প্রসঙ্গও তাৎপর্যপূর্ণ। রাজ্যচ্যুত পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাসকালে যখন তীর্থে-তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তখন ঋষি লোমশই ছিলেন তাঁদের প্রধান উপদেষ্টা, যুধিষ্ঠিরের কাছে সবিস্তারে তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণনা করতেন তিনি। 'মৌনে পড়ে তীর্থামৃত লোমশও,/স্বয়ংবর প্রমা'— এই বাক্যটির অর্থ এই যে শূন্যতাবোধ থেকে স্বতই বোধি বা আত্মজ্ঞানের জন্ম হয়, তার জন্য কোনো উপদেষ্টা বা পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন হয় না। চিরকালের রাজ্যচ্যুত নষ্টনীড় বিবিক্ত মানবাত্মাকে স্বচেষ্টায় মুক্তির পথ খুঁজে নিতে হয়, অধীত বা শ্রুত বিদ্যা তাকে বিশেষ সাহায্য করে না।

'নষ্ট নীড়ে'র শেষ দুই পঙক্তি, আমার প্রথমে মনে হয়েছিল, প্রশ্নসূচক তথা সংশয়াত্মক। আমার যুক্তিটা ছিল মোটামুটি এইরকম: শুককে 'বিরহী' বলা হয়েছে। কার জন্য তার বিরহ? বিরহ প্রমা-র জন্য। কিন্তু প্রমা তো 'স্বয়ংবর'। ইচ্ছে করলেই তার সঙ্গে মিলন সম্ভব নয়। তার কাছে যাবার চেষ্টা করা যায়, তাকে পাওয়া দুঃসাধ্য। তাই কি মানবাত্মার শেষহীন নিরুদ্দেশ যাত্রা? নিরাশ্রয় অন্ধকার

একাকিত্বে ডুবে থাকা? বলা বাহুল্য, এ-সিদ্ধান্ত একেবারেই ভুল। শুকের বিরহ আসলে সংসারের জন্যই, যে-সংসার তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তা ছাড়া, দ্বিতীয় চিন্তার পর দেখলাম, 'অমা' শব্দটির পূর্ববর্ণিত দ্বিবিধ ব্যবহার স্বীকার করে নিলে শেষ দুটি পঙক্তির অর্থ সহজতর হয়ে আসে। বুঝতে পারি কবিতাটি সদর্থক। আত্মজ্ঞান লাভের পরেও মানুষ আর নিরুদ্দেশে ঘুরে বেড়াবে কেন? নিজেকে চিরকালের একাকী জেনেও কাতর হবে কেন সঙ্গীবিরহে? কাকে মজাবে সংসারের পিছুটান বা অবিদ্যাজনিত অন্ধকার?

'নষ্ট নীড়' সম্ভবত সুধীন্দ্রনাথ দত্তের শেষ কবিতা, তাঁর সারা জীবনের দার্শনিক অভিজ্ঞতার উজ্জ্বল হীরকখণ্ড। রবীন্দ্রনাথের একটি ছোট গল্পের শিরোনাম এই কবিতাটিরও শিরোনাম। কিন্তু চারুলতাকে যদি-বা 'কৃষ্ণচূড়া' হিসেবে কষ্টেসৃষ্টে মেনে নিই, ভূপতিকে 'শুক' বলে কিছুতেই না। ভূপতির মন জগদ্ব্যাপারেই আবদ্ধ ছিল, আদর্শবাদ কিছু সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার নয়। সুধীন্দ্রনাথ 'নষ্ট নীড়' অর্থে জীবনের ক্ষণস্থায়িত্বই বোঝাতে চেয়েছেন, সোজাসুজি বলতে চেয়েছেন: এত পরিশ্রম করে যে নীড় আমরা রচনা করি তা শেষ পর্যন্ত আমাদের আশ্রয় দেয় না। আগেই বলেছি স্বল্পাক্ষরতা 'নষ্ট নীড়ে'র প্রধান গুণ। এই কবিতায় একটি শব্দ, একটি অক্ষরও ব্যবহৃত হয়নি যা অপ্রয়োজনীয়। কবিতাটি প্রথম পাঠের সময় রবীন্দ্রনাথের 'দুঃসময়' মনে পড়তে পারে। উভয় কবিতাতেই দেখতে পাই একই চিত্রকল্প: এক সঙ্গীহীন বিহঙ্গ রাতের অন্ধকারে তুলনীয় বিরুদ্ধ পরিবেশে আশ্রয়শাখা খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু, বলা বাহুল্য, মিলটা ওই পর্যন্তই, আন্তরিক নয়, প্রাতিভাসিক। যেমন কিনা, 'কৃষ্ণচূড়া নিষেধে মাথা নাড়ে' পড়বার সময় আচমকা— 'No, says the tree. It says: No! by the sparkling of its proud head' ভালেরির এই লাইনটা মনে আসে। যাই হোক, এ-জাতীয় সাদৃশ্যসন্ধানে আপাতত উৎসাহ না

কবিতাটি প্রথম পাঠের সময় রবীন্দ্রনাথের 'দুঃসময়' মনে পড়তে পারে। উভয় কবিতাতেই দেখতে পাই একই চিত্রকল্প: এক সঙ্গীহীন বিহঙ্গ রাতের অন্ধকারে তুলনীয় বিরুদ্ধ পরিবেশে আশ্রয়শাখা খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু, বলা বাহুল্য, মিলটা ওই পর্যন্তই, আন্তরিক নয়, প্রাতিভাসিক।

থাকায় ক্ষুদ্র সাধ্যমতো অনপেক্ষভাবে মূল কবিতাটিতেই আমি বোঝবার চেষ্টা করেছি, এবং আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে মেধাবী পাঠক 'নষ্ট নীড়ে' আরও অনেক রহস্যের সন্ধান পাবেন। পরিশেষে এইটুকু শুধু বলা দরকার যে ৩।২ মাত্রার এই কবিতাটিতে উক্তি এবং আবেগ যে-সংহত ধ্বনিগাম্ভীর্য নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে তা কবিতাটির অর্থোদ্ধারের আগেই পাঠকচিত্তকে আত্মমুখী করে তোলে। এ-সাফল্য নিশ্চয় অসামান্য।

[চিন্তাবস্তুর দিক থেকে ''দশমী''-র কবিতাগুলি পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত; প্রত্যেকটিতেই একই মৌল আত্মজিজ্ঞাসা: ক্ষণিক প্রত্যয় এবং তাৎক্ষণিক সংশয়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব; নিজেকে খোঁজা, নিজের সঙ্গে বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া, নিজের আধিভৌতিক দুর্বলতাগুলোকে বিশ্লেষণ করা। অবশেষে, 'নষ্ট নীড়' কবিতায় সুধীন্দ্রনাথ যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, লক্ষ করবার বিষয়, রবীন্দ্রনাথের শেষ কবিতায় ঠিক সেই কথাই ভিন্ন ভাষায় বলা হয়েছে। 'তোমার সৃষ্টির পথ' কবিতায় যে-ছলনাময়ী এবং তার প্রবঞ্চনার কথা শুনতে পাচ্ছি, 'নষ্ট নীড়ে'র 'কৃষ্ণচূড়া' তো তারই ভাবচ্ছায়া; উভয় কবিতাতেই জ্যোতিষ্ক রয়েছে এবং তারা ইঙ্গিতে জানাচ্ছে যে আপন আলোকে ধৌত অন্তরের চিরস্বচ্ছ পথ-ই মুক্তির পথ। তফাত এই যে সুধীন্দ্রনাথ ঈশ্বরবিশ্বাসে সোচ্চার নন, আত্মজ্ঞানই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট, তদতিরিক্ত বিষয়ে বৌদ্ধদের মতো তিনি একেবারেই নীরব। তাই রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি সাংখ্য-দর্শনের আলোয় পরিষ্কার বোঝা গেলেও (কৌতূহলী পাঠক এ-বিষয়ে 'বড়বাবু' গ্রন্থে সৈয়দ মুজতবা আলী-র ব্যাখ্যাটি পাঠ করে নিলে উপকৃত হবেন) সুধীন্দ্রনাথকে সাংখ্যবাদী বলতে কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকে। তবে একটা সন্দেহ থেকে যায়। মনে হয় শেষজীবনে খেলাধুলো সাঙ্গ করে, কবি তাঁর পিত্রালয়েই ফিরে এসেছিলেন,—হীরেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের প্রশান্ত ভাবচ্ছায়ায়।]

দীপ্তি ত্রিপাঠী

কবিতাটিতে দেখি কৃষ্ণচূড়া তার টকটকে লাল ও দগদগে হলুদ রঙ নিয়ে জৈব জীবনের প্রতীক। আর শুক পাখি এই পৃথিবীতে আসক্ত আত্মা, যে বারবার বাসা গড়ে— বারবার যার বাসা ভেঙে যায়। লাল, হলুদ, সবুজ— এই রঙগুলির বিন্যাস এখানে অনর্থক নয়। কবি রঙের সংকেতে জীবন, তার প্রেম ও হিংসা— তার ভোগ ও জ্বালার রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। ইন্দ্রিয়ই তো জীবন; সে যদি প্রত্যাখ্যান করে তবে গতি কোথায়? শূন্যে! 'কৃষ্ণচূড়া নিষেধে মাথা নাড়ে, কুলায় খোঁজে শুক:' রঙের বিন্যাস লক্ষণীয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত কবির একটি পত্রের অংশ উদ্ধৃত করি— যাতে সুধীন্দ্রনাথের মানসিকতাকে আরও বোঝা যাবে:'—the krishnachura with its flowers of violent red and staring yellow is a symbol of physical life, while the parrot is the wounding self. If that be so, the colour — scheme of the image should perhaps be preserved....'। জীবনকে তার রূপ রস গন্ধ স্পর্শ নিয়ে ভালোবাসি কিন্তু তাতে belong করতে পারি না, তার শিকড় খুঁজে পাই না— এই যে sense of belonging -এর অভাব এইটেই কবির মূল চিন্তা। শিরোনামটি স্মরণীয় 'নষ্ট নীড়ে'র পূর্ববর্তী

রচনায় যেমন কখনও তিনি ত্রিশঙ্কু, কখনও যযাতি, কখনও ভ্রষ্টতরীর পঙ্গু নাবিক, তাঁর এই শেষ (সম্ভবত) কবিতাটিতেও তেমনি তিনি বিরহী শুক।

'চৈত্রশেষ' অর্থাৎ বর্ষশেষ অর্থাৎ কবির জীবনও শেষ হয়ে এসেছে। রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ' কবিতার কথা স্বতই মনে পড়ে। সেখানে কবিজীবনের একটি অধ্যায়শেষকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে চৈত্রের শেষ অপরাহ্নবর্ণনায়। 'সূর্য অধোমুখ' অর্থাৎ দিনশেষের অস্তগামী সূর্য, ঐ একই তার ব্যঞ্জনা। (প্রসঙ্গত: "দশনীয় নামটি ইঙ্গিতবহুল— দশমীর অর্থ বিজয়া দশমী অর্থাৎ বিসর্জন; কবি অজ্ঞাতে, নাকি সচেতনে, এই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে এ-ই তাঁর শেষ কবিতাগ্রন্থ?)

কবি কী দেখলেন তাঁর শেষ বেলায়? 'কোথায় যেন নিবিদ বলে যবেন'— অর্থাৎ আজকের যুগ মুখর হয়ে উঠেছে ফিলিস্টাইনদের সংস্কৃতির নামগন্ধহীন ক্রিয়াকলাপে। কারণ 'নিবিদ' হল বেদের প্রাচীন গদ্যাংশ এবং এ-ভাষা যবনদের মুখে উচ্চারিত হওয়া অনুচিত। ('নিবিদ' শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের 'সিন্ধুতাণ্ডবে'র চরণটি মনে প'ড়ে মনটা হঠাৎ পঞ্চচামর ছন্দের দোলায় দুলে ওঠে। বুদ্ধদেব বসুর মতোই বলতে ইচ্ছা করে— 'সুধীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ার অন্যতম প্রধান সুখ এই যে তিনি অনবরত আমাদের অন্যান্য প্রিয় কবিদের কথা স্মরণ করিয়ে দেন।' কিন্তু শুধুই স্মরণ করান না, সেইসব চিরপরিচিত কবিপ্রসিদ্ধিতে অনেক সময় বিপরীত রস সংযোজন করে যে-কঠিন টান তৈরি করেন তাতেই এক অভিনব আস্বাদ আমরা লাভ করি।)

সেই যবনদের মুখে নিবিদ-উচ্চারণ অর্থাৎ সংস্কৃতিহীন ব্যক্তিদের বৃথা সংস্কৃতিবান হবার ভ্রান্ত চেষ্টা যে এই যুগে চলেছে তার কারণ চিরকালের শাশ্বত মূল্যবোধগুলি বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। নির্বাপিত সেই হোমের আগুন জ্বালাতে পারে ব্রাহ্মণ— যবন নয়। তাই এই ব্যর্থ প্রচেষ্টায় মহাকালের পরিহাস 'কালের কৌতুক'। স্তব্ধ মহাশূন্য যেন পাখির মতো ডানা ঝেড়ে 'গোধূলি' অর্থাৎ সকল সমাপ্তিকে ঝেড়ে ফেলছে। আর জীবনের কাছে বাধা পেয়ে অনিকেত আত্মা ত্রিশঙ্কুর মতো শূন্যে নিরালম্ব— 'কৃষ্ণচূড়া তাড়ায়, ওড়ে শুক'। এখানে 'ড়' বর্ণের ছেকানুপ্রাসটি হৃদয়কে

অগ্রজের আপ্তবাক্য শুনে আজকের যুগ কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হবে না। মানুষের নিশ্চিত জ্ঞান আজ স্বয়ংনির্ভর— সে নিজেই পথ বেছে নেয়। কিন্তু তা-ই যদি, তবে কেন মানুষের আত্মা অনিকেত? 'তাহলে কেন বিরহী শুক নিরুদ্দেশ ঘোরে'? কেনই বা হৃদয়-শুভবুদ্ধি-প্রজ্ঞা-বিনাশী অন্ধকার আমাদের আচ্ছন্ন করে?

বিদীর্ণ করে দেয় না?

অজাত অমা পাতাল ভেদ করে সৃষ্টির সব সাফল্যকে ঘিরে ধরেছে। অগ্রগতি শেষ হয়ে এসেছে। সমগ্র পৃথিবীই সায় দিচ্ছে এই total annihilation-এ, এই বিনষ্টিতে। 'দ্রাঘিমা' শব্দটির প্রয়োগ এখানে চতুর তথা মধুর। দ্রাঘিমা অর্থাৎ longitude অর্থাৎ পৃথিবীর সব ভৌগোলিক দেশগুলি। (মালার্মের অনুসরণে এই ধরনের প্রয়োগ সুধীন্দ্রনাথ অন্যত্রও করেছেন যেমন 'বসন্ত' না বলে বলেছেন 'ফাল্গুনী', 'পাখি' না বলে বলেছেন 'পাখা'।)

'দ্রাঘিমা দেয় ক্ষমা' এই চরণে ছেকানুপ্রাস ছাড়াও চলতি কথার 'ক্ষমা-দে বাবা' এই প্রবচনটির সুন্দর প্রয়োগ লক্ষ করি। পৃথিবী বললে 'দ্রাঘিমা'র প্রয়োগও অভিনব। অবশ্য অভিনব হলেই তা সার্থক হয় না। কিন্তু এখানে কি পৃথিবীর একটিও প্রতিশব্দ বসানো চলত? বিনষ্টির এই যে অন্ধকার— এও জ্যোতির্মুখী। তারও প্রার্থনা— অমৃতের প্রার্থনা। ফাউস্ট যেমন শয়তানের কাছে আত্মা বিক্রি করেও স্বর্গাভিলাষী। অন্ধকারেও 'তারার ফেনা উৎসারিত'। অন্ধকারের আবর্ত থেকেই জ্যোতির বিকাশ। তমস ও জ্যোতি তো বিচ্ছিন্ন নয় অঙ্গাঙ্গিযুক্ত। কিন্তু আজকের এই অন্ধকার যুগে প্রাজ্ঞকণ্ঠ মৌন। যুধিষ্ঠিরের সংকটকালে— বনবাসের দুঃখের দিনে লোমশ মুনি তীর্থামৃত শুনিয়েছিলেন। চরম দুঃসময়ের মধ্যেও সেদিন অমৃতের মন্ত্র সোচ্চার ছিল লোমশের অর্থাৎ প্রাজ্ঞের কণ্ঠে। তা আজ নীরব কেন? কারণ অগ্রজের আপ্তবাক্য শুনে আজকের যুগ কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হবে না। মানুষের নিশ্চিত জ্ঞান আজ স্বয়ংনির্ভর— সে নিজেই পথ বেছে নেয়। কিন্তু তা-ই যদি, তবে কেন মানুষের আত্মা অনিকেত? 'তাহলে কেন বিরহী শুক নিরুদ্দেশ ঘোরে'? কেনই বা হৃদয়-শুভবুদ্ধি-প্রজ্ঞা-বিনাশী অন্ধকার আমাদের আচ্ছন্ন করে? 'মজায় কাকে অনাত্মীয় অমা?'

যে-নোঙরের বা যে-নিশ্চিত নীড়ের সন্ধান ('অক্ষয়বট', 'পুনর্বাদী প্রাণপ্ররোহ' কিংবা 'অনাম চিরসত্তা') সুধীন্দ্রনাথ আজীবন করেছেন তাকে কোথাও মেলেনি। তবে কেন তারই জন্য জীবনব্যাপী এই ব্যাকুলতার শেষ হয় না।

বিনয় মজুমদার

সুধীন্দ্রনাথের 'নষ্ট নীড়' কবিতাটি সম্বন্ধে শ্রীযুক্তা দীপ্তি ত্রিপাঠী লিখিত আলোচনাটি পড়ে অত্যন্ত ভালো লাগল। অনেক বিষয় তিনি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু একটি বিষয় একেবারে অনুল্লিখিত রেখে গিয়েছেন। সে বিষয় হচ্ছে এই যে, কবিতা রচনার সময়ে কবির অবচেতনার লীলা। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে যা দেখেছি তাতে আমার মনে হয় যে-কোনও কবিতা আলোচনা করার সময়ে এ-বিষয়ে স্বল্পপরিমাণ অনুমানও অন্তত লিপিবদ্ধ করা উচিত। 'নষ্ট নীড়' কবিতাটিতে প্রদত্ত স্থানক্রমে উপস্থিত এই শব্দগুলি আমার নিকটে অন্য শব্দগুলি অপেক্ষা এ-বিষয়ে বেশি আলোকপাতকারী বলে মনে হয়েছে: কুলায়, অধোমুখ, ধীরে ঝাড়ে, পাতাল ভেদ করে, ফেনা উৎসারিত ক্রমশ, মজায় কাকে অনাত্মীয় অমা। কবিতাটির আবচৈতনিক বিষয়বস্তুর অংশগুলি যে-কালানুক্রমে বিন্যস্ত যথাযথ সেই স্থানানুক্রমে ব্যবহৃত হয়ে আছে।

সাধারণ সাংবাদিকতাসুলভ রচনাকে অলংকৃত করলে কবিতা হয়, নাকি সার্থকরূপে নিরলংকৃত করলে জীবনানন্দ দাশ মহাশয়ের 'অদ্ভুত আঁধার এক' কবিতাটি সম্বন্ধে (আমার আলোচনা এ-প্রসঙ্গে পঠিতব্য) সার্থক কবিতা হয়। Elimination. substitution ইত্যাদি করার সময়ে আমরা কি প্রকৃতপক্ষে কাব্যবস্তুকে বিবেশ করি না?

বিশ্বে যে-কোনও বিষয়বস্তুই, অলংকার-শোভিত বেশপরিহিত আবৃত অবস্থায় থাকে। এবং ফলে কবিতার প্রাথমিক বিষয়বস্তু থাকে কেবল দৃশ্য রূপে, ভোগ্য রূপে নয়, তার প্রবেশ দৃষ্টি পর্যন্ত, হৃদয় পর্যন্ত নয়। এবং সত্য কথা বলতে কি বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর মতো কবিতার বিষয়বস্তু থেকেও আবরণ ও আভরণ উন্মোচন করে অপসারণ করাই হচ্ছে কবির প্রারম্ভিক কর্তব্য— যাতে বিষয়বস্তুর মূল শরীর কবির নিকটে উদঘাটিত উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। কমলালেবুর বহিরাবরণ অপসারিত করলে দেখা যায় অভ্যন্তরের বস্তুর সঙ্গে বহিরঙ্গের মিল সামান্যই, কিন্তু অভ্যন্তরাঙ্গ কি কমলালেবুর অলংকৃত রূপ, নাকি প্রকৃতাংশ? অতঃপর কাব্যবস্তুর প্রাণকেন্দ্রের সন্ধান করা, বিভিন্ন উপায়ে ক্রমাগত প্রাণকেন্দ্রে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে যাওয়াকেই কবিতারচনা বলা যায় নাকি? অনাবৃত কাব্যবস্তুর অভ্যন্তরে প্রবেশের যে-সকল পথমুখ সন্ধান করে পাওয়া যায় সেগুলি যথাযথরূপে এবং সফলরূপে ব্যবহার করা ভিন্ন প্রাণকেন্দ্রে পৌঁছনোর অন্য কোনও উপায় নেই। এই পথের অদৃষ্টপূর্ব 'অনাত্মীয় অমা' আমাদের ভাববিহ্বল করে। এ-সময়ে ছন্দের অপরিহার্যতা উল্লেখযোগ্য।

গণিতে যেমন এক পঙক্তি লিখেই অতঃপর 'অথবা' লিখে পরবর্তী পঙক্তি এবং পুনরায় 'অথবা' লিখে তারও পরের পঙক্তি— এইভাবে লিখতে-লিখতে যেতে হয়, এই পদ্ধতিতে ক্রমে-ক্রমে গণিতবস্তুর সারমর্মে পৌঁছতে হয়। পঙক্তির পর পঙক্তি লিখতে-লিখতে একেবারে সর্বশেষ রূপটি (পঙক্তিটি) হয়তো দেখা গেল প্রথম অংশের মতো মোটেই নয়। তা সত্ত্বেও এই সর্বশেষ রূপটি প্রকৃত সাররূপ, প্রাণরূপ যা আমাদের অন্বিষ্ট, প্রার্থিত। কবিতাতেও দেখি অপ্রয়োজনীয় জড়তা, অনীহা, অনুত্তেজনা দূর করতে-করতে (সুসংগত ছন্দ, পর্ব, শব্দ ইত্যাদির মাধ্যমে) কাব্যদেহের হৃদয়কে উদ্বেল করে তুলতে-তুলতে পাঠকের হৃদয়ও উদ্বেল হয়ে ওঠে; উদ্বেল হয়ে উঠে কবিতার হৃদয় ও পাঠকের হৃদয় একাত্ম হয়ে, এক হয়ে নৃত্য করতে থাকলেই বুঝতে হবে কাব্যরচনা সুসফল, কাব্যপাঠও সুসফল। কবিতার সারাস্বাদন সমাপ্ত হলে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হৃদয়ে নৃত্য থামিয়ে কবিতাকে বুকে জড়িয়ে ধরে রাখা। আমার মনে হয় এটাই কবিতারচনা এবং পাঠের একমাত্র সঠিক ব্যাখ্যা। আর তাহলে যা বলেছিলাম— অলংকরণ নয় অলংকারমোচনে, বেশসংযোজন নয় বেশাপসারণে, এবং অতঃপর সারানুসন্ধানে এবং আস্বাদনে কবির কবিত্ব। এবং ফলে '...the krishnachura with its flowers of violent red and staring yellow is a symbol of physical life...' আর অলংকরণ নয়, symbol নয়, প্রকৃতপক্ষে কাব্যবস্তুর প্রকৃত সারাংশ যা বহিরঙ্গের অন্তরাল থেকে এনে কোলে তুলে নেওয়া হয়েছে এবং '...while the parrot is the wounding self' তো বটেই। কেবল এই 'wounding' চরিত্র নিয়ে 'parrot' রূপেই বিশ্বের দর্শনরাজ্যের ঐকতানে মিলিত হওয়া যায়— অর্থাৎ এটাই কাব্যদেহের প্রকৃত প্রাণচরিত্র, অলংকরণ নয়, সর্বপ্রকারের আবরণের অন্তরালবর্তী বৈশ্বিকতা, প্রকৃততা।

> বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর মতো কবিতার বিষয়বস্তু থেকেও আবরণ ও আভরণ উন্মোচন করে অপসারণ করাই হচ্ছে কবির প্রারম্ভিক কর্তব্য— যাতে বিষয়বস্তুর মূল শরীর কবির নিকটে উদঘাটিত উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর কাব্যবস্তুর প্রাণকেন্দ্রের সন্ধান করা, বিভিন্ন উপায়ে ক্রমাগত প্রাণকেন্দ্রে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে যাওয়াকেই কবিতারচনা বলা যায় নাকি?

যাই হোক, আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার ইচ্ছা ছিল আবচৈতনিক দিক সম্বন্ধে। মনে রাখা উচিত যে আবচৈতনিক দিক কখনোই একটি থাকে না সর্বদাই একাধিক থাকে। এই কবিতায় উপস্থিত 'অমা' মোটেই হতাশা-সঞ্চারী নয়, প্রকৃতপক্ষে এই 'অমা' উপযোগ্য এবং পরিশেষে 'মৌন পড়ে তীর্থামৃত লোমশও' উল্লেখ করে সুধীন্দ্রনাথ তাঁর আশ্চর্য কবিত্বশক্তি দিয়ে অন্তত আমাকে তো হতবাক করে দিয়েছেন। 'লোমশ'-এর এই নিস্তেজ রূপটি— 'তীর্থামৃত' পান করার পূর্ণ ও সার্বিক আনন্দ নিয়ে 'মৌনে' ঢলে পড়া রূপটি— কোনওদিন ভুলবার নয়, অন্তত দীপ্তি ত্রিপাঠী মহোদয়া কোনওদিন ভুলবেন না বলেই (তাঁর আলোচনা পড়ে) মনে হল।

ত্রিদিব ঘোষ

সুধীন্দ্রনাথ যে বৌদ্ধদর্শনে আকৃষ্ট হয়েছিলেন 'দশমী' কাব্যগ্রন্থের কবিতাবলিতে তার স্বাক্ষর রয়েছে; 'নষ্ট নীড়' কোনও ব্যতিক্রম নয়। বৌদ্ধদর্শনের প্রেক্ষিতে কবিতাটির অন্তর্নিহিত অর্থ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে ধরা পড়ে। দেখতে পাই এই কবিতায় দুঃখবাদ আছে, হতাশাবাদ নেই। ভারতীয় দর্শনের ঐতিহ্যানুসারী বৌদ্ধধর্মেও বলা হয়েছে যে অবিদ্যাই দুঃখের জনক এবং প্রকৃত জ্ঞানলাভের ফলে অবিদ্যার সঙ্গে-সঙ্গে দুঃখের সমাপ্তি ঘটে। অবশ্য অবিদ্যানাশে কোনও পারমার্থিক সত্তার জ্ঞান হয় কিনা এ-বিষয়ে বৌদ্ধধর্ম একেবারেই নিরুত্তর। ইন্দ্রিয়সংযোগের ফলে যে পরিদৃশ্যমান জগৎ আমাদের গোচরে আসে, বৌদ্ধদর্শন অনুযায়ী তা ক্ষণে-ওঠা-ক্ষণে-ডোবা এক পরিবর্তনশীল প্রবাহমাত্র এবং সেটাই আমাদের তথাকথিত 'আমিত্ব'; আমাদের 'অহং' কতকগুলি প্রত্যয়পরম্পরার সমষ্টিমাত্র। প্রজ্ঞালাভের ফলে নিরাসক্তি আসে; মানুষ ভ্রান্তির ভার, তৃষ্ণার দাহ থেকে মুক্ত হয়, বোধির আলো জ্বলে ওঠে তার মধ্যে— যে-আলো প্রতি মানুষকে নিজের চেষ্টায় নিজের মধ্যে জ্বালিয়ে নিতে হয়। বৌদ্ধসাধকেরা মুক্তি খোঁজেন নিজেকেই নিজে প্রদীপ দেখিয়ে, তাঁরা বলেন: আত্মদীপ ভব। 'নষ্ট নীড়ে' ব্যবহৃত 'স্বয়ংবর প্রমা' শব্দটিতে বৌদ্ধশাস্ত্রীয় ইঙ্গিত রয়েছে বলে অনুমান করা যায়। আমার ধারণা কবিতাটির শেষ পঙক্তিকটিতে সদর্থক প্রত্যয়ের সুর ধ্বনিত হয়েছে।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
কবিতা-পরিচয়, সপ্তম সংকলন বছর
(মাস অনুল্লিখিত) সম্ভবত কার্তিক ১৩৭৩ সাল

কবিতা-পরিচয় প্রশ্নমালা

উত্তর লিখেছেন: অমিয় চক্রবর্তী

নীচের প্রশ্ন-ক'টি পাঠিয়ে বাংলা ভাষার বিভিন্ন কবিকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল, তাঁরা যেন পৃথক-পৃথকভাবে অথবা একসঙ্গে জড়িয়ে প্রশ্নগুলির উত্তর লেখেন।—
সম্পাদক

১। আমাদের দেশে এখনকার তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক সচেতনতা ও তীব্র সামাজিক অস্থিরতা কবিতা লেখার সময় আপনাকে প্রভাবিত করছে বলে আপনার মনে হয়? যদি করে, কীভাবে?

২। অত্যধিক রাজনৈতিক সচেতনতার ফলে সম্প্রতি বাংলাদেশে কবিতা সম্পর্কে উদাসীনতা এসেছে বলে আপনার মনে হয়? অথবা কবিতাই ক্রমে সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বলে আপনি মনে করেন? বাংলার সমাজমানসে বাংলা কবিতার প্রভাব কীরকম বলে আপনি মনে করেন?

৩। কবিতায় আপনি যে-ভাষায় কথা বলেন তার সঙ্গে মুখের ভাষার কোনও বিরোধ আপনি কি কখনও অনুভব করেছেন? কবিতার ভাষাকে আপনি কি মুখের ভাষার কাছাকাছি রাখবার পক্ষপাতী? অথবা কবিতার এক নিজস্ব ভাষা-নির্মাণই আপনার লক্ষ্য? কবিতার ভাষা জনসাধারণের ভাষা নয় বলে সাধারণ মানুষের যে-অভিযোগ তাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

৪। জনসাধারণের জীবনযাপনের সমস্যা বা সমসাময়িক প্রসঙ্গ কবিতায় সঞ্চারিত হলে, বা তা নিয়েই লিখলে, কবিতা কি আরও বেশি লোককে আরও গভীরভাবে আকৃষ্ট করবে বলে আপনি মনে করেন?

৫। এখনকার এই সময় কবিতা লেখার পক্ষে অনুকূল বা প্রতিকূল মনে হয় আপনার?

১-২-৩-৪-৫ : প্রশ্নোত্তর নয়, প্রাসঙ্গিক

মানবসংসারের যে-অংশটুকু জল-হাওয়া-ভাষা-ইতিহাসের বিশেষ যোগে আমাদের একান্ত বাংলা স্বদেশ, তার সামাজিক, আর্থিক, রাষ্ট্রিক বিবিধ আন্দোলন আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের অঙ্গীভূত। চতুর্দিকের প্রাণধারায় আমরা অভিষিক্ত: অবচেতনায় যেমন বাংলার মেঘলা দিন, কচি ধানের নীলসবুজের বিস্তার তেমনি পাড়াপড়শির সুখদুঃখের রেশও বহুসঞ্চারিত। শুধু তাই নয়, পূর্ণ চেতনা দিয়ে স্পষ্ট জানি দেশের একটি মর্মরূপ।

আর্তির দিকে নিত্য নিরন্নের ভিড়, বাংলার পল্টন পুলিশ, পাণ্ডা পুরোহিতের বিক্রম— তালিকা যতই সংক্ষিপ্ত হোক তাতে যোগ করা চাই বাদামি বুরোক্রাসির ত্রাস-ব্যবসায়ীর দল। কোথায় সেই বাঙালি লেখক, চিত্রী, সাংগীতিক যাঁর রচনায় এই স্বদেশি সমাজ অস্তিমের মূল্যে স্বীকৃত নয়? হয়তো এই স্বীকৃতি সব সময়ে অতি প্রকট নয় কিন্তু আমাদের কারো পক্ষেই আপন সমাজকে অবজ্ঞা করে শিল্পী সাহিত্যিক সাজা চলবে না।

পরিবেশের মাঙ্গলিক দিকও মানতে হয়। সেখানে খোল-করতাল বাজে, অভাব-অভিযোগের উর্ধ্বে শুনতে পাই শঙ্খ-সানাইয়ের ধ্বনি, চিরন্তন বাংলার গৃহস্থ সংসারে দেখি প্রত্যহের কল্যাণ। এই চরম দুর্দিনেও নতুন কালের ছেলেমেয়েদের জাগরণ সংগ্রাম, যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রাগ্রসর যাত্রা। আতিশয্য পেরিয়ে প্রত্যয়ের নবীন উদ্যম।

আমার সামান্য কবিতাবলির প্রসঙ্গ তুলেছেন। অন্য সবারই মতো বাংলা এবং ভারতীয় সম্বন্ধের আত্মিক রূপ নিশ্চয়ই আমার লেখায় প্রকাশ পেয়েছে। কোথাও সন্দীপের দ্বীপ-সূত্রে ত্যাগী বীর লালমোহনের কাহিনি, কোথাও 'অন্ন-দাও'-এর তীব্র সাক্ষ্য। জেটির কয়লা, এবং মলিন পরিত্যক্ত খালাসির ক্ষণিক উল্লাস— পাশে গড়ের মাঠ। পাগলা জগাইয়ের গান। চেতন-স্যাকরার দোকান। আরো কত কী। যেখানেই থাকি, দেশে বা পরবাসে, দূরে যাবার উপায় নেই। স্বীকার করব ক্ষোভে ক্রোধে বেদনায় জাজ্বল্যমান আমার অন্তরের বাংলাদেশ— এত ক্ষয়ক্ষতি অত্যাচার যেন আর কোথাও দেখিনি। হয়তো এটাও প্রীতির অতিশয়োক্তি। কিন্তু দশকের পর দশক বাংলায় যা দেখলাম তার বর্ণনায় নিদারুণ রংকে বাহুল্য বলব না।

পূর্বেই তুলেছি পূর্ণতার কথা। যেমন করেই হোক সমগ্রের দৃষ্টি দিয়েই বাস্তবকে মানব। মনে পড়ে সেই বরিশালের স্টিমার, মেঘনার জল,অবিভক্ত বাংলার মাতৃভাষা যা কোনওদিনই বদলাবে না শান্তিনিকেতনের আকাশ। কবিতায় শুধু দৃশ্যাবলি নয়, অন্তরের চিত্রাবলি নিশ্চয়ই প্রকাশ পেয়েছে— দুয়ের যোগে আমার কাব্যকে আপনারা বিচার করবেন। কোনও দিককেই বাদ দিতে চাইনি।

সম্প্রতি আমাদের সমাজচেতনা বিশ্বজুড়ে আরোই প্রবলভাবে সাহিত্যে উপস্থিত। এখানে সাহিত্যের দিক থেকে বিঘ্নও আছে কেননা আমাদের শিল্পলোক সংসারে এবং সংসারের ঈষৎ উর্ধ্বে উভচারী। ('উর্ধ্ব অর্থে কোনও উন্নাসিক বা নকল আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করা আমার উদ্দেশ্য এবং অভ্যাসের বিরুদ্ধ।) আমার বলবার কথা এই যে যথার্থ শিল্পী আপন রুচি-প্রকৃতি অনুযায়ী একটি ভারসাম্য রক্ষা করবেন: তুমুল আন্দোলনের মধ্যেও সত্তা এবং শান্তির অধিকার হারাবেন না। কোনও সাধারণ নিয়ম বা অনুজ্ঞা এখানে খাটে না— প্রত্যেক আর্টিস্ট জানেন কোথায় গ্রন্থি-বাঁধা পড়ল বাংলার দুর্দশার সঙ্গে অপ্রতিহত বাংলা জীবনীর।

অথচ মানুষের শিল্পে যদি হঠাৎ ঝড়ের অন্ধকার নামে তাতে ভয় পাব না। এতেও সূক্ষ্ম বোধশক্তির পরিচয়, কিন্তু আশা করি প্রলয়ের কীর্তনে সেতারের তার ছিঁড়বে না। ছিঁড়লেও আবার তার বেঁধে তুলতে হবে। আমি ভিয়েৎনামে গিয়েছি এবং আজকে সাংঘাতিক দুর্বৃত্তরা যে-ভাবে কাম্বোডিয়াকে ডেমোক্রাসির নামে চূর্ণবিচূর্ণ করছে তার অনেক খবরই আমরা জানি। এই বর্বরতার বিরুদ্ধে এদেশে শিল্পী, কবি, শিক্ষক, কর্মী, গৃহস্থী যে-ভাবে কথায় কাব্যে এবং পদযাত্রায় সাড়া দিয়েছেন তা আমার কাছে সাহিত্যের মূল্যেও অমূল্য। মনুষ্যত্বের এই প্রকাশ শিল্পকে সমৃদ্ধতর করে তুলবে। স্থির বিশ্বাসে জানি যেমন এদেশে, তেমনি বিশেষ অর্থে আমার স্বদেশে, আমার বাংলায়, সাহিত্যের ধৃতিশক্তি নষ্ট হবে না। লক্ষ্য রাখতে হবে তরঙ্গের পারে তীরের দিকে, তরঙ্গের তলে গভীর সমুদ্রের প্রতি। সাহিত্যের অভিযানে একটি চরম লগ্ন উপস্থিত।

পুনশ্চ: ঠিক জবাব দেওয়া হল না কিন্তু চিঠির সূত্রে আপনাদের গভীর অনুসন্ধানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

ন্যু-পলজ, ১২ই জুন ১৯৭০

কবিতা-পরিচয়, দ্বাদশ সংকলন, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৭

শেষ জীবনের নতুন ছড়া

এটাই হয়তো আমার ছড়ার শেষ খাতা। ঝোঁকের মাথায় ছড়া লেখা শুরু সেই কবে শান্তিনিকেতনে ছাত্রাবস্থায়। বয়স বাড়ছে, ছড়ার সংখ্যাও বাড়ছে। এবার থামা দরকার। যাঁরা এতদিন আমার ছড়া পড়ে আমাকে উৎসাহিত করেছেন, তাঁদের সকলকে আমার নমস্কার।

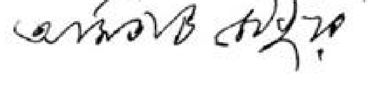

১

এবার গ্রীষ্মের বন্ধে,
মন্দোক্রান্তা ছন্দে
লিখব আমি ছড়া,
মিঠে এবং কড়া
উঠবো বাঘার স্কন্ধে।

২

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়াম
আমি একটা কিনে নিলাম।
যে-ই না দিলাম আঙুল চাপা,
বেরিয়ে গেল সা রে গা মা পা।

৩

হাতে নিয়ে লম্ফ
বাজাচ্ছি জগঝম্প—
আমি ভাবি ভূমিকম্প।

৪

দ্রুতগতি
প্রজাপতি—
ভদ্র অতি,
লহ প্রণতি।
সর্বজনে
প্রতিক্ষণে
একটু হেসে
ভালোবেসে
যাওরে উড়ে
একটু দূরে—
নাই রে ক্ষতি
প্রজাপতি

৫

জামাটা কি সুরঙ্গী—
এসেছি চৌরঙ্গী।
সঙ্গে আছে কে?
—নন্দী ও ভৃঙ্গী।

৬

মার্কসীয় শাস্ত্র,
জানেন ফিদেল কাস্ত্রো।
থাকেন তিনি হাভানা
ইচ্ছে আছে যাবার সেথা
সঙ্গে আজমি শাবানা।

৭

কে নিবি ভাই, কে নিবি—
ইস্কাপনের এই বিবি?
নিলেই কিন্তু কাৎ—
হারবি অকস্মাৎ।
খেলার সঙ্গে ঠেলা—
খেলার হয়নি মাৎ।

৮

লেজে লেজে ফুল—
ওয়ান্ডারফুল।
করি ছুঁই ছুঁই—
কোথা যাই মুই।
দিয়ে হামাগুড়ি
যাই জলপাইগুড়ি।
কোথা তারপরে—
ফিরে আসি ঘরে।
খেয়ে চিঁড়ে-মুড়ি
যাই ময়নাগুড়ি।
যাই অবশেষে,
আসামের দেশে—
শহরটা ধুবুড়ি।

৯

আপনিই কি মিস্টার টমাস—
না না, আমি হিপোপটেমাস।
ও আচ্ছা, আপনিই করেন মন্ত্রী
আপনি হচ্ছেন জলহস্তি
জলে পড়ে ধপ ধপ ধপাস।

১০

নিবেদন সবিনয়—
ছেড়ে দাও অভিনয়,
বেশভূষণ ছেড়ে দাও
রং তার কেড়ে নাও—
অভিনয় হবি নয়

১১

অনেকটা পথ হেঁটে
দণ্ডী কেটে কেটে
এলাম তারকেশ্বর।
'দাও বাবা দাও বর'
—চুলটা দেবো ছেঁটে।

১২

লম্বা-গলা জিরাফ—
খেতেন কাশির সিরাপ।
খেতে খেতে খেতে—
যায় আসামের তিরাপ
জংলি জায়গা— কী Rough!

১৩

এই যে ছোট্ট জেব্রা—
পড় তো আলজেব্রা।
রংটা দিলাম মুছে,
চেহারা যায় ঘুচে—
বেরোয় আস্ত গাধা—
সা রে গা মা পা ধা।

১৪

বললাম গর্জিয়া—
ছেড়ে যাও জর্জিয়া,
হয়ে নতমস্তক—
যাও ব্লাডিভস্তক।

১৫

বাড়ি কোথায়?— ডিব্রু,
জানেন কিছু— হিবরু
খাচ্ছেন কেন— ছিবড়ু!

মুল পাণ্ডুলিপির কয়েক পাতা

১৬

রাজ্য ছিল কুর্গ,
সুন্দরীদের দুর্গ—
সেইখানে রোজ ভাজা হয়
রোজ এক শ মুর্গ।

১৭

বর্তুলাকার পর্তুগাল
জিব্রাল্টারে ছিলাম কাল
আজকে নয় হে, গতকাল।
খাবো সেথায় মুগের ডাল
ভাত থাকবে এক থাল।

১৮

নাচতে নাচতে ডিসকো—
এলাম সান ফ্রান্সিসকো,
রোদ্দুরে সব পুড়ছে—
আমার মাথা ঘুরছে
হয় আশ্চর্যি না কিসকো?

১৯

এক লম্ফ দিয়া—
গেলাম মঙ্গোলিয়া।
পড়ে গণ্ডাকিয়া—
এলাম স্লোভাকিয়া।
শিল্পে সমঝদার—
দেশটা বটে চমৎকার।

২০

কখন হয় পুনাখা,
কখন হয় পারো,
রাজধানীর ঠিক নেই—
ভুটানের কথা ছাড়ো।
দু'একটা নতুন শহর
গড়তে যদি পারো
রাজধানী রয় পারো।

২১

আসেন,
এই মমিটা তুতেনখামেন—
দাসের অঙ্ক শুনে
বাক্সর মধ্যে ঘামেন।

২২

মনিপুরের রাজার
নামে এই বাজার
টাকা হাজার হাজার
ঝরছে গলে গলে,
কিরি নদীর জলে—
ঝুলন-পুলের তলে।

২৩

সুন্দরবনের অন্দরমহল—
জঙ্গলে রোজ দিনই টহল,
খাচ্ছি কচি ডাব
বাঘের সঙ্গে ভাব—
একটুকু চাই অ্যালকোহল।

২৪

কী যেন পাখির নাম? —ছাতারে
ওরা এলো কাতারে কাতারে।
কোথায় পালাই
কোন দিকে যাই—
চিন্তায় চিন্তায় ধরে গেছে মাথা রে।

২৫

গন্ধ তো বোঁটকা—
এ কিসের টোটকা,
তেল হলে চুলে মাখেন
রং হলে ছবি আঁকেন—
বলেছেন ছোটকা।

২৬

দিনে বহু কাজ, রাত্রে তারা গোনা—
তিনি মিস্টার টারাগোনা
মেজাজটা তাঁর সাহেবী ধাতের—
ঠাকুরদাদা রবীন্দ্রনাথের।

২৭

এ পাখির নাম বুলবুলি—
ডালের ওপর ঝুলঝুলি,
ভবিষৎটা গড়তে
পাঠিয়ে দেবো পড়তে
তৈরি হচ্ছে স্কুলগুলি—
শিক্ষিত হোক বুলবুলি

২৮

ওহে পাশা খেলুড়ে—
চলে যাও বেলুড়ে,
নয়তো বা দমদম
ভাত খেয়ে কমকম—
পা-পা হাঁটি হাঁটি
পৌঁছবে নৈহাটি
সেইখানে বয় নদী
চলে যেতে চাও যদি
নদী পারে ব্যান্ডেল—
পায়ে দিয়ে স্যান্ডেল
তারপরে বর্ধমান
করো তুমি অবধান—
ভালো আছে খাদ্যযোগ,
মিহিদানা রাজভোগ
খেয়ে দেয়ে মুখটি চুপ—
ধরো এবার লাইন লুপ—
হয়ে খানা, বোলপুর—
ছিলেন সেথা রবিঠাকুর।

২৯

খেয়ে গাঁজা-ভাং
আমি চিৎপটাং—
উঠে দিলাম লাফ—
আরে, বাপরে, বাপ—
ভাঙলো হাঁড়ি ঘটাং।

৩০

শত কাহিনির আড়ত
বাংলায় মহাভারত।
লেখক কাশীরাম
বর্ধমানেতে আবাস।

৩১

শত্রু কে, বন্ধু কে
জানতে চাওয়া কোন দুখে।
জানো তো তাই আমার স্বভাব
গুলি ও গালির নেই অভাব
জবাব দেবো বন্দুকে।

৩২

কাঁদো-কাঁদো মুখ
ছলো ছলো আঁখি
কী হয়েছে বলো তো তুমি,
কথাটা কোথায় রাখি?
ইচ্ছে আছে কিছুদিন
কার্মাটান গিয়ে থাকি।

৩৩

দিন নেই, রাত নেই—
রাত্তিরে ভাত নেই,
খান শুধু রুটি—
একটি কি দু'টি।
রুটি খেলে ঘুম নেই
আন্ধার সামনেই—
বিছানায় ছটফট
রাতে আর রুটি নট।

৩৪

সারা দুপুর
বাজছে নূপুর—
— ছড়ার
টাপুর টুপুর
বৃষ্টি উপুড়
— ধরার।

৩৫

জল খেতে চায়,— তাপিত
দাড়ি কেটে দাও— নাপিত
বাড়তি বয়স উদ্‌যাপিত।

বেলাল চৌধুরীর দু'টি কবিতা

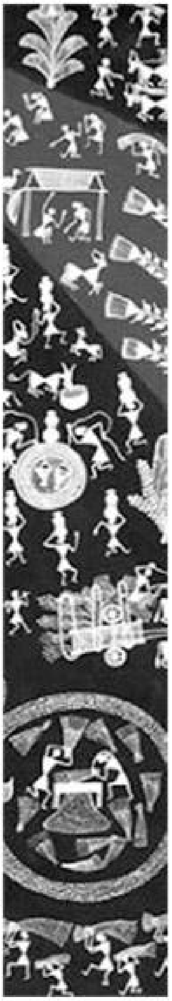

সু রে শ্ব র থে কে ফে রা

বেলা যত বাড়ে দীর্ঘতর হয় ছায়া,
নীচে নদীপথে গড়ায় অনন্ত কালের নিবিড়তা :
কুয়াশা কাটা নির্মেঘ আকাশে চলে রুপোর চাকতি খেলা
নিরন্তর সারাবেলা-মেলা শেষে ফিরছে মানুষ
চারিদিকে খোলামেলা প্রান্তরের অবারিত হাওয়া
দূরে আলিজালি মানুষের ঘরবাড়ি, নদীর জীবন
ভাঙা আর গড়ার জীবন, এক পাশে সর্ষেখেত,
নাবাল জমিতে হিল্লোলিত সবুজ ঝাপটা
কল্লোলিত জীবন তরঙ্গে ভাসমান পাখিদের ঝাঁক
কোন দিকে বাঁক নেবে কে জানে তাদের নজর কোথায়
অদূরে বিস্তৃত সোনারং চিকচিকে বালিয়াড়ি
সুনীল আকাশে বৃত্তাকারে উড়ছে চিলেরা
পিছনে ধূ ধূ তটরেখা, আবছা গাছগাছালি,
সামনে সবুজ ঢেউ কখনও গাঢ় কখনও হালকা তুলির টানে
সে এক মনোরম মন-কেমন-করা দৃশ্য ছবি, চার চারটি মোহানা এসে মিশেছে
নদীর দু'কুল জুড়ে জেলেদের জাল, জালের আঁচল
শোলার ফাৎনা ভাসে ডোবে একরৈখিক দড়ির টানে
কাছে দূরে ভাসমান নৌকার সংসার, ছিপছিপে জেলেডিঙি
কখনও সারিবদ্ধ, কখনও ইতস্তত ছড়ানো ছিটানো
কতরকম রংবেরঙের পালের পতপত
মাঝির কেউ কেউ হুঁকো হাতে তামাক সেবনে মগ্ন
কেউ টানছে গুণ তীর ঘেঁষে, বৌঝিরা কলসি কাঁখে
চলেছে স্নানের ঘাটে-তাদের ঘিরে উলঙ্গ শিশুর দল
এরই মাঝে তরতর করে নিস্তরঙ্গ নদীর জল কেটে
সাঁই সাঁই চলেছে খোলামেলা স্পিডবোট
জলের ঝাপটা এসে লাগছে চোখেমুখে
সবটাই জলরং ছবির মতন সপ্রাণ হয়ে ওঠে নিমেষে;
জীবন-শিল্পী সহযাত্রী বন্ধু নিবিষ্ট মনে পড়ে চলেছেন
আরেক জীবন-প্রেমী শিল্পী কামরুল হাসান-এর ওপর লেখা কোনও সন্দর্ভ
হয়তোবা ভেতরে ভেতরে এঁকে চলেছেন লোকগীতি গায়ক 'তৈয়ব আলীর খোঁজে'র খসড়া
আসলে দু'জনই আমরা গা ভাসিয়েছিলাম নিরুদ্দেশ হাওয়ায়
কালের ভেলায় ছুটেছে মানুষ কিসের সন্ধানে কোন অরূপ রতন আঁকা
মানুষের মহামিলন তীর্থ যাত্রায়, যেখানে আউল বাউল,

পুণ্যার্থী সব মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়
আশাদণ্ড নিয়ে ঘোর লাগা মানুষের সে কী তুমুল বিশাল মাতন
দেখে বিহ্বল হয়েছি আমরা, ভুলে গেছি সব চপলতা
সাদা দুধের ধারাস্নানে আপ্লুত হয়েছে সমবেত ভক্তবৃন্দ বিশ্বাসী অবিশ্বাসী
অথচ ঐ কলরব মুখর মানুষের কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই কোনও দিকে
এখন এই মুহূর্তে সে-সব পিছনে ফেলে ফিরে চলেছি যে যার
নিজ নিজ গৃহপানে কোটরবাসী কাঠঠোকরা মানুষ আমরা
গভীর অশান্ত হৃদয়ে চলছে তোলপাড়
মনের মধ্যে কেবল অস্ফুট গুঞ্জন, ফেলে আসা তীর
ছেড়ে বাঁক নিয়েছি দিকচক্রবালের দিকে,—
কতকাল ধরে চলেছে পরিব্রাজক মানুষের
মানবিক অভিজ্ঞানে সমৃদ্ধ এই চিরন্তন অভিযাত্রা।

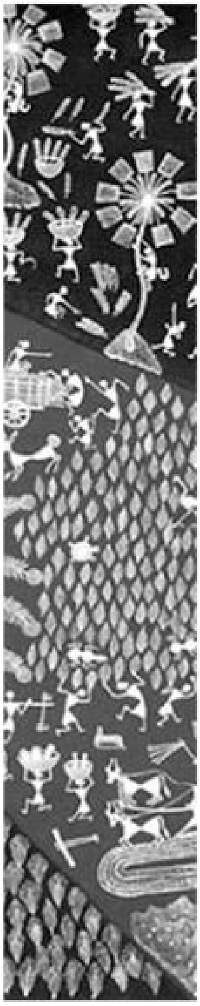

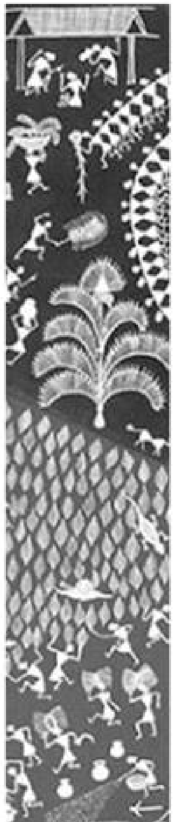

ল জ্জা ব তী

দাদুর বয়সী বলেই হয়তো, গাছটাকে দেখলেই
নানা রকম রঙ্গরসিকতা চাড়া দিয়ে ওঠে মাথায়
শুধোই— ও গাছ বল না কত গো হল তোমার বয়স?
বুড়ো মাথাটাকে ঝাঁকি মেরে বলে হেসে গাছ-মহ

তার আগে দেখি তোর আক্কেল আন্দাজ কতটা:
যাচাই করে তুই-ই বল দেখি কত চাঁদে হয় এক যুগ?
—ওমা একী তুমি না নির্বাক, বদ্ধ কালা,
অনড় পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা খালি

—কে বলল শুনি, আমি বোবা-হাবা-কালা,
এই যে দেখছিস না নিরন্তরই তো বকবক করে যাচ্ছি অনর্গল
কখনও শনশন, কখনও সরসর, কখনও শোঁ শোঁ মর্মর ধ্বনিতে
শুনতে পাস না বুঝি সে-সব কিছু!

তুই তো দেখছি হাবা-কালা-বোকারও অধম,
কি আশ্চর্য তোদের দেশেরই তো এক ছেলে বলে গেছে:
আমাদেরও আছে প্রাণ, আছে সুখ আছে দুঃখ
আছে ব্যথা, আছে হর্ষ প্রাণ শক্তিতে টইটুম্বুর

দ্যাখ চেয়ে তোর পায়ের ঐ পাশে এক কোণে
কেমন অধোবদনে পড়ে আছে ঐ যে লাজুক লতাটি
শুধিয়ে দ্যাখ না একবার
লজ্জায় কেমন কুঁকড়ে আসবে তৎক্ষণাৎ

আয় না ইদিকে, না অঞ্জলি পেতে
তোদের করকমলে তুলে দিচ্ছি
যৎসামান্য আমার বিনীত উপহার
আরে লজ্জার কি আছে, আহা ওর নামই যে লজ্জাবতী লতা।

ক বি তা র পা তা

রণজিৎ দাশের স্বনির্বাচিত সাতটি কবিতা

আ ন্ত র্জা তি ক

ইংলণ্ড থেকে আমাকে উপহার দেওয়া হল
একখণ্ড অলিখিত সংবিধান

ফ্রান্স থেকে আমাকে উপহার দেওয়া হল
এক বোতল শ্যাম্পেন,
সঙ্গে নোট, 'পান করুন, এবং নিকটবর্তী
অ্যাবস্ট্রাকশনকে আলিঙ্গন করুন'

জাপান থেকে আমাকে উপহার দেওয়া হল
একটি ছোট্ট রোবট—
যেটি মানুষের দুঃখে দুমিনিট বিষণ্ণ হতে জানে

পশ্চিম জার্মানি থেকে আমাকে
উপহার দেওয়া হল একটি হাতঘড়ি
যেটি শুধুই প্রতিযোগিতার সময় নির্দেশ করে

আমেরিকা থেকে আমাকে উপহার দেওয়া হল
একটি অত্যাধুনিক রিভলবার,
যা তৈরি হয় 'প্রেসিডেন্টকে হত্যা করার জন্য', কিন্তু
যা দিয়ে তার মালিক শেষ পর্যন্ত
নিজেই আত্মহত্যা করে

এ সব উপহার আমি একটি লতাপাতা-আঁকা
টিনের সুটকেশে ভরে নিয়ে
রওনা হলাম আমার মামাবাড়ির গ্রামের দিকে
জল-কাদার মধ্য দিয়ে একা একা
পাঁচ ক্রোশ পথ হেঁটে যাওয়াই আমার উদ্দেশ্য ছিল

ই চ্ছা

রাত্রিদিন চুমু খাবো, বুকে জাপটে, মুখ থেকে মুখে
ভরে দেবো অক্সিজেন, মধু, মদ, সিংহীর কামনা
তোমাকে কিছুতে আমি বৃদ্ধা হতে কখনও দেবো না

জরা ও মৃত্যুর দিকে কুকুর লেলিয়ে দেবো
প্রতিদিন একটি নীল প্রেমচিঠি পাঠাবো তোমাকে
(অশ্বগন্ধা-টন্ধা নয়, প্রেমচিঠি যৌবনবর্ধক!)
শিলাজতু, স্বর্ণভস্ম, হরমোন থেরাপি—
যা কিছু জ্ঞানত জানি, এনে দেবো কায়কল্পে, স্বপ্নে, নিশিডাকে

রাত্রিদিন চুমু খাবো, বুকে জাপটে, মুখ থেকে মুখে
ভরে দেবো অক্সিজেন, মধু, মদ, সিংহীর কামনা
আমার কঙ্কালটিকে দুহাতে জড়িয়ে রেখে,
তুমি থাকবে অনন্ত- যৌবনা!

আ লি ঙ্গ ন

সঙ্গম কে চায়, বলো? শুধু একটি অন্ধ আলিঙ্গন
চাই আমি— জলমগ্ন, ব্যাকুল দু'হাতে
লাইফ-বেল্ট আঁকড়ে ধরে যেভাবে মানুষ ভাসে,
সেভাবে দু'জনে
দু'জনকে আঁকড়ে ধরে, অকূল সমুদ্রে
ঢেউয়ের দোলায় দুলি— নিস্তব্ধ, নির্জন!

জীবন সঙ্গমক্লান্ত। দিতে পারো, এই আলিঙ্গন?

স ন্ধ্যা র পা গ ল

যেভাবে ফুটপাতে বসে মাথা নাড়ে সন্ধ্যার পাগল
আর বিড়বিড় করে কথা বলে রাক্ষস ও ডাইনিদের সঙ্গে—
সেভাবেই দিন কাটে আমার। আমি ব্রিফকেস হাতে
অফিস থেকে ফেরার পথে আচমকা ভয় পাই আজ
দেখি, ঐ পাগলের এক-একটি মাথা ঝাঁকুনিতে
কেটে যাচ্ছে আমার এক-একটি দিন
দেখি, ঐ পাগলের এক-একটি মাথা-ঝাঁকুনিতে
কেটে যাচ্ছে আমার এক-একটি জীবন—
দেখি, ঐ পাগলের মাথায় লেগে
গির্জার মাঠের গোলপোস্টে ঢুকে যাচ্ছে পূর্ণিমার চাঁদ

আমি ব্রিফকেস ছুঁড়ে ফেলে, ডাস্টবিনের কুকুরগুলোর পাশে
হাঁটু গেড়ে বসি, আর
ঐ ঝাঁকড়া-চুলো পাগলের দুলতে-থাকা মাথা প্রাণপণে বুকে চেপে ধরি

কয়েকটা মুহূর্ত শুধু এইভাবে
প্রগাঢ় শান্তির মধ্যে বেঁচে থাকি, তারপর মরি

ক্ষ ত

মহান শিল্পীদের জীবনীতে প্রায়ই পড়ি তাঁদের অকল্পনীয় নিষ্ঠুরতার কথা। পড়ি, এবং ভীষণ বিভ্রান্তবোধ করি। ভাবি যে, যে-মানুষ ব্যক্তিগত জীবনে এতটা হৃদয়হীন এবং নির্মম, তাঁর শিল্পের আদৌ কী মূল্য আমি দেব? যতই মহৎ হোক সেই শিল্পকীর্তি, তবু আমি তার কানাকড়ি মূল্যও দেব কি? পণ্ডিতেরা বলেন, ভুল, এই বিচার ভুল। শিল্পীও একজন মানুষ, আর সব মানুষের মতো তার ভিতরেও রয়েছে একইসঙ্গে সাধু এবং শয়তান। এবং নিজের ভিতরে এই সাধু-শয়তানের দ্বন্দ্ব থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে তার শিল্প। সুতরাং, শিল্পীর ব্যক্তিজীবন দিয়ে তার শিল্পের বিচার এক মারাত্মক ভুল। পণ্ডিতেরা সর্বদাই এত ঠিক কথা বলেন! এত খাঁটি সত্য কথা! এবং সব সত্যই কি অদ্ভুত নির্মম! কোমলতার পক্ষে কি কোনও সত্য নেই? না, কোমলতার পক্ষে কোনও সত্য নেই, শুধু বেদনা রয়েছে। সেই বেদনার কাছে আমি আজীবন গুম হয়ে থাকি। দেখি যে, আমার মনে গোঁজ হয়ে আছে একটিই কঠিন কথা। কথাটা এই যে, শিল্পী হবার তাড়নায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্বামী-স্ত্রীতে মিলে সংসার ভেঙে দিয়ে, এবং নিজেদের সদ্যোজাত শিশুকন্যাকে তার গ্রামের মামাবাড়িতে ফেলে রেখে, প্যারিসে এসে রদ্যাঁর শিষ্য বনে যাওয়ার জন্যে রিলকে-র সমস্ত কবিতা আমার কাছে অস্পৃশ্য মনে হয়; অসুস্থ সঙ্গিনী ফ্রাঁসোয়া জিলো-র গালে জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকা দেওয়ার জন্যে পিকাসো-র সব ছবি আমি পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে দিতে পারি। জীবনের অপরাধ ঢাকতে শিল্পের সাফাই হয় না। সেই অপরাধ, সেই আঘাত আরেকটি নীরব প্রাণে যে ক্ষত সৃষ্টি করে, শিল্পীর আজীবনের সকল শিল্পকর্ম দিয়েও সেই ক্ষতটির ক্ষমা হয় না, শুশ্রূষা হয় না। সমস্ত শিল্পের চেয়ে সেই ক্ষতটি বড়।

সমস্ত শিল্পের বিরুদ্ধে, সেই ক্ষতটিই ঈশ্বরের বিষণ্ণ কবিতা...

জ ঙ্গ ল - ক বি তা

বৃক্ষে, বীজে, ঘুঘু-ডাকে, হরিণ-কটাক্ষে ভরা এই শালবন
ঈশ্বর-রচিত এক জঙ্গল-কবিতা।
লতাঝোপ নড়ে উঠলে মনে হয়, সমুদ্যত চিতা
এ-বন পাহারা দেয়, হিংস্র কবির পোষা বাঘের মতন!

আমি জিপ থেকে নেমে, পায়ে হেঁটে, বৃক্ষের অক্ষর ছুঁয়ে ছুঁয়ে
এ-কবিতা পড়ি। দেখি, উর্ধ্ব-কমার মতো, সেগুন-মঞ্জরি
পাতার মর্মরশব্দে গাঁথা, যেন ছন্দের প্রহরী।
তবুও গাছের গুঁড়ি বেয়ে-ওঠা ময়ালের ভারে
পাতা ও পাখির ডিম কাঁপে, ছন্দ ভাঙে বারে বারে।
এই শালবনে দেখি, যে-কোনও স্রষ্টার
অন্তিম দুঃস্বপ্ন— এক ইতর বানর
ব্রহ্মাণ্ডের লোম থেকে কেবলই উকুন বেছে খায়
দেখি, এই বন শুধু মৃত মহিষের লাশে কৃমিদের কামনা জাগায়
(কোন কফি-ঘরে বসে এই কবিতার কবি মুখ ঢাকে ক্রোধে,
ব্যর্থতায়?)

আমি বৃক্ষ-পঙ্‌ক্তিদের মধ্যবর্তী শুঁড়িপথে ঢুকে,
অদ্ভুত টিয়ার ঝাঁক পার হয়ে, উপগত শজারুর মুখে
ব্যথার আনন্দ, আর ফুলে ফুলে প্রজাপতি উড়ে
মধুপানরত দেখে, মার্জিনে নদীর পাড়ে ঘুরে
নিশ্চিত বুঝতে পারি, কবি হিসেবে ভগবান
এখনও তরুণ, কাঁচা, ইন্দ্রিয়-তাড়িত, কিন্তু প্রতিশ্রুতিবান

ল্যা প ট প

ধানখেতের ল্যাপটপে মাটির সঙ্গে
চ্যাট করছে বৃষ্টির ফোঁটা—
কেমন আছিস, মাটি? শ্রাবণের সঙ্গে তোর বিয়ে
হল, খবরই দিলি না? ছিলাম না হয় টরোন্টোতে,
তা বলে কি আউশগ্রামের আলপথে কুলো মাথায় নিয়ে
তোর বিয়েতে উলু দিতাম না?
ভেরি ব্যাড, মাটি, তুই ছোটবেলার বুজুম ফ্রেন্ডকে
উড়ন্ত প্লেন-এর মতো এমন সহজে ভুলে গেলি?
তুই তো জানিস, আমার মেঘনাদের সঙ্গে লিভ-টুগেদার—
হি ইজ সো কুল, কিন্তু, মাঝে-মধ্যে মনটা হাহাকার
করে ওঠে নক্ষত্রদের নাইট-ক্লাব 'স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার'-এ—
কী চাই জীবনে আমরা? তুই কি জানিস, মাটি,
কাদা-জলে, অংকুরের ঘ্রাণে?
(আমরা টরোন্টোতে আছি, আমাদের সন্তানকে চাইল্ড-ওয়েলফেয়ার পুলিশ
নিয়ে গেছে, স্নেহের সন্ধানে।
এরপর কী আর থাকে জন্ম আর জীবনের মানে?)
যাই হোক, ভালো থাকিস, শ্রাবণের নববধূ,
অঘ্রাণের প্রাউড মাদার—
তোর গর্ভাধান মানে তোর গর্ভে ধান!
মাই বেস্ট উইশেস,
আউশগ্রামের খেতে বেজে উঠুক নবান্নের গান

ঋত্বিক ত্রিপাঠীর দীর্ঘ কবিতা

ব্য ক্তি গ ত প্রে ম প্র স ঙ্গ

তুমি যেমন এলে, সম্ভাবনাময়। অথচ
কোনওদিন যদি সে সম্ভাবনা-রহিত
তবে উড়িয়ে দিই ওই পারে সব কথা

কড়া শাসনের সেই স্কুল হোস্টেল। যেখানে গত তিনমাস কোনও মেয়ের জ্যান্ত ছবি দেখিনি। যেহেতু হঠাৎ হঠাৎ বাড়ি যাওয়া বারণ। যেহেতু স্কুলটি মেয়ে বর্জিত। যেহেতু ভৌগোলিকগত কারণে এলাকায় জনবসতি কম। যেহেতু স্কুল গেটের বাইরে যাওয়া বারণ।

আমি যে অসহায় অপেক্ষাকৃত
প্রকাশঅক্ষম গুমরে মরি। তোমার কথা শুনে
বুঝতে পারি শব্দ জন্মান্তর, বুঝতে পারি
আমি-তুমি আছি আর অন্যরা তো অন্য
অন্য পথের খেলা...

ওই বন্দি কিশোরবেলায় যেটুকু জানালা তা শনিবারের বিকেল থেকে রবিবারের রাত্রি। এটুকুই বা কম কোথায়। কৈশোর গড়িয়ে চলেছে যৌবনে। পুরনো 'দেশ' পত্রিকার বিজ্ঞাপনে দাঁড়িয়ে যায় চোখ। জন্মনিরোধক বিজ্ঞাপন। 'চাঁদমামা'র রানির শাড়িতে, বক্ষস্তূপে...

মধ্যেকার দূরত্ব, যত মগ্নতা সে কতক্ষণ।
ভাবছি আর কটা দিন তারপর তো
আত্ম-উন্মোচন
পথ থেকে পথ জন্ম সারাক্ষণ...
কখনও বা অধিক চাহিদায় কৃত্রিম কিছু
আর ভয়, আর আনন্দ, আর ভয়...

আনন্দবাজার পত্রিকা'র পাত্র পাত্রীর বিজ্ঞাপন দেখি। গোল দাগ দিই। পনেরো পয়সার পোস্টকার্ডে

ঠিকানা টুকি। পাত্র নয়, পাত্রের বাবা সেজে মেয়ের বাবাকে লিখি: সত্বর মেয়ের ছবি পাঠান। আমার ছেলের জন্য আপনার মেয়েকেই আমার একমাত্র পছন্দ। আমি বিভিন্ন কাজে বাইরে থাকি। আমার বন্ধুর ঠিকানায় ছবি পাঠাবেন। ঠিকানা: সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বনমালীচট্টা হাইস্কুল হোস্টেল, মেদিনীপুর। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় কে! কেউ না। সন্ধেতে প্রার্থনাসভাতে নাম ডেকে ডেকে চিঠি বিলি হত। ওই নামে চিঠির মালিক নেই। দু-চারদিন বাদে অ্যাটেনডেন্স খাতা থেকে ওই চিঠি সরাতে পারলে কেল্লা ফতে। আগামী দু-তিনদিন সমস্ত অঙ্কের উত্তর ভুল। রাজ্যজয়ের আনন্দ। বইপোকা বন্ধুটিও গুরুত্ব দিচ্ছে আমাকে। বোধহয় তারও একবার দেখতে ইচ্ছে করছে ওকে। মানে খামে আসা ছবিকে।

দিন শেষে হয়তো বা হঠাৎ কোনওদিন দেখব
অজানা কেউ বসে আছে
আর সে আমাকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়াবে
শরীর বাঁকিয়ে আমার কানে বলবে:
আজ এক দারুণ খবর আছে।

আগামীকাল হোস্টেলের মাছ কিনে আনার দায়িত্ব। সৌরভের প্রস্তাব: প্রতি কেজিতে ২ টাকা বাড়িয়ে আনন্দলোক কেনার। আনন্দলোক কেন? কারণ তখন মাধ্যমিক পার হয়েছি। ইচ্ছে হচ্ছে বারবার মল্লিকা সিনেমায় গিয়ে বসি। ইচ্ছে হচ্ছে বিশাল হোর্ডিংয়ের ওকে চোখ মারি। স্কুলের উদ্যোগে উত্তরপ্রদেশ ভ্রমণ। বন্ধুকে বলি: ছবি তোল, সঙ্গে যেন ওই মেয়েটি আসে। যদি ওর বাবা মা-র ছবিও আসে তাতেও খুব আপত্তি নেই। দূরত্ব বজায় রেখে ক্যামেরার দিকে আমি আর ও সমান্তরাল হাঁটি। ও মানে সে। সে মানে স্মৃতি। হালকা ছায়া, ছবি। সীমাহীন আনন্দপ্রাপ্তি, আশ্চর্য মায়া ও পিছুটান।

ঘুমঘোর অথচ জেগে আছি সারাবেলা
এ কেমন সময়! বৃষ্টিতে ভিজছে শরীর
হাওয়াতে মিশেছে ধুলো হয়ে বালি হয়ে
উড়েছে নিরাসক্ত

খুব একা লাগে। অনার্সের প্রথম বর্ষ। গ্রামের কলেজে শেষ রোল নম্বরটি আমার। প্রথম চার মাস ক্লাস করা হয়নি। কলকাতায় দু'টি কলেজে বাজে সময় নষ্ট করে দেরিতে ভর্তি হয়েছি যে। কলকাতা থেকে রেশমি আমাকে চিঠি লেখে প্রায়ই। অথচ মুখ মনে নেই তার। মনে হচ্ছে এসব পাপ। অথচ বন্ধুহীন এ পৃথিবীতে বাঁচতে ইচ্ছে হচ্ছে না এক মুহূর্তও। ইচ্ছে হচ্ছে বারবার পাপ-ঘরে দৌড়ে যাই। আত্মহত্যাও করতে ইচ্ছে করছে।

মাটি হয়ে যাই মাটির মতো
সম্বিৎ হোক কথকতা
সব পাপ সব ঘৃণায়
জল নাম দিই জল
একান্ত গোপন অথচ ভীষণ প্রাণ
মৃত্যু মিশে যাই ভিড়ে আমৃত্যু
ভীষণ প্রাণের অথচ একান্ত গোপন
হাওয়া নাম দিই হাওয়া...

তা মরে যাওয়ার আগে অন্তত একবার আলোকিত করে তুলি আমার একান্ত বারান্দাকে। বলেই ফেলি আমার দুর্বলতাগুলোকে। মায়ার শরীরকে জানাল সে: 'ভালো থেকো।' আমি না হয় একাই থাকি। হিসেব নিকেশের বাইরে সে! বসন্তের হাওয়া এখনও কি ভেজায়নি ওর রাতের পোশাককে! যে ব্যাখ্যাই হোক না কেন, নিজেকে বললাম— মায়ের মৃত্যুশোক ভোলা যায়, অপমান নয়...। কোনও এক দার্শনিকের কথা। অবশ্য এরপর গোপন কোনও গল্প ছিল।

— তারপর আমি ঘুরে দাঁড়ালাম
— আমি ফিরে তাকিয়েছিলাম
— দূরত্ব গড়েছিল, দৃষ্টি ছিল না
— দূরত্ব নয়, কুয়াশা, মেঘও ছিল আকাশে
— বুঝেছিলে তো— বৃষ্টি নামলে না কেন!
— আমার বজ্র আমার ছিল না যে!

সেই বজ্রের খোঁজে অনেক আকাশ পার হয়েছি। শেষে ঝড়ের পাখিকে শুনিয়েছি আত্মকথা। অমীমাংসিত কথারা সব প্রণত বিশ্বাস। আগুনের আগুন, এক নিঃশ্বাসে বলে দেব আজ। আসলে এতদিনে শব্দের মধ্যে তাকে ধরতে পেরেছি। সুতরাং আমার সংসারে অভাব বলতে কিছু নেই। দু'বেলা দু'মুঠো জোটে। রান্নাপাতি খেলে আমি ও আমার কবিতা শুতে যাই।

আগুন মিশেছে যেখানে আগুন হয়ে
বাতাসে বাতাস, নিঃস্ব যার নাম
যেখানে সর্বশূন্য অন্ধকার
সেখানে জন্মান্তরবাদ আমার

আজ বিজ্ঞাপনের মেয়েদের আমি দেখি। তবে তারা আমার কবিতার চেয়ে বুদ্ধিমান নয়। শব্দে, ছন্দে, বর্ণে, গন্ধে, আর্তিতে, অভিমানে, রাগে, ভোগে, যোগে, রোগে, ঘুমে, জেগে, নিয়মে, অনিয়মে, দৌড়ে, পালিয়ে, লুকিয়ে, জাগিয়ে, ঘুম পাড়িয়ে, সেই কবিতার মেয়েরা আমাকে একবার ডোবাচ্ছে, একবার ভাসাচ্ছে। আমি চমকিত হচ্ছি প্রতি সকালবেলা। রক্তে, শিরায়, পাপে, আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠছি। একদৃষ্টিতে তৃষ্ণার্ত তাকিয়ে রয়েছি তার দিকে। সে আমাকে বলছে ভালো থাকো, মন্দ থাকো। অস্তিত্বে থাকো। যন্ত্রণায় থাকো। যা খুশি হোক। তবু থাকো নিজের মধ্যে। কবিতার মধ্যে।...

কলকাতার নানা স্ট্রিট, লেন বা বাই-লেন। জব চার্নক এ-শহরের পত্তন গড়ার ডাক দেওয়ার বহু আগে থেকেই একটু একটু গড়ে উঠেছে এই বর্ণময় শহর। এ-শহরের পায়ে-পায়ে ইতিহাস। এই শহর জায়গা করে নিয়েছে বহু কবি ও লেখকের সাহিত্যকর্মে। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে বর্তমান প্রতিবেদক কলকাতা শহরের নানা পল্লি, নানা রাস্তায় ফেলেছেন তাঁর পা-ছাপ। কখনও প্রধান রাস্তায়, কখনও অলিগলিতে ঘুরেছেন কাজে ও অকাজে। ঘুরতে ঘুরতে কখনও আবিষ্কার করেছেন সাহিত্যের নানা অনুষঙ্গ, কখনও পেয়েছেন কোনও কবি বা লেখকের লেখায় সেই সব রাস্তার উল্লেখ। কলকাতার ইতিহাস নিয়ে বহু বই ইতিমধ্যে প্রকাশিত, সেই সব বইয়ের সাহায্য নিয়ে এই কলামে চিত্রিত সাহিত্যের সঙ্গে পুরনো কলকাতার ইতিহাস।

স্ট্রিট লেন বাই-লেন

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

৫

আহিরীটোলা স্ট্রিট

দীপক ও তারাপদ দুই কম্বুকণ্ঠ জেগে রয়....
যে-রকম তারাপদ গান গায় গোটা উপন্যাসে সুর দেয়া
কবিতার লাইন ছুড়ে পাগলা-ঘন্টি বাজিয়ে ঘুরেছে...
নিকষ বৃত্তের থেকে চোখগুলি ঘোরে ও ঘুমায়,
শিয়রে পায়ের কাছে বই-বই-বই
তিন জোড়া লাথির ঘায়ে রবীন্দ্ররচনাবলী লুটোয় পাপোশে।
আরো নীচে, পাপোশের নীচে এক আহিরীটোলায়
বৃষ্টি পড়ে,
রোদ আসে,
বিড়ালীর সঙ্গে গেলে
বেজন্মা বালিকা—

'পাপ ও দুঃখের কথা ছাড়া আর কিছুই থাকে না' কবিতাটি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম দিককার লেখা, তখন কবিতাই তাঁর ধ্যানজ্ঞান, তখন তারাপদ রায়, দীপক মজুমদারের সঙ্গে তাঁর বহু মূল্যবান সময় অতিবাহিত হয়, তাঁদের সঙ্গে এক ঘোর-লাগা দুপুরে বিছানায় শায়িত হয়ে নানা তর্কবিতর্কের পরিণতিতে এই কবিতা।

তখন এই কবিতাটি নিয়ে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল রবীন্দ্ররচনাবলীর এমন অপমানজনক পরিণতিতে। আসলে তখন প্রতিষ্ঠানকে হেয় করাই ছিল তরুণ কবিদের লক্ষ্য, তাতে খুব দ্রুত পাঠকের নজর কাড়া যায়। পরে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থনে জানিয়েছিলেন প্রকৃত ঘটনা হয়েছিল, যে-খাটটিতে তাঁরা শুয়েছিলেন, তার এককোণে রাখা ছিল রবীন্দ্ররচনাবলীর একটি খণ্ড, সেটি কোনও বন্ধু পাশ ফেরার মুহূর্তে পায়ে লেগে পড়ে গিয়েছিল খাট থেকে মেঝেয়।

কিন্তু তার পরের পঙক্তিটি বেশ আশ্চর্য করার। 'আরো নীচে, পাপোশের নীচে এক আহিরীটোলায়/বৃষ্টি পড়ে,...'—এই চিত্রকল্পটির অর্থ অনুধাবন করা বেশ শক্ত। কিন্তু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নিজেই শঙ্খ ঘোষের একটি কবিতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন, 'পাঠককে প্রথমেই জেনে রাখতে হবে, কবিতার কিছু লাইনের মানে থাকে, কিছু লাইনের কোনো মানে থাকে না।' এক্ষেত্রেও পাঠকের মনে হতেই পারে, পাপোশের নীচে সত্যিই তো কোনও আহিরীটোলা থাকতে পারে না, কিন্তু এই চিত্রকল্পটি হঠাৎই কবির মনের কোথাও ছায়া ফেলে অপেক্ষা করছিল, এখানে লিখিত হয়েছে পাঠককে একটু ধন্দে ফেলার জন্য।

কিন্তু আহিরীটোলাই বা কেন! কেন কলকাতার উত্তরপ্রান্তের এক লোকালয় ছায়া ফেলে গিয়েছিল কবিতা লেখার মুহূর্তে! তাঁরা যে-বাড়িতে দুপুর কাটাচ্ছিলেন সেটি কি এই আহিরীটোলার কোনও একটি বাড়ি! আহিরীটোলা বলতেই পাঠকের মনে পড়ে যাবে এই লোকালয়গুলি বহন করছে পুরনো কলকাতার স্মৃতি।

কিন্তু শুধু কি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কেই উসকে গিয়েছে আহিরীটোলা! জীবনানন্দ দাসের সেই বিখ্যাত কবিতা 'ভিখিরি' কবিতাতেও দেখি আহিরীটোলার উল্লেখ ঃ

একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি আহিরীটোলায়,

একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি বাদুড়বাগানে,
একটি পয়সা যদি পাওয়া যায় আরো—

এখানে সেই ভিখিরিটি ঘুরে বেড়াচ্ছে কলকাতার একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ভিক্ষার আশায়।

কিন্তু আহিরীটোলা নামটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে পুরনো কলকাতার এক লোকালয় পাঠককে বিদ্ধ করে নানা ভাবনায়। আমি কলকাতা শহরে পদার্পণের পর থেকে দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দা, তাই উত্তর কলকাতা সম্পর্কে খুব বেশি জেনে উঠতে পারিনি, কিন্তু উত্তর কলকাতার এই প্রাচীন পল্লিগুলির বিষয়ে আমার গভীর কৌতূহল।

চাকরিসূত্রে সিভিল ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টে কিছুকাল থাকার সুবাদে আমাকে কাজের খাতিরে ঘুরে বেড়াতে হত কলকাতার নানা প্রান্তে। সেসময় বেশ কিছুকাল সিভিল ডিফেন্স নর্থ সাবএরিয়ায় থাকাকালীন উত্তর কলকাতার প্রাচীন এলাকাগুলি কখনও পায়ে হেঁটে কখনও জিপে চড়ে ঘুরে বেড়িয়েছি মনের আনন্দে। একটু একটু করে চিনেছি কলকাতার এই প্রাচীন জনপদটি। হঠাৎ একদিন গিয়েছিলাম আহিরীটোলা ঘাটে। গঙ্গা এক-এক ঘাটে এক-একরকম চেহারায় দৃশ্যমান। গঙ্গার শোভা দেখে পায়ে-পায়ে গিয়েছি আহিরীটোলার লোকালয় দর্শনে। অতি প্রাচীন, অথচ এককালে বর্ধিষ্ণু এলাকা বলতে যা বোঝায় আহিরীটোলা ঠিক তাই। প্রধান রাস্তাটির নাম আহিরীটোলা স্ট্রিট। মার্ক উডের মানচিত্রে এই রাস্তার নাম আছে।

'আহির' শব্দের উৎপত্তি সংস্কৃত 'আভীর' শব্দ থেকে। গোদা বাংলায় 'আহিরীটোলা' শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'গোয়ালাপাড়া'। গোয়ালাটুলিও বলেন কেউ কেউ। বিহার থেকে গয়লা সম্প্রদায়ের বহু মানুষ কলকাতায় এসে বাস করত এই অঞ্চলে।

আহিরীটোলা স্ট্রিট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি তখন প্রবেশ করছি দেড়শো-দুশো বছর আগেকার পটভূমিতে। কলকাতা তখন গঙ্গার ধার বরাবর গড়ে উঠেছে তার ঐতিহ্য ও বিত্তের চিহ্ন ছড়িয়ে। কলকাতার বাইরে থেকে বিত্তবান মানুষেরা এসে গড়ে তুলছেন বসবাস। বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করে জাহির করছেন নিজের বিত্ত। কেউবা এই শহরে পত্তন গড়ে সন্ধান করছেন আরও আরও বিত্তের। রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে চৌঘুড়ি, আটঘুড়ি। চল হচ্ছে ফিটনের।

শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেবের অনেক জমি ছিল আহিরীটোলায়। তার কিছু জমি তিনি দান করেন কনৌজের ব্রাহ্মণ রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়কে। রামনারায়ণের বংশধর চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায় বেনিয়ান হয়েছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির। তাঁদের আর এক উত্তরসূরি পার্বতী মুখোপাধ্যায় পরবর্তীকালে খ্যাতিলাভ করেছিলেন সমাজসেবী হিসেবে, তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়।

আহিরীটোলা স্ট্রিট বরাবর হাঁটতে হাঁটতে ক্রমে পৌঁছনো যায় আহিরীটোলা ফার্স্ট লেনে, সেখান থেকে একটি বাই-লেনেও। সেই প্রধান রাস্তায়, তার লেন বাই-লেনে ঘুরতে ঘুরতে অনুভব করি সেই ঐতিহ্যের ছায়া। খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে যাই এখানে বাস করতেন আরও অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি। হুগলি জেলার জনাই থেকে এসেছিলেন জমিদার অ্যাটর্নি পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ছিল বিশাল অট্টালিকা তাঁর। অট্টালিকা ছিল ভোলানাথ চন্দ্র, বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের পিতা কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায়, কুমারকৃষ্ণ মিত্র— এরকম আরও বহু বিত্তবান মানুষের।

চোখে পড়ে একটি ভাঙা অট্টালিকার অবশেষ। প্রাচীন বাসিন্দাদের মধ্যে আর এক বিখ্যাত হালদার-বংশের বাড়ি এটি। তাঁদের এক আদিপুরুষ শঙ্কর হালদার ছিলেন হলওয়েল সাহেবের দেওয়ান, খুবই পালোয়ান চেহারা। তাঁর খ্যাতি ছিল দু'হাতে সাতাশটি গোরুর গাড়ির কনভয় ধরে রাখতে। তাঁর পাঁচফুকুরে দালানওয়ালা অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ এখনও বর্তমান। সেই শঙ্কর হালদারের স্বাক্ষর আছে গোবিন্দরাম মিত্রের পৌত্র রাধারমন মিত্রের ফাঁসির হুকুম রদ করার আবেদনপত্রে। গোবিন্দরাম মিত্র ছিলেন সেকালের কলকাতার এক বিত্তবান মানুষ, তাঁর পৌত্র রাধারমন মিত্রের ফাঁসির হুকুম হয় জালিয়াতি করার দায়ে। তাঁর ফাঁসি রদ করার জন্য শঙ্কর হালদারের মতো তখনকার বহু মানুষ লিখিতভাবে আবেদন করেছিলেন গভর্নর সাহেবের কাছে। শঙ্কর হালদার লেন, শঙ্কর হালদার বাই-লেন রাস্তা দুটি তাঁর নামেই খ্যাত।

এতসব বিখ্যাত মানুষদের গড়ে তোলা আহিরীটোলা এখন হারিয়েছে তার ঐতিহ্য। তবু কোনও কোনও বাড়িতে এখনও বসবাস করেন তাঁদের উত্তরাধিকারীরা, আবার কারও কারও বংশ এখন লুপ্ত।

আহিরীটোলা নামকরণের পিছনে আরও একটি ইতিহাসের কথা জানা যায়। নাথ সম্প্রদায়ের মানুষরা কোনও একসময় বাস করতেন এখানে। তাঁদের আরাধ্য দেবতা হলেন মহাদেব। তন্ত্র, হঠযোগ, সহজিয়া, শৈবাচার ইত্যাদি ছিল শৈবধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের সাধনমার্গের অঙ্গ। মহাদেবের মতোই নাথ যোগীদের মাথায় থাকত কুণ্ডলী-পাকানো জটা, গায়ে মাখা ছাইভস্ম। কানে কড়ি, বাহুতে রুদ্রাক্ষ, হাতে ত্রিশূল, পায়ে নূপুর, কাঁধে ঝোলা ও গায়ে কাঁথা। পেশায় কেউ তন্তুবায়, কেউ কবিরাজ। সেখানে 'আহিরি' শব্দের অর্থ 'পাকমারা শিকারিদের আস্তানা'। তাঁদের মতে জায়গাটার নাম হওয়া উচিত আহিরিটোলা।

ইতিহাসে ওতপ্রোত রাস্তার দু'পাশে পুরনো ঢঙের বাড়িগুলি পথচারীকে নিয়ে যাবে অষ্টাবিংশ কিংবা উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতায়। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ আবিষ্কারের মতো ভগবান ব্যানার্জি লেনে দেখা পাওয়া যাবে তিনটি আটচালা মন্দিরের।

আর-একটি উল্লেখ করার মতো জায়গা একটি প্রেস, যার মালিক ছিলেন নিত্যলাল শীল। বহু লেখকের সমাগম হত এই প্রেসে। চিৎপুর রোডে ছিল নিত্যলাল শীলের বইয়ের দোকান। বাংলা বইয়ের সবচেয়ে বড় দোকান ছিল এটি। এখান থেকেই বিক্রি হত লেখক কুশদেব পালের লেখা 'হরিবিলাসার' গ্রন্থটি। রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার নামে একজন সংস্কৃতজ্ঞ লেখক লিখেছিলেন অনেকগুলি গ্রন্থ, যাদের মধ্যে আছে 'মালতী মাধব', 'নল দময়ন্তী', 'অক্রুর সংবাদ', 'হরপার্বতীমঙ্গল'। তিনি প্রয়াত হন আঠারোশো পঁয়তাল্লিশ সালে।

পূর্ণচন্দ্র দাস নামে তৎকালীন এক সংকলক প্রকাশ করেছিলেন 'নূতন শখের থিয়েটারের গান' নামে একটি গানের সংকলন, যার মধ্যে আছে রবীন্দ্রনাথ, গিরীশচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ রায়, বিহারীলাল ইত্যাদির গান। গবেষকদের কাছে এই গ্রন্থটির মূল্য অসীম।

এভাবেই পুরনো কলকাতার রাস্তা, গলিঘুঁজিগুলি একটু একটু করে মেলে ধরে কলকাতার কত না ইতিহাস।

কয়েকটি চিঠি

অনবদ্য আত্মকথা

অনবদ্য লাগছে শুভাপ্রসন্নর 'আমার ছবিজীবন'। এত সরল স্বীকারোক্তিমূলক আত্মজীবনী খুব কম পড়েছি। বিশেষ করে নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যায় তাঁর আন্তরিক লেখাটি এতটাই মন ছুঁয়ে গেল যে তা প্রকাশের ভাষা নেই। আমাদের দেশে বিখ্যাত ব্যক্তিরা তাঁদের ভাবমূর্তি রক্ষার জন্যই সম্ভবত খোলাখুলি জীবনের সবকথা লেখেন না। ধরা যাক, রবীন্দ্রনাথ যদি স্ব-কলমে তাঁর আত্মকথা লিখে যেতেন, তাহলে তাঁর জীবনের নানান খুঁটিনাটি নিয়ে এত জল্পনা-কল্পনার কোনও জায়গা থাকত না। এরকম আরও অনেক বিখ্যাত বাঙালি সম্পর্কেও বলা চলে। মানুষমাত্রেরই জীবন বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যায়। সেটা যেমন একটা কৌতূহলের বিষয় তেমনই কীভাবে সেই উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে একজন সফল মানুষের উত্তরণ ঘটে সেটাও সাধারণ পাঠকের কাছে অত্যন্ত শিক্ষণীয় একটি বিষয়।

'আমার ছবিজীবন'-এর ক্ষেত্রে পাঠকের আর একটি বড় পাওনা সঙ্গের ছবিগুলি, যা কার্যত কখনওই দেখিনি। লেখকের কলেজ রো'র স্টুডিওতে পরিতোষ সেন, ভবেশ সান্যাল, অশোক মিত্র ও তাঁর স্ত্রী, চিন্তামণি কর এবং অবশ্যই শুভাপ্রসন্নর একত্র যে ছবিটি ছাপা হয়েছে তা মনে এক অদ্ভুত ভালোলাগাকে সঞ্চারিত করে। এইরকম বিরল ছবি আগামী দিনে আরও দেখতে পাব বলে আশা রাখি।

সব মিলিয়ে 'কালের কষ্টিপাথর' সাহিত্যপিপাসু পাঠকের মনোমতো পত্রিকা হয়ে উঠেছে। খুবই উপভোগ্য হচ্ছে পত্রিকাটি।

তমাল বর্মন
শ্যামবাজার, কলকাতা

কবিতায় চমক

নভেম্বর-ডিসেম্বর যৌথ সংখ্যা 'কালের কষ্টিপাথর'-এর কবিতার পাতা খুলতেই চমক লাগল। অনেক বছর পরে আমার অন্যতম প্রিয় কবি অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর কবিতা দেখতে পেলাম। এর অনেকগুলিই যদিও আগে পড়া। বিশেষ করে সত্তর-আশির দশকে। সেই সামাজিক প্রেক্ষিত, কবিতা নিয়ে সেই কফিহাউসের উন্মাদনা আজ আর নেই। নিজেদের বয়স বেড়ে গিয়েছে, স্থিত হয়ে গিয়েছি। আজকালকার ছেলেমেয়েদের মধ্যেও সাহিত্য অথবা কবিতা নিয়ে অত মাতামাতি দেখি না। প্রত্যেকেই জীবনযাপনের উদ্দেশ্যসাধনে ব্যস্ত। সেলফোন, কম্পিউটার, আই প্যাডের দুনিয়া তাদের অবসর সময়ে ব্যস্ত রাখে। অনেক সুচারু ভাবে বিনীত ভাষায় এই কথাগুলিই অত্যন্ত খেদের সঙ্গে খোদ সম্পাদকমশাই উচ্চারণ করেছেন দেখলাম এবারের সম্পাদকীয়-য়। 'বাংলা ভাষায় সাহিত্যের পাঠকগোষ্ঠী ক্রমশই ছোট হয়ে আসার দুর্যোগাচ্ছন্ন নিয়তি' তিনি যথার্থই অনুভব করেছেন, ঠিক-ই লক্ষ করেছেন 'সাহিত্যের আস্বাদ ও আশ্রয় বা শুশ্রূষায় বেশি মানুষের প্রয়োজন আর নেই।' বিষয়টি কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে ভাবা দরকার। মাঝেমধ্যে মনে হয় বাংলা সাহিত্য তো দূরের কথা, বাংলা ভাষাটাই কি আর টিকবে? কয়েকদিন আগে শ্রীপান্থ মহাশয়ের 'বটতলা' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধের বই পড়ছিলাম। বাংলায় ছাপাখানা আসার পর বাংলা সাহিত্যে এবং ভাষায় কীভাবে উর্দুর প্রভাব পড়েছিল তা চমৎকার ভাবে দেখিয়েছিলেন শ্রীপান্থ। বাংলা বাক্যের মধ্যে 'দিল', 'কুদরত' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার করা হত যথেচ্ছ। কিন্তু তখন তো বাংলা ভাষাটাই একটু একটু করে গড়ে উঠছিল। আজ তো ভাষাটা স্বয়ংসম্পূর্ণ, সার্বিক। তারপরও আজকাল চলচ্চিত্রে বাংলা গানের ভাষা শুনে চমকে উঠি। শুনে ভাবতে বসতে হয়, এই খিচুড়ি ভাষা কি আমারই বাংলা? এরপরও যদি বাংলা সাহিত্যের সর্বজনপ্রিয়তা নিয়ে আশঙ্কা না হয় তো কবে হবে?

সম্পাদকীয়-য় সম্পাদকমশাইয়ের আশঙ্কা তাই যথার্থ বলেই মনে করি। আবার মনে ক্ষীণ প্রত্যাশাও থাকে, একদিন এই অবস্থাটাও শুধরোবে। বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল দিন ফিরে আসবে। সেই প্রয়াসকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না।

এবারে বলি, পত্রিকার প্রত্যেকটি রচনাই অত্যন্ত ভালো লাগছে। কবিতা আমার বিশেষ প্রিয়। স্বল্পখ্যাত কবি অশোক মুখোপাধ্যায়ের কবিতাগুলিও অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। উপরি পাওনা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের চিঠি এবং সেই সূত্রে কফি হাউস-কেন্দ্রিক স্মৃতিচারণার এক ঝলক বিবাগি হাওয়া। সেইসঙ্গে যে যত্ন নিয়ে আপনারা প্রতিটি লেখাকে পেশ করছেন এবং ছাপছেন, তার জন্য আপনাদের প্রশংসা না করে পারছি না।

তন্ময় মুখোপাধ্যায়
পিকনিক গার্ডেন, কলকাতা

তিন টুকরো ভাবরত্ন

'কালের কষ্টিপাথর'-এর অনেক লেখাই আলাদা করে প্রশংসা করার মতো। পড়লেও হয়, না পড়লেও হয়— এমন লেখা এই পত্রিকায় কচিৎ-কখনও দেখে থাকলেও অধিকাংশ লেখাই কোনও না কোনওভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। পত্রিকার বৈশিষ্ট্যের এই সুরটি প্রতি সংখ্যায় প্রথম তিনটি অণু লেখাতেই বাঁধা হয়ে যায়। 'চণ্ডীমণ্ডপ', 'ক্ষণের বচন' আর 'শব্দবক্র' সত্যিই এ-পত্রিকার তিন টুকরো ভাবরত্ন।

সুবিমল চট্টোপাধ্যায়
কালনা, বর্ধমান

বই-ঠেক বইঠা বেয়ে

'কালের কষ্টিপাথর'-এর সব লেখাই পড়ি। চিন্তার ভালোই খোরাক জোটে। নিয়মিত ফিচার প্রত্যেকটি মৌলিক ও গভীরভাবে ভাবায়। আপনাদের বই-ঠেক এককথায় অনবদ্য। গত সংখ্যায় মো ইয়ান-এর 'গার্লিক ব্যালাডস' ও সুদীপ্ত দাসের 'দ্য এক্রোস ক্ল্যান' বই-দু'টির বিষয়ে গভীর আলোচনা পড়ে প্রায় জ্বরে ভোগার মতো সম্পূর্ণ বই পড়বার অধীর আগ্রহে ভুগছি। সলতাইকভ শ্বেদ্রিন-এর 'দি গোলোভলভস' উপন্যাসটির কাহিনির সারাংশ পড়েই মন তৃপ্তির আনন্দে ভরে ওঠে। পুরো বইটি না পড়ে থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

কস্তুরি মুখোপাধ্যায়
চন্দননগর, হুগলি

ছি ন্ন বি চি ন্তা

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাথ। বইবুভুক্ষুর ঠিকানা—নিজস্ব চিত্র

বই লেখা বাড়ুক দিনে দিনে, পত্তর লেখা স্থগিত হয়ে গিয়েছে আজ দু'-চার শব্দের যন্ত্রগত বার্তা দেওয়া-নেওয়ার বাইরে। মাত্র গতদিনেও সে ছিল— রাজারাজড়ার, রাজপুরুষদের, পিতাপুত্রের, গুরুশিষ্যের, বন্ধুবন্ধুনীর, প্রয়োজনের, অবসরের, মায় 'যাও সখী' শিরোভূষা করে রঙিলা প্রেমপত্রিকা। তার পাঠ লেখা, বয়ান মুসাবিদা করা, সমাপনের বিধি— রীতিমতো শেখবার। শেখবার প্রথম পাঠ ছিল 'শিশুবোধকে'ই— বুড়িকিয়া কাঠাকালি বা তেরিজ জমাবন্দীর আগেই, আলাদা বিস্তার বই ছিল 'লিপিমালা' 'পত্রকৌমুদী'র মতো। পুরনো সতেরো-আঠারো শতকের দু'-চারখানা চিঠির নমুনা মেলে পঞ্চানন মণ্ডলের পুঁথি সংগ্রহের ভিতরে, রীতিমতো সে উপভোগ্য।

বাংলা চিঠি লেখা শেখবার পাঠ্যবই ইংরেজি স্কুল থেকে কবেই উঠে গিয়েছে, ইংরেজিতে

> সাধারণজনের প্রথম ক্ষুধা অন্নের, দ্বিতীয় ক্ষুধা মুহুর্মুহু বিজ্ঞাপিত রূপবর্ধক প্রসাধনের, শোভা-স্বাচ্ছন্দ্যের গ্যাজেট্রির, সাংস্কৃতিক ক্ষুধা যদি থাকে, সে সিনেমা-বায়োস্কোপের। বই আজ কোথায় তাঁর চাওয়ার বলয়ে?

সামাজিক ব্যবসাপাতির চিঠির পাঠ্যবই এখনও বছরে-বছরে নতুনভাবে বেরোয়। খ্যাতিমান ব্যক্তিদের লেখা চিঠি— সমাজনেতা বা কবি-লেখকদের পত্রসংগ্রহের বই নিত্য প্রকাশিত হয়— নানা প্রাপকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে, টীকা-টিপ্পনী সহকারে, তার চাহিদাও যথেষ্ট। বাংলায় রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দের বাইরে অবশ্য এর প্রসার নেই বললে চলে। এখানে জীবনীলেখক হয়তো তাঁর উপজীব্যজনের সামান্য চিঠিপত্রের দৃষ্টান্ত বইয়ে তুলে দেন সম্পূরক হিসেবে, কিংবা কোনও খ্যাতনামাজন তাঁর পাওয়া বিভিন্নজনের লেখা পত্র-সংকলন করে দেন তাঁর পরিচয়ের ব্যাপকতার নজির বলে। এক সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে দেখেছি তাঁর কাছে আসা পত্র বা বাছাই পত্র, আনুষঙ্গিক ঘটনার মাঝখানে রেখে গ্রন্থনা করে তুলেছেন তাঁর 'চিঠির দর্পণে' বইয়ে। রবীন্দ্রনাথের

পত্রসংগ্রহের এতগুলি খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পরেও অন্য কোনও লেখকের পত্রসংগ্রহের বই করতে কেউ উদ্বুদ্ধ হলেন না কেন? একেবারে হননি, বলা যাবে না। জীবনানন্দের কয়েকখানি করে পত্রের সংকলন বেরিয়েছে দুই বাংলা থেকেই। পত্রসংগ্রহের প্রয়োজন আছে। তার ভিতরে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকতে পারে, যা তাঁর লেখার 'পরে আলোকপাত করবে, বা ইতিহাসের প্রয়োজনীয় নথি হয়ে উঠবে। কাকে, কবে, কী কারণে তিনি কী লিখেছেন, সে নিশ্চয় অতি জ্ঞাতব্য বিষয়। তবে, একে সে শ্রমসাধ্য গবেষণার কাজ, আর সে চিঠি এদেশে রক্ষা পাওয়াও কঠিন।

পত্তরের কথা লিখতে বসিনি, যদিও প্রসঙ্গক্রমে সে-ই জুড়ে বসল লেখার গোড়াতে। ক'সংখ্যা আগে 'কালের কষ্টিপাথর'-এ তাঁর একটা দিবাস্বপ্নের কথা জানিয়েছিলেন সম্পাদক, এ লেখার প্রবর্তনা সেখান থেকে। দিবাস্বপ্ন হল তাঁর বইস্বপ্ন। লিখেছিলেন, কতদিন স্বপ্ন দেখেছি। জনদরদী সরকার কি পারেন না, বাংলা ক্লাসিক, চিরায়ত বইগুলি যত্ন করে ছেপে নামমাত্র দামে বইবুভুক্ষু জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে? বইগুলি লুপ্তির হাত থেকে বাঁচে, আর লোকে তার সুস্বাদে নির্মল হয়ে উঠতে পারে ক্রমাগত। পড়ে নাড়া লাগল, কিন্তু একটুখানি নগণ্য অভিজ্ঞতা উঠে এল চিত্তে, মনে হল জানাই।

মনে হল, সরকার ইচ্ছা করলে হয়তো পারেন, বইয়ের বুভুক্ষাই জাগিয়ে দিতে পারেন জনচিত্তে, কিন্তু তাতে তাঁর প্রয়োজন? কোল্ড ওয়ারের প্রথমদিকে ভালো-ভালো মার্কিন ক্লাসিক উপহার পাওয়া যেত ঘরে বসে। কোনও-কোনও স্থানীয় প্রকাশ-সংস্থা সে বই তরজমা করিয়েও সস্তা দামে বিক্রি করতেন, বিদেশি সাহায্যের উৎসাহে। সোভিয়েত বইয়ে, তার ইংরেজি ও বাংলা তরজমাতেও বাজার ছেয়ে গিয়েছিল। নামমাত্র তার দাম, এখানকার 'পার্টি'কর্মীরা তার প্রচারেও যথাসাধ্য করতেন। বাংলা 'সোভিয়েত দেশে'র তুলনায় ইংরেজি Span কাগজের লেখক বা লেখার কিঞ্চিৎ গুরুত্ব হয়তো হয়েছিল পাঠকচিত্তে। কিন্তু এর ভিতরে স্বপ্নের বাংলা ক্লাসিক কোথায়? পরে এক-আধটি প্রকাশনা ভরতুকির অর্থে দু'একখানি অতিপরিচিত উনিশ শতকীয় বাংলা ধ্রুপদী গ্রন্থাবলির সস্তা সংস্করণ করেন। নিতান্তই দু'-একজনের। কিন্তু এর সবটাই নিতান্ত রাজনৈতিক হেতুতে বাঁধা। না হলে বসুমতীর প্রকাশনাকেই তাঁরা পুনঃসক্রিয় করে তুলতে পারতেন। অ-পক্ষাবলম্বী নতুন রাষ্ট্রকে দুই অতিশক্তির কারও প্রতি পক্ষপাতী, নিদেন নমনীয় করে তোলার বাইরে এর লক্ষ্য ছিল না। আর, এর ভিতরকার বাংলা বইগুলিও ব্যাপক জনচিত্তে বইয়ের বুভুক্ষা জাগায়নি, কয়েকজন শিক্ষার্থী বা শিক্ষাকর্মীরই মাত্র সুলভে প্রয়োজন পূরণ করেছিল।

এসবই জানা কথা, পুরনো কথা। আজকে হয়তো ইচ্ছা করলে সরকার ফের এমন একটা আদর্শ প্রকল্প হাতে নিতে পারেন। কিন্তু সাধারণজন কি তার সুস্বাদ নিতে আদৌ আগ্রহবোধ করবেন? যতদূর দেখতে পাই, শুনতে পাই— ভূরিভূরি বই ছাপা হচ্ছে দেশের চারপাশে, দিনে-দিনে বাড়ছে লেখা আর লেখক— পাঠক কে? ক'জনকে পড়তে দেখা যায়, যাকে বলে বাইরের বই— সেই সুস্বাদ বস্তু? শুধুই মুখরোচক বই, মন নির্মল করে তোলার সাত্ত্বিক মুদ্রণ নয়।

চারদিকে যা দেখি, সাধারণজনের প্রথম ক্ষুধা অন্নের, দ্বিতীয় ক্ষুধা মুহুর্মুহু বিজ্ঞাপিত রূপবর্ধক প্রসাধনের, শোভা-স্বাচ্ছন্দ্যের

এক-আধটি প্রকাশনা ভরতুকির অর্থে দু'একখানি অতিপরিচিত উনিশ শতকীয় বাংলা ধ্রুপদী গ্রন্থাবলির সস্তা সংস্করণ করেন। নিতান্তই দু'-একজনের। কিন্তু এর সবটাই নিতান্ত রাজনৈতিক হেতুতে বাঁধা। না হলে বসুমতীর প্রকাশনাকেই তাঁরা পুনঃসক্রিয় করে তুলতে পারতেন।

গ্যাজেট্রির, সাংস্কৃতিক ক্ষুধা যদি থাকে, সে সিনেমা-বায়োস্কোপের। বই আজ কোথায় তাঁর চাওয়ার বলয়ে? বই দরকার পড়ে শিক্ষার্থীর, গবেষকের। তাঁরা যথাসাধ্য পাঠসংক্ষেপ করে নিতে তৎপর। পরীক্ষা পাশের জন্য ছাত্র খোঁজেন নোটস্, পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্নের তৈরি করা উত্তর— বই নয়। গবেষকে খোঁজেন হয়তো এক-আধখানা বিশেষজ্ঞোচিত আকর তথ্যগ্রন্থ। সে এই স্বপ্নের ক্লাসিক বই নয়।

তবে যে এত-এত বই, গল্প-কবিতা-উপন্যাসের রাজকীয় সব বই, উপর্যুপরি প্রকাশ হয়ে চলেছে প্রতিদিন? খবরকাগজে বেস্টসেলার বইয়ের তালিকা উঠছে, বইয়ের সাড়ম্বর পুরস্কার-সংবাদ ছাপা হচ্ছে, মান্যজনে আট কলমের, আধপাতা করে প্রশংসা লিখছেন দু'দিন অন্তর-অন্তর? রহস্য খুব একটা গূঢ় আর নয়। ব্যবসায়িক কূটকলার জাল সর্বত্রই সমান ছড়ানো। বোধহয় তারই ফলে বহু সমাদরধন্য লেখকও আজ নামগৌরবে গণস্পর্শী, তাঁর লেখার ধারণা কারও বড় একটা নেই। একবার প্রেস ক্লাবে এক নামজাদা সংবাদপত্রসেবী লেখকের পাঠক-সমাবেশে তাঁর সঙ্গী হয়েছিলাম। পাঠকেরা যেসব প্রসঙ্গ প্রশ্নস্থলে উত্থাপন করলেন, তাতে বুঝলাম তিনি এই বয়সেই কিংবদন্তি হয়ে গিয়েছেন। তারপর লেখক যখন তাঁর নানা বইয়ের উল্লেখ করে পাঠকের মতামত প্রার্থনা করলেন, সঙ্গী হিসেবে অস্বস্তি হতে লাগল আমারই। পাঠকদের কথায়-বার্তায় লেখকের আত্মবিশ্বাস কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বেই উঠেছিল। ফল কথা, জানতে হল, লেখকের এক-আধখানি মাত্র বইয়ের নাম জানেন এক-আধজনা। বইয়ে কী লেখা আছে তার কিছুই কেউ জানেন না। পাঠকদের মধ্যে তরুণবয়সি ছাড়া মধ্যবয়সিও ছিলেন। ব্যক্তিগত অসোয়াস্তির কারণে লেখকের নামটা আর এল না কলমে। প্রকাশক লেখকের নাম চারিয়ে দিতে পারেন বহুতরভাবে, লেখা পড়াবার সাধ্য তাঁদের নিতান্ত সীমাবদ্ধ।

এমন পরিস্থিতি ছিল না আমাদের কম বয়সে। তখন লেখকেরা স্বল্পবিত্ত ছিলেন, দৈনিক কাগজে তাঁদের প্রশ্রয় ছিল না। তাঁদের বইয়ের কাটতিও বেশি ছিল না, বিজ্ঞাপনও নামমাত্র। কিন্তু বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর কিংবা সুধীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ সামান্য পাঠকের কাছে হলেও, পরমশ্রদ্ধেয় ছিলেন। তাঁদের বই আধুনিক ক্লাসিকের পর্যায়ে স্থান পেয়েছে। তার এক কারণ, তাঁদের জীবনচর্যা বা রচনাচর্যা, হয়তো জনসঙ্ঘ বা দীপান্বিত মঞ্চের সঙ্গেও তাঁদের ব্যবধান। প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বার্তের যিনি এতখানি ওতপ্রোত, ব্যক্তিজীবনে বা রচনাসূত্রে, বারেবারেই বলেছেন তাঁর পরম নিঃসঙ্গতার কথা। যে-ইন্ডিয়ান প্রেস পরপর তাঁর বইগুলির রাজসংস্করণ ছেপেছিলেন, তার স্বত্বাধিকারী চিন্তামণি ঘোষ ছেলেদের হাতে ব্যবসা তুলে দেওয়ার প্রাক্কালে তাঁকে জানান, তিনি পরপর যত্ন করে তাঁর বই ছেপেছেন তাঁর প্রতি ভক্তিবশত। বইয়ের কাটতির দিকে না তাকিয়ে। তাঁর ছেলেরা ব্যবসায়ী, বইয়ের কাটতি না হলে সে বই তারা ছাপবে না— একথা আগেভাগে তাঁকে জানিয়ে দেওয়া ভালো। ইন্ডিয়ান প্রেস থেকে যাবতীয় বই তুলে নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগের সূত্রপাত করতে হল।

ধন্য আমি মাটির প'রে: কলকাতার ফুটপাথে একই ভূমিশয্যায় মানুষ ও সারমেয়। — নিজস্ব চিত্র

বিচিত্র থাকার তল্লাশ

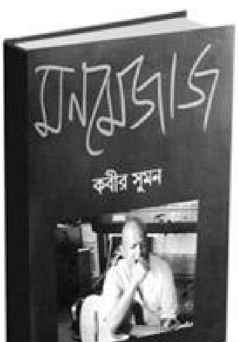

সে সময় বাঙালির জীবন সঙ্গীতময় ছিল না তেমন। জলসা-টলসা জলাঞ্জলি দিয়ে বাঙালি ঝাড়া হাত-পা। এল পি রেকর্ডখানা ঘরের কোণে পড়ে থেকে প্রায় অ্যান্টিক। রেডিওতে দুপুরবেলায় গান শোনেন কাজের মাসি, বিভুতি ভারতী। যদিবা দু-একজন টেপরেকর্ডারে নির্বাচিত গায়কের রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনেন তাও মাঝপথে ফিতেটিতে জড়িয়ে সে গান থেমে যায়। ঠিক এই সময় বাঙালি শুনল সুমনের গান। অনেকটা ধারাল বরফের মতো সেই গানকে আলতো করে বুলিয়ে নিলে বড্ড আরাম আর যদি গিলে খান দেখবেন সেই বরফ আপনার গলা, বুক কাটতে কাটতে হৃৎপিণ্ড ক্ষতবিক্ষত করে দেবে। সুমনের সুর ছিল সেই বুলনো আরাম আর কথা ছিল সেই হৃৎপিণ্ড ছেঁদা করা বরফের ফালি। স্বর্ণযুগে মাখা চিনির রস কবে যে শুকিয়ে সুগার কোটিং হয়ে গেছে বাঙালি তা টেরও পায়নি; সুমন এসে এক ধাক্কায় ভেঙে দিলেন সেই চিনির আস্তরণ, আর মিঠে বাঙালির গায়ে মাখালেন চিটে গুড়ের রস। পেলব সেই রসে মিষ্টির সঙ্গে ঝাঁজ আর তেঁতোর অদ্ভুত মিশ্রণ। সেই রসে ঝাঁপ মেরে ঘুরে বেড়াল একদল পিঁপড়ে, কিন্তু যদি ম্যামথরাও ঝাঁপ দিতেন তবে আর বাংলা গানকে এমন দড়ির খেলায় ব্যালান্স করতে হত না, হয় তা পড়ত নয় পার হয়ে যেত অনায়াসে।

ধান ভানতে শিবের গীত। জানুয়ারি ২০১৩ প্রকাশিত কবীর সুমনের 'মনমেজাজ' বইটির কথা লিখতে বসে গায়ক সুমনের কথা একবারও উল্লেখ না করলেও চলত। কারণ গদ্যকার সুমন এতটাই শক্তিশালী যে গায়ক সুমনের রেফারেন্স এখানে না টানাই উচিত। কিন্তু সমস্যাটা বিখ্যাত বাপের ছেলে

হবার মতো, তিনি যতই প্রতিভাবান হন না কেন একবার না একবার বাবার নাম উচ্চারিত হবেই তাঁর সাথে। সেটা মন্দ কিছুও নয়। তবে সুমনের গদ্যের কথা বলতে গিয়ে গীতিকার সুমনের উল্লেখ করতেই হয়, কারণ সুমনের গান নেহাৎই কবিতার ওপর সুরারোপ নয়, এ যেন কবিতায় জন্ম হয়েও গদ্যের উপবিত ধারণ করা কোনও দ্বিজ। আবার তাঁর গদ্যও পরপর সাজানো কোনও শব্দের সারি নয়, সেই চিটে গুড় মাখানো পেলবতা, ঝাঁঝাল, তীব্র অথচ চেটে খেলে মিঠে লাগে।

গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে একটি দৈনিক কাগজে কলাম হিসেবে প্রকাশিত হত 'মনমেজাজ' ২০০৬ থেকে ২০০৮। কেন সে সময় লেখাগুলি নিয়ে তেমনভাবে আলোচিত হয়নি জানি না। ছোট ছোট রম্য রচনা ধাঁচের লেখাগুলি লেখা হয়েছে প্রবল মুন্সিয়ানার সঙ্গে। সুমন নিজেও এই বইটির ভূমিকায় লিখেছেন 'স্বল্পপরিসরে কোনও কিছু নিয়ে লেখা বড় পরিসরে লেখার চেয়ে ঢের বেশি মুন্সিয়ানা ও মেহনৎ দাবি করে।' ২৯৬ পাতার এই বইটি ১২৫টি শিরোনামে বিভক্ত, কাজেই বোঝা যাচ্ছে লেখার পরিসর সত্যি স্বল্প, কিন্তু অত্যন্ত সুপাঠ্য। ১২৫টি শিরোনামভুক্ত লেখাগুলোতে ঠিক কী আছে তার আভাস সুমন নিজেই দিয়েছেন তাঁর 'বিচিত্র থাকা' নামের প্রথম লেখাটিতে '... একটি নাতিদীর্ঘ কলমে আমি চেষ্টা করব বিচিত্র থাকার তল্লাশ নিতে।' সত্যিই সুমন গোটা বইটিতে বিচিত্র থাকার তল্লাশ দিয়েছেন। কিন্তু খানিকটা নিরাসক্ত দূরত্ব থেকে। অথচ অনেক লেখাতেই সুমন নিজেই চরিত্র হিসেবে উপস্থিত, কিন্তু যেন ব্রেশটের দূরায়ন তত্ত্ব মেনে লিখতে নেমেছেন সুমন।

কেবল বিচিত্র বিষয়েই নয় নানান বিচিত্র ভঙ্গিতে লিখেছেন সুমন। এখানে এমন অনেক লেখা আছে যা পড়লেই মনে হয় লেখক খুব মন দিয়ে বসে কোনও সিনেমা দেখছেন। আর প্রতিটি সিন টুকে নিচ্ছেন চিত্রনাট্যের ঢঙে। অথচ সিনেমার শেষ লাইনে এসে সমাপ্ত না লিখে, লিখে ফেলছেন সিনেমার সার কথাটি। যেমন, তাঁর 'একটি মুহূর্ত' শিরোনামের যে লেখাটি, তা থেকে নির্মাণ করা যেতে পারে সুন্দর একটি ছোট ছবি। কিন্তু এই লেখার শেষ লাইনকটিকে কি কোনও সিনেমার ফ্রেমে বাঁধা সম্ভব, মনে তো হয় না। তাই এ ছবির শেষেও সমাপ্ত লেখা বেশ কঠিন। কিংবা তাঁর শ্রীচরণকমলযুগলেষু লেখাটি যেন জীবনানন্দের আট বছর আগের একদিনের গদ্য রূপ। অথবা বলা যায় আধুনিক সময়ের সংকটের রূপটি সুমন তুলে ধরেছেন প্রায় কবিতার মতো করে।

মনমেজাজে একশো পঁচিশটি লেখাই বিচিত্র, উৎকৃষ্ট এবং মেজাজি। একথা ঠিক প্রায় প্রতিটি লেখাতেই সুমন সমাজের সমালোচক। লিখেছেন শব্দদূষণ, বাংলা ভাষার সংকট, গুনিজনকে বিস্মরণ, সুনামির তাণ্ডবে মানুষের ভূমিকা, খেলা, সংস্কৃতি, গানবাজনা, রাজনীতি ইত্যাদি আরও বিচিত্র বিষয়ে। কোনও কোনও লেখায় সুমন তাঁর সময়ের কথা বা তাঁর অতীত সময়ের কথা লিখেছেন। কিন্তু তা বুড়োদের স্মৃতি রোমন্থনের ভঙ্গিতে নয়। বরং ইস কী মিস করছি এই ঢঙে। প্রত্যেকটি লেখাই শুরু কোনও একটি শব্দ বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে আর শেষ হয় বৃহত্তর কোনও সামাজিক ব্যাখ্যা দিয়ে। হতে পারে সেটা সুমনীয় ব্যাখ্যা, আপনি মানতেও পারেন নাও পারেন, কিন্তু বিষয়গুলি যে ঘটছে তা অস্বীকার করার বুকের পাটা খুব বেশি বাঙালির আছে বলে তো মনে হয় না। তবে ২০০৬ থেকে ২০০৮, প্রকাশিত হত লেখাগুলি। এই পাঁচ বছরে পৃথিবী খানিক বদলেছে, সুমন নিজেও বদলেছেন খানিকটা। তাই হাতে গোনা দু-একটি লেখার প্রাসঙ্গিকতা হয়তো একটু হলেও কমেছে। আবার কিছু লেখার একটা বিস্ময়কর চিরকালীন আবেদন আছে। তবে বিষয় বৈচিত্র্য যদি বাদও দিই, কেবলমাত্র তরতরে গদ্য পড়বার জন্যই 'মনমেজাজ' পড়া যায় বারবার। 'তাধিনধিননা' বা 'রাজার স্ব গতোক্তি'-র মতো লেখাগুলিতে ভারতের অবহেলিত স্পোর্টস বা করসেনা তাণ্ডবের মতো সিরিয়াস সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে লিখেছেন, কিন্তু তা লেখা হয়েছে সরস ভঙ্গিতে নিহিত ছন্দে বা অন্তমিল দিয়ে দিয়ে। আসলে গোটা বইটাই একধরণের রেস্ট্রিকটেড জঙ্গিপনায় লেখা। কখনও ফুরফুরে কিন্তু গভীর, আবার কখনও ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির মতো রাগী। প্রাণোচ্ছল, প্রতিবাদী যুবকের মুখের ভাষার মতো তাঁর লেখার ভঙ্গী। এত সহজ বাংলা বলতে পারেন বলেই বোধহয় সমস্ত বিতর্ক মাথায় রেখেও, এই ষাটোর্ধ্ব বয়সেও তিনি বাঙালির যৌবনের আইকন। গোটা বইটিতে তিনি সমাজের ওপর চোখ বুলিয়ে গিয়েছেন ক্ষোভে, প্রতিবাদে, নিন্দায়, ব্যঙ্গে কিন্তু আরাম করে, ভালোবেসে। অনেকটা সেই ছোটবেলায় চোখে কমলালেবুর রস ছেটানোর খেলার মতো। সেই রসের জ্বালায় চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ত, কিন্তু খানিকটা সইয়ে চোখ খুললে পৃথিবীটাকে ঝকঝকে দেখাত।

নীলা বন্দ্যোপাধ্যায়

কবীর সুমন

স্মৃতিকথা

সমরেশ মজুমদার। নবনীতা দেবসেন। প্রচেত গুপ্ত
জাহিরুল হাসান। শংকর চক্রবর্তী

জলদর্চি: সাহিত্যের সমস্ত ধারাই কোনও না কোনও ভাবে স্মৃতিনির্ভর। সেখানে সাহিত্য স্মৃতিরসে জারিত। কিন্তু স্মৃতিকে মুখ্য করে যখন সাহিত্য গড়ে ওঠে তখন সাহিত্যের আরেক ভিন্ন ধারা নির্মিত হয়। তখন স্মৃতির পাশাপাশি প্রাধান্য পায় লেখকের আবেগ, ব্যক্তিত্ব, জীবনকে নিজস্ব রুচিতে তুলে ধরার এক স্বকীয় রীতি। সেই সূত্রেই আসে গদ্যরীতি, বিষয় নির্বাচন ইত্যাদি। সাম্প্রতিক যে বিষয়ে চরম উত্তেজনা কিংবা দুঃখ জড়িয়ে থাকে, সেই বিষয়ই সময় পার হয়ে স্মৃতির ঘরে পৌঁছে সমাহিত রূপ নেয়। দীর্ঘ সময় পার হলে পুনর্মূল্যায়নের সুযোগে নিরপেক্ষতা গভীর হয়। ইতিহাসের সত্যতা বজায় রেখেই গড়ে ওঠে শুদ্ধ সাহিত্য। ইতিহাস হয়ে ওঠে সরস। তথ্যের সঙ্গে তত্ত্ব এসে সহজে মেশে। স্মৃতিচারণায় লেখকের ঘটে ভাবমোক্ষণ, পাঠক ইতিহাসে না থেকেও অতীতচারী হন সহজে। একান্ত ব্যক্তিগত অনুভব অথচ পাঠককে জানানো যেতে পারে সেরকম স্মৃতিকে গদ্যে ধরে রাখা বাংলা সাহিত্যে নতুন নয় তবে পরিমাণে যথেষ্ট নয়। ব্যক্তিজীবনে থাকে বহু গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতি। সব স্মৃতিকে একসঙ্গে ধরতে যাওয়া সম্ভব নয়, উচিতও নয়। যে কোনও স্মৃতিই গদ্যরীতিতে সাহিত্যের রূপ নিতে পারে। তবে এ সংখ্যার আমন্ত্রিত লেখকরা বিশেষ ঘটনা, চিঠি ইত্যাদিকে অবলম্বন করে তাঁদের রচনায় সাহিত্যসংস্কৃতি বিষয়ক স্মৃতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এটি পাঠকের কাছে বাড়তি পাওনা।

সমরেশ মজুমদার

স্মৃতি থেকে যায়

আমরা তখন বিমল করের কার্জন পার্কের আড্ডায় নিয়মিত ঢুঁ মারছি। এর দুটো কারণ ছিল। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প, নতুন রীতির জনক ছিলেন বিমল কর। কল্লোল গোষ্ঠীর আমল থেকে যে ধরনের ছোটগল্প লেখা হয়ে আসছিল তা থেকে বেরিয়ে এসে অতিআধুনিক ফর্মে ছোটগল্প লিখেছেন বিমল কর। লেখার ব্যাপারে অমন খুঁতখুতে লেখক আমি কখনও দেখিনি। লাইনের পর লাইন যত্ন নিয়ে লেখার পরেও ছিঁড়ে ফেলতেন। ঘটনার ঘনঘটার বদলে মানুষের মন নিয়ে তাঁর লেখায় অপূর্ব সমীক্ষা থাকত যা আমরা মুগ্ধ হয়ে পড়তাম। পাশাপাশি, যে কথা কেউ মুখে উচ্চারণ করত না, আড্ডায় যাওয়ার পিছনে সেটাও একটা কারণ ছিল। বিমল কর 'দেশ' পত্রিকার গল্প নির্বাচন করতেন। তরুণ গল্পকাররা ভাবত নিত্য দেখাশোনা হলে নির্বাচিত হতে সুবিধে হবে। কিন্তু এই ব্যাপারে বিমল কর কখনই আপোষ করেননি। গল্প পছন্দ না হলে তৎক্ষণাৎ ফেরত পাঠিয়ে দিতেন। একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। দীর্ঘকাল ছোটগল্প লিখে পরিচিত একজন প্রবীণ লেখক, যিনি আড্ডায় আসতেন, 'দেশ'-এ গিয়ে গল্প জমা দিয়েছেন। সেই গল্প পড়ে বিমলদা ফেরত নিয়ে যেতে বললেন। লেখক ঘাবড়ে গিয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করতে বিমলদা বললেন, 'তোমার নায়ক তার নিজের কাকিমার সঙ্গে বিছানায় শুচ্ছে, কোন দরকার ছিল? লেখক পরের দিনই আর একটা গল্প এনে বললেন, 'এবার দেখুন।' দেখা গেল, কাকিমার বদলে বউদি করে দেওয়া হয়েছে। লেখকের যুক্তি এটা রবীন্দ্রনাথও করেছেন।' বিমলদা জবাব দিয়েছিলেন, 'আগে রবীন্দ্রনাথ হও তারপর এই গল্প ছাপবো।'

পছন্দসই কয়েকজনের সঙ্গে কে সি দাসের দোকানে চা খেয়ে কার্জন পার্কে বসতেন বিমলদা আড্ডা মারতে। অপরিচিত কোনও নতুন লেখক আচমকা এসে গেলে অস্বস্তিতে পড়তেন। সবিনয়ে বলতেন, 'আমরা এখন এ্যাডাল্ট কথাবার্তা বলব, আপনি অন্য কোনওদিন আসতে পারেন।'

খুব ঘরকুনো, নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাইরে না যাওয়া আদ্দির পাঞ্জাবি ধুতি পরা মানুষটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়লাম। সিগারেট খেতো খুব কিন্তু মদ স্পর্শ করেননি। একদিন আমাদের বললেন, 'কাল বাড়িতে এসো, তোমাদের মদ খাওয়াবোই।

'মদ? কোথায় পেলেন?'

'হুঁ হুঁ। একজন একটা বোতল দিয়ে গিয়েছে। এসো কিন্তু।'

পরের দিন বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, অভ্র রায়, সুধাংশু ঘোষ, সত্যেন্দ্র আচার্যের সঙ্গে আমি পৌঁছে গেলাম ওঁর সল্টলেকের বাড়িতে। ভালো ভালো খাবার খাওয়ালেন। বললেন, 'খালি পেটে মদ খাওয়া ঠিক নয়।'

সেসব খাওয়ার পর গ্লাস এল, তাতে অর্ধেক জল ঢালা হল। বরেনদা বললেন, 'আগে জল কেন, আগে তো হুইস্কি দেবেন।'

'একই হল।' বলে পকেট থেকে হোমিওপ্যাথির চেয়ে একটু বড় শিশি বের করে তার ছিপি খুলে প্রত্যেক গ্লাসে কয়েক ফোঁটা ঢেলে বললেন, 'বুঝেসুঝে খাবি, যেন নেশা না হয়ে যায়!'

আমরা হাঁ হয়ে গেছি। বরেনদা সাহস করে বলেছিলেন, 'ইস্, খুব ভুল হয়ে গেল। আজ শক্তিকে নিয়ে এলে ও খুব খুশি হত।' তারপর গ্লাস তুলে চেঁচিয়ে বলেছিলেন 'চিয়ার্স!'

নবনীতা দেবসেন

সাহিত্যিক স্মৃতির টুকরো কথা: ভালো-বাসা বাড়ির অতিথিরা

'ভালো-বাসা' বাড়িতে এসেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। রোববার সকালে বাবা মায়ের সঙ্গে আড্ডা জমিয়েছেন, হঠাৎ ফোন এল আমাদের বাড়িতে, তারাশঙ্করের শিশু নাতিবাবু নাকে আধুলি ঢুকিয়ে ফেলেছেন! রইল পড়ে আড্ডা, উদ্বেগে অস্থির হয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন গাড়ি নিয়ে। নাতি ছিল তাঁর প্রাণ। পরে ফোনে খবর নিলেন মা-বাবা, নাতি বিপন্মুক্ত। অর্ধ শতাব্দী পেরিয়েছে। কিছুদিন আগে বাংলা আকাদেমিতে তারাশঙ্করের পরিবার থেকে কিছু কাগজপত্র দান করা হচ্ছিল, সেই নাতি এসেছিলেন সভায়। পঞ্চাশোর্ধ্ব সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে দেখেই মনে পড়ে গেল সেই আধুলি-সংকটের কাহিনি।

ছাদের ঘরে একটা ভারী কালো কাঠের চেয়ার ছিল, হাতল ওয়ালা। আমাদের বাড়িতে সেই চেয়ারটার নাম, 'মানিকের চেয়ার'। বাবা-মা বলতেন, 'ওরে, মানিকের চেয়ারটা গেল কোথায়?'

একদিন মাকে জিজ্ঞেস করলুম বড় হয়ে 'মা, ওই চেয়ারটার নাম কেন মানিকের চেয়ার?' মা হেসে হেসে খুশি গলায় বললেন, আমরা তখন ৫ নম্বর হিন্দুস্থান পার্কে এসেছি। এই ৭২ নম্বর বাড়ি তখনও তৈরি হয়নি। জমি কেনা হয়েছে। দেবকী বসুর ছোট ভাই আর্কিটেক্ট চিত্রগোপাল বসু বাড়ির নকশা করছেন তোমার বাবার সঙ্গে বসে। বাবার এদিকে ওদিকে বারান্দা চাই, আলো হাওয়া! ৫ নম্বরে আমাদের তেমন কোনও আসবাব কেনা হয়নি তখনও, শুধু একটা চৌকি আর একটা আরামকেদারা ছিল। আর আমাদের খাটটা। একদিন দেখি অনেক দূর থেকে মানিক আসছে দুই হাতে মাথার ওপরে একটা কালো রঙের চেয়ার নিয়ে। এসে নামিয়ে দিয়ে বললে; 'বৌদি, এক কাপ চা দেখি, অনেক দূরের পথ মোট বয়েছি।'

'কেন, কেন, কেন? মোট বইলে কেন?'

'বা, আপনাদের ঘরে মোটে আসবাব নেই, এসে বসব কিসে?'

সেই থেকে ওই চেয়ারের নাম হয়ে গিয়েছে মানিকের চেয়ার। চারতলার ঘরে ভগ্নাবস্থায় তিনি অদ্যাপি বিদ্যমান।

বাবার ভারতী গ্রুপের বন্ধুরা আসতেন মাঝে মাঝে, দুপুরে মাংসভাতের আড্ডায়। সেদিন একটা ছবি বেরিয়ে পড়ল। আমার ছাত্র বয়েসের বক্স ক্যামেরায় তোলা। আমাদের দক্ষিণের বারান্দায় রোদ্দুরে ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বাবা নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে তাঁর বন্ধুরা। চারু রায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাংকুর আতর্থী, সুধীরচন্দ্র সরকার, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, আর আঁচলে চাবি বেঁধে ঘোমটা দিয়ে আমার মা রাধারাণী দেবী।

ওই বারান্দাতেই তোলা আরও একটি ছবি আছে। দুই আঙুলে চুরুট, একটিতে তিনি বাবা মায়ের মধ্যিখানে, আরেকটিতে একা আলাদা দাঁড়িয়ে, পোজ দিয়ে শিশিরকুমার ভাদুড়ী। বাবার অল্প বয়েসের বন্ধু। তিনি বাড়িতে ঢুকতেন, সিঁড়ি দিয়ে উঠতেন, শেক্সপিয়র আবৃত্তি করতে করতে। কখনও হ্যামলেট, কখনও ম্যাকবেথ শুনেছি তাঁর মুখে। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। ম্যাজিকাল আবৃত্তি। বাড়িতে অনেকবার দেখলে কী হবে, আমার কপালে তাঁর কোনও নাটকই দেখা হয়ে ওঠেনি। বাবা-মা কেন জানি না ছেলেবেলায় নাটক দেখতে নিয়ে যেতেন না আমাকে। প্রথম গেলুম তাঁদের সঙ্গে বহুরূপীর নাটকে।

আর একজন আসতেন ধবধবে সাদা থান ঘরোয়া করে পরে, হাতের ছোট্ট কাপড়ের থলিতে করে আমার জন্য এক ঠোঙা সরগুজা বাদাম নিয়ে। জ্যোতিমাসিমার আনা সেই অসাধারণ সুস্বাদু বাদাম আমি আর জীবনে কোথাও খাইনি। জ্যোতির্ময়ী দেবী আসতেন কার্তিক বোস লেন থেকে, 'রাধারানী, অ রাধারানী, বাড়ি আছো?' মা সকলেরই মাননীয়া 'বৌদি', বা 'দিদি', শুধু দু'-একজনেরই আদরের 'রাধারানী' ছিলেন। মা জ্যোতিমাসিমাকে গভীর সম্মান করতেন, বলতেন তিনি একক, তাঁর মতো কোনও লেখক নেই। আমার মা লেখক-লেখিকা ভাগাভাগিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। সাহিত্যের জগৎ একটাই খোলা জগৎ, স্ত্রী-পুরুষ সবাই সমানভাবে উপস্থিত হন, গুণী কিংবা নির্গুণ। হিসেবটা হবে সাহিত্যের নির্ভর, লেখকের জেন্ডার নির্ভর নয়। জ্যোতির্ময়ীর একক ঔজ্জ্বল্য কিন্তু জীবনের শেষ দিকে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল বাংলা সাহিত্যে। বিশেষত ভারতীয় সমাজে মানুষ হিসেবে মেয়েদের অবহেলা, তাদের প্রাণের মূল্যহীনতা নিয়ে ভাবনার ক্ষেত্রে তিনি পথপ্রদর্শিকা। তাঁর কন্যা অশোকা গুপ্তা মায়ের আদর্শে প্রাণিত হয়ে বাংলার মেয়েদের জন্য প্রচুর সংগঠনের কাজ করে গিয়েছেন।

আর একজন খুব আসতেন বাড়িতে, তিনি ছিলেন আমার বাণী পিসিমা। বাণী রায়। তিনি আসতেন খুব সেজেগুজে, তখনকার দিনের পক্ষে একটু বেশি দুঃসাহসী ছিল তাঁর সাজপোশাক, যেমন সাহসী ছিল তাঁর সাহিত্যভাবনাও। ছোট করে ছাঁটা কোঁকড়া চুলে তিনি একাধিক বিভিন্ন বর্ণের ক্লিপ পরতে ভালোবাসতেন, চুল পিছনে নিয়ে রিবনের রঙিন ফুল বাঁধতেন, গলায় নানান ধরনের পুঁতির মালা, নানা ফ্যাশনের চোখ ধাঁধানো হাতকাটা ব্লাউজ, অত্যুজ্জ্বল রঙের স্বচ্ছ শিফন, জর্জেট শাড়ি। মুখে চড়া সাদাটে মেক আপ, ঠোঁটে কড়া লাল লিপস্টিক। হাই হিল জুতো, ম্যাচিং ভ্যানিটিব্যাগ। তিনি বিয়ে করেননি। ইংরেজির অধ্যাপনা করতেন, খুব চমৎকার বক্তৃতা দিতে শুনেছি তাঁকে ইংরেজিতে। শুনেছিলুম প্রেমে পড়েছিলেন রাধামোহন ভট্টাচার্যের, দু'জনেই ইংরেজির ছাত্র ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিয়ে হয়নি, দু'জনেই চিরবিরহী রয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু রূপকথার সত্যি মিথ্যে জানা হয়নি। আমার বাবা ও মা দু'জনেই বাণী পিসিমাকে খুব স্নেহ করতেন, এবং যথেষ্ট শক্তিশালী লেখক বলে মনে করতেন। আমি কিন্তু দেখেছি কলকাতার লেখকগোষ্ঠী তাঁর সাজপোশাকের রুচি নিয়ে তাঁকে খুব খ্যাপাতো। আমি নিজে তাঁর লেখা ছোটগল্পের ভক্ত ছিলুম, এখনও আছি। লেখাতেও তাঁর সাহস ছিল প্রচুর। কতকাল আগে তিনি সমকাম নিয়ে শক্তিশালী গল্প লিখে গিয়েছেন। কেরিয়ার লক্ষ্যভেদী তাঁরই নামে, 'বাণী-মন্দির'। তাঁর মায়ের লেখা উপন্যাস 'রায়-বাড়ি' অবশ্য আমি অনেক পরে পড়েছি। কি আশ্চর্য, এখন ভেবে অবাক লাগে, আর লজ্জাও করে। ওঁর ভাইপো অনিরুদ্ধ আমার আবাল্যের বন্ধু, প্রথমে লেকে সাঁতারের সঙ্গী, পরে প্রেসিডেন্সির ক্লাসমেট। সে বিয়েও করল আমার এক বাল্যবন্ধুকে শাওন। ওঁদের বাড়িতে আমার খুবই যাওয়া আসা ছিল। তাঁকে অনিরুদ্ধর ঠাকুমা, শাওনের দিদিশাশুড়ি, অনিলকাকা, বাণী পিসিমার মা বলেই চিনতুম, কিন্তু লেখিকা গিরিবালা দেবীকে আমি চিনতুম না। 'রায়-বাড়ি'র প্রসঙ্গই ওঠেনি কোনওদিন।

ওঁর কথা প্রথম জানলুম যেবারে বাংলা সাহিত্যের পঞ্চকন্যা শৈলবালা ঘোষজায়া, জ্যোতির্ময়ী দেবী, গিরিবালা দেবী, রাধারানী দেবী, আর আশাপূর্ণা দেবীকে সংবর্ধনা দেওয়া হল রবীন্দ্রসদনে। ষষ্ঠ কন্যা মহাশ্বেতা দেবী আয়োজক ছিলেন।

শৈলবালার 'শেখ আন্দু' তো খুঁজে পেতে পড়েছিলুম এক সময়ে। কিন্তু 'রায়-বাড়ি'?

মনে আছে অবাক লেগেছিল গিরিবালা দেবীকে আবিষ্কার করে। সত্তরোর্ধ্বা গিরিবালার শান্ত রূপশ্রী তাঁর মেয়ের কাছে পৌঁছয়নি দেখে আমি কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পেলুম। আমাকে একটুও আমার মায়ের মতো দেখতে নয় বলে আমি আর দুঃখু করব না।

প্রচেত গুপ্ত

আমার দুই সম্পাদক

একটা ইন্টারেস্টিং স্মৃতির কথা বলি। ঘটনাটা আগেও অল্প স্বল্প বলেছি। আবার বলছি। আমি যতদিন লেখালেখি করব এই স্মৃতি ভুলব না। ভোলার কথাও নয়। আপনারা শুনলেই বুঝবেন কেন একথা বলছি। বিশেষ করে তরুণ লেখকরা তো বটেই।

ভদ্রলোকের নাম সুব্রত সেনগুপ্ত। আমি তখন এক দৈনিক পত্রিকায় রিপোর্টারের চাকরি করি। সুব্রতবাবু সেই পত্রিকার সাহিত্য বিভাগের দায়িত্বে। রবিবারের পাতায় গল্প বাছতেন, পুজোসংখ্যার দেখাশোনা করতেন। নিচু গলায় কথা বলেন। সাহিত্য সম্পাদক সুলভ একটা ভারিক্কি ভাব। সুন্দর মানুষ। অমায়িক ব্যক্তিত্ব। আমি তখন দ্বিতীয় দফায় ওই কাগজে রিপোর্টার হিসেবে যোগ দিয়েছি। দীর্ঘদিন চাকরিবাকরি না থাকার কারণে লেখালিখির বদভ্যাস হয়েছে। চাকরি পাওয়ার পরও অভ্যেস যায়নি। লুকিয়ে চুরিয়ে লিখি। সবসময় আতঙ্ক, এই বুঝি গল্প লেখার কারণে চাকরি চলে যাবে। ভয় যে একেবারে অমূলক এমন নয়। অনেকে ভয় দেখাত। তবে সে আরেক গল্প। সময় হলে বলব। সেই স্মৃতিকথার নাম হবে, 'ভয়ে ভয়ে লিখি'। যাইহোক, কী কারণে জানি সেবার মতিভ্রম হল। একটা গল্প নিয়ে সুব্রত সেনগুপ্তের টেবিলে চলে গেলাম। ওনাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করতাম। কারণ দুটো। এক তো নিজে গল্প উপন্যাস লেখেন। আর দুই হল, ওর কাছে অনেক লেখক আসেন। গল্প করেন। মাঝে মধ্যে 'হো, হো' আওয়াজ করে জোরে জোরে আসেন। দূর থেকে দেখতাম আর লোভ হত। স্বপ্ন দেখতাম, আমিও একদিন লেখক হব। সুব্রত সেনগুপ্তর কাছে বসে আমিও একদিন 'হো হো' আওয়াজ করে জোরে জোরে হাসব। সেদিন ওর টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁপা হাঁটু নিয়ে লেখাটা এগিয়ে দিলাম। তারপর কী হল? সংলাপে লিখছি। সব সংলাপ যে একেবারে পারফেক্ট হবে এমন নয়। স্মৃতি একটু এদিক সেদিক হতে পারে। তবে মূল ভাব থেকে সরব না।

সুব্রত সেনগুপ্ত (আমার হাতে কাগজ দেখে): এটা কী?

আমি (নার্ভাস গলায়): লেখা।

সুব্রত সেনগুপ্ত: লেখা! কার লেখা? কী লেখা।

আমি (আমতা আমতা): আমার। একটা গল্প লিখেছি।

সুব্রত সেনগুপ্ত (মুচকি হেসে): তুমিও গল্প লেখ নাকি? আমি তো জানি নেতাদের মিটিংয়ে ঘুরে ঘুরে খবর করো। নেতাদের গল্প?

আমি (লজ্জা পেয়ে): চেষ্টা করেছি। আমাদের পুজোসংখ্যায় এই গল্পটা ছাপা যাবে?

সুব্রত সেনগুপ্ত (এবার জোরে হেসে ফেললেন): দূর পাগল ছেলে। পুজোসংখ্যায় কি ওভাবে গল্প ছাপা যায়? আরে বাবা, অনেক অনেক লেখবার পর পুজোসংখ্যায় চান্স পাওয়া যায়। লিখতে লিখতে শিখতে হয়। শিখতে শিখতে লিখতে হয়। এক কাজ করো প্রচেত, আগে তুমি আমাদের সান্ধ্য কাগজে লিখে প্র্যাক্টিস করো। এগারোশো শব্দের গল্প। মেরেকেটে বারোশো, বারোশোর বেশি লিখবে না কিন্তু। ভালো লিখলে একদিন পুজোসংখ্যাতেও হবে। সময় নাও।

আমি (মাথা চুলকে): এবার কোনও সুযোগ নেই?

সুব্রত সেনগুপ্ত (হেসে। যতই হোক এক অফিসে কাজ করি ভঙ্গিতে): শোনাও, এটা কোন মাস? অ্যাঁ, কোন মাস এটা? বলো, বলো। জুন। পুজোর আর কত বাকি? কত বাকি? বলো, বলো, বলো তুমি। চার মাস। এই সময় নতুন লেখা নেওয়া যায়? আমার সব লেখা নেওয়া হয়ে গেছে। আমন্ত্রিত লেখা।

আমি (লেখা এগিয়ে বলি): তবু যদি একবার পড়ে দেখতেন...। যদি নিতেন...।

সুব্রত সেনগুপ্ত (আঁতকে, ভয় পেয়ে, হাত সরিয়ে নেন): না না, নেব না, নেব না। আমাকে দিও না...। পুজোর চাপ। কত লেখা পড়তে হচ্ছে। এখন কি নতুন লেখা পড়বার সময় আছে? এই যে আমি, আমি কি একদিনে লেখক হয়েছি? একদিনে নাম হয়েছে? আজকাল পুজোসংখ্যায় একদিনে উপন্যাস লেখার সুযোগ পেয়েছি। বলো তুমি। অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। আচ্ছা, তুমি বরং একটা কাজ করো। বাংলা গল্পের প্রচার এবং প্রসারের জন্য আমার একটা সংগঠন আছে। সেই সংগঠনের কাজ ভালো গল্পকে উৎসাহিত করা। আমরা মাসে মাসে বসি। গল্প নিয়ে আড্ডা দিই। বছরে একদিন বড় করে প্রোগ্রাম করি। সারাদিন গল্প পাঠ, গল্প নিয়ে আলোচনা। মাঝখানে লাঞ্চ ব্রেক। নিরামিষ, আমিষ দু-ধরনের বিরিয়ানি থাকে। যে যেমন খাবে সকালে মিছিল করে হাঁটার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। গল্পের জন্য হাঁটা। তুমি এবছর থেকে আমার গল্পের জন্য হাঁটা প্রোগ্রামে জয়েন করো। বড় বড় লেখকরা আসে। তারাও গল্পের জন্য হাঁটে। ওদের গল্প আমাদের রবিবারের পাতায় নিয়মিত দেখতে পাবে। তুমিও হাঁটতে শুরু করো।

আমি (কাঁদো কাঁদো গলায়): আচ্ছা, হাঁটব। কিন্তু আমার গল্পটা? গল্পটার কী হবে?

সুব্রত সেনগুপ্ত (সস্নেহে হেসে): নিয়ে যাও। জমিয়ে রেখে দাও। বড় হয়ে ফাইল থেকে বের করে পড়বে। নিজেই হাসবে। বুঝবে সুব্রতদা সেদিন এই গল্প না নিয়ে সম্পাদক হিসেবে ঠিক কাজই করেছিল। তখন এসে আমাকে বলবে।

বেজার মুখে আমি চলে আসি। পরদিন মনের দুঃখে একটা খামে লেখাটা পুরে পাঠিয়ে দিলাম আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় দপ্তরে। লেখাটা যখন ফেলতেই হবে, তখন ওখান থেকেই ফেলা যাক। ঠিক করলাম, ওনারা যদি ফেলে না দিয়ে ফেরত পাঠান তাহলে আরেক কাগজে পাঠাব। তারাও যদি ফেরত পাঠান, তাহলে আরেক কাগজে... এভাবে দুনিয়ার সব কাগজে এই গল্প ঘুরবে। আমি হব এক গল্প ফেরত লেখক।

তখন মোবাইলের চল ছিল না। দু'দিন বা তিনদিন পরেই বাড়ির ল্যান্ডফোন বাজল। আনন্দবাজার অফিস থেকে ফোন। এক ভদ্রলোক জানালেন, রবিবাসরীয় বিভাগের সম্পাদক রমাপদ চৌধুরী গল্প পেয়ে খুব রাগ করেছেন। বলেছেন, এই ছেলে কি কিছুই জানে না! রবিবারের পাতায় এত বড় গল্প ছাপা হয়? সেই বকুনির খবর জানাতেই এই ফোন। তবে বকুনির সঙ্গে আর একটা ছোট খবরও আছে। রমাপদ চৌধুরী বলেছেন, এই গল্প এখনই অন্য কোনও পত্রিকায় পাঠানোর দরকার নেই। এটা ওনার কাছে জমা থাকল।

সেই বছর (২০০১ সাল) আনন্দবাজার পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় একজন মাত্র নতুন লেখকের গল্প ছাপা হয়। সেই অধম আমি। গল্পের নাম 'বিভ্রম'। রমাপদ চৌধুরী খবর পাঠালেন, এবার থেকে নিয়মিত তাঁর দপ্তরে গল্প পাঠাতে হবে। আমার অতি সামান্য লেখক জীবন শুরু হল।

পুনশ্চ: দু'টি তথ্য— এক) আনন্দবাজারে গল্প প্রকাশের পর থেকে সুব্রত সেনগুপ্ত ঘন ঘন আমার থেকে লেখা চাইতেন। দুই) পত্রিকা

থেকে অবসর নেবার পর সুব্রত সেনগুপ্ত বাংলা আকাদেমির সঙ্গে যুক্ত হন। তখন ছিল সি পি এমের আমল। আমার লেখা পছন্দ করতেন এমন এক আকাদেমি কর্তা (কবি) আমার কাছে সুব্রতবাবু সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছিলেন। যেহেতু এক অফিসে কাজ করেছি সেই কারণেই খোঁজ নেওয়া। মনে আছে আমি বলেছিলাম, সুব্রতদা নিজে গুণী, গুণী মানুষ চিনতেও কখনও ভুল করেননি। ওনার জন্য আমার বিরাট উপকার হয়েছে, বাংলা আকাদেমিরও হবে।

জাহিরুল হাসান

বহু স্মৃতি-জাগানো সেই চিঠি

কবি মঞ্জুষ দাশগুপ্তের মতো মধুর স্বভাবের প্রেমময় মানুষ আমি জীবনে খুব কম দেখেছি। তাঁর ভালোবাসার টানেই অসংখ্য কবি লেখক তাঁকে ঘিরে থাকতেন, বিশেষ করে তরুণরা। তিনি ছিলেন লিটল ম্যাগাজিনের এক বড় আশ্রয়। ফলে তাঁর প্রয়াণে অবধারিত শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। আসন্ন অবসরজীবনে সাহিত্য নিয়ে অনেক পরিকল্পনা ছিল তাঁর। কিন্তু আপশোসের কথা, অবসর নেওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই কর্কট রোগের ছোবলে তাঁকে প্রাণ হারাতে হয়।

এই চিঠি লেখার বছর খানেক আগে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়। ম্যাক্সমুলার ভবনে সাহিত্য অকাদেমির কোনও অনুষ্ঠান চলছিল। আমার অফিস তখন ম্যাক্সমুলারের পাশেই। অর্ধেন্দু চক্রবর্তী তাঁকে আমার কাছে নিয়ে আসেন। তারপর আমি ধানবাদে বদলি হয়ে যাই। সেখানে আমার বন্ধু হিন্দি লেখক ডঃ শিবেশ-এর অনুরোধে কলকাতা থেকে কয়েকজন কবি ও আবৃত্তিশিল্পীকে নিয়ে আসি। এই দলে ছিলেন অর্ধেন্দু চক্রবর্তী, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, প্রমোদ বসু, ব্রত চক্রবর্তী ও প্রবীর ব্রহ্মচারী। আমি যে হোটেল থাকতাম সেখানেই ওঁদের থাকার ব্যবস্থা করেছিলাম। অনুষ্ঠান হয়েছিল ধানবাদের সুদৃশ্য কলাভবনে। কলকাতার কবিরা ছাড়াও কবিতাপাঠে অংশ নিয়েছিলেন স্থানীয় হিন্দি, উর্দু ও বাংলা ভাষার কবিরা। পরের দিন ধানবাদের বহুল-পরিচিত দৈনিক আওয়াজ-এ ছবি ও বিস্তারিত খবর ছাপা হয় 'ভাষায়ি বন্ধন তোড়কর কবি-লেখক' শিরোনামে। ফেরার পর চিঠিটি লিখেছিলেন মঞ্জুষদা। উপলক্ষ্য অবশ্য, আমার পাঠানো শারদ শুভেচ্ছা।

চিঠিতে হিন্দি অনুবাদের কথা আছে। ঘটনাচক্রে, খুব ভালো হিন্দি না জানা সত্ত্বেও তাঁর দু'টি কবিতার অনুবাদ পরে আমাকেই করতে হয়। সেবার তিনি বাংলা ভাষার জাতীয় কবি নির্বাচিত হয়েছেন। কবিতা পড়বেন লখনউয়ের গণসংস্থান অডিটোরিয়ামে ন্যাশনাল সিম্পোজিয়াম অব পোয়েটস-এ। প্রথামাফিক ২৬ জানুয়ারি ১৯৯৯ প্রজাতন্ত্র দিবসে সেই কবিতাগুলির হিন্দি অনুবাদ বেতার মারফত সারা ভারতে প্রচারিত হওয়া কথা। মঞ্জুষদা তাঁর এই সম্মানের ভাগ আমাকেও কিছুটা দেওয়ার জন্য চাইলেন নির্বাচিত কবিতা দু'টি যেন আমি হিন্দিতে অনুবাদ করে দিই। করেও ছিলাম ভাঙা-চোরা হিন্দিতে যতখানি পারি। তবে তার ওপর নিশ্চয় যথেষ্ট কলম বুলোতে হয়েছে বেতার কর্তৃপক্ষকে।

মঞ্জুষদার কথা উঠলেই পোদ্দার কোর্টের আড্ডার কথা মনে আসে তাঁর ঘনিষ্ঠদের। চিঠিতে তাঁর আহ্বান সেই আড্ডাতেই যাওয়ার। পরে তো বদলি হয়ে পোদ্দার কোর্টেই আসতে হয় আমাকে। তাঁর কামরায় ভিড় থাকত অনেক মানুষের। মাঝে মাঝে তিনি একটু একা হবার জন্য চলে আসতেন আমার কামরায়। তখন সদ্য ক্যান্সার ধরা পড়েছে। এসে বিশ্রাম নিতেন আমার আরাম কেদারায়। আমি নিজে ওটায় কখনও শুইনি। নতুন পালিশ-করা আসবাবে তাঁর মাথা রাখার একটা তেলচিটে দাগ পড়ে গিয়েছিল। মারা যাওয়ার পর ওই দাগটার দিকে যখন তাকাতাম, ভাবতাম মঞ্জুষদা নেই কিন্তু তাঁর শরীরের ছাপ রয়ে গিয়েছে!

চিঠির প্রতিশ্রুতিমতো মঞ্জুষদা শুধু যে আমাকে তাঁর বই উপহার দিয়েছিলেন তা-ই নয়, তাঁর একটি বই 'ফরাসি ফুলের গুচ্ছ' আমাকে উৎসর্গও করেন। তিনি আমার চেয়ে বয়সে চার বছরের বড় ছিলেন। তাই তিনি বলা সত্ত্বেও তাঁকে আমি কোনওদিন তুমি বলতে পারিনি। তবে তাতে নৈকট্য আটকায়নি। আমাদের সম্পর্ক ছিল গভীর বন্ধুত্বের।

শংকর চক্রবর্তী

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের চিঠি প্রসঙ্গে

চাকরিসূত্রে ১৯৬৯ সালে শিলং-এ পা রাখি। এরপর টানা ত্রিশ বছর। পত্রিকা-আড্ডা-লেখালেখির সুযোগে একাধিকবার কলকাতা থেকে বিভিন্নজন এসেছিলেন তখন। তাঁদের সান্নিধ্যে উজ্জীবিত হয়েছি। ১৯৭৭ সালে শক্তিদা এলেন। সঙ্গে বউদি ও ছেলেমেয়ে। একটা অনুষ্ঠান উপলক্ষে। সুনীলদা এবং শীর্ষেন্দুরাও। অনুষ্ঠান শেষে সবাই ফিরে গেলেন। শুধু শক্তিদা সপরিবারে গুয়াহাটিতে আমার মামার বাড়ি। সেখান থেকে উজান আসামের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ানো। জোড়হাট, ডিব্রুগর, দুলিয়াজান, কাজিরাঙা আরও কোথাও। এবং প্রতিটি জায়গা থেকে আমার উদ্দেশে একটা পোস্টকার্ড ছাড়তেন। আমি সত্যিই ভাগ্যবান। তাতে ব্যতিক্রমী সব ঘটনা। ওইসব অভিজ্ঞতা নিয়েই কলকাতা ফিরে লিখলেন ভ্রমণের একটি অসামান্য গাইড বই— 'চলো বেড়িয়ে আসি'। ওই বইটি পড়ার অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে তাঁরা নিশ্চিত উপলব্ধি করেছেন, আগে এই ভাষায় কখনও ভ্রমণের গাইড বই রচিত হয়নি। নাথ পাবলিশিং প্রকাশিত বইটি পরে আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে আমাকে আলোচনার জন্য দেওয়া হয়েছিল। সে-লেখা পড়ে শক্তিদা ভীষণ খুশি হয়েছিলেন। ওইসব খুশির মুহূর্তগুলি যত্নে আগলে রেখেছি এখনও।

দুলিয়াজান ২১/৫/৭৭

শংকর,

কাজিরাঙা থেকে গোলাঘাট, জোড়হাট হয়ে গতকাল রাত নটা নাগাদ দুলিয়াজানে পৌঁছেছি। চা-বাগানের মধ্যে দিয়ে ট্যাক্সিতে। বৃষ্টি নেই। গুমোট ভাব আছে। রোদ্দুরে ঝকমক করছে চতুর্দিকের সবুজ। এই সবুজ বাংলাদেশের সবুজের চেয়ে শ্বাসরোধী। ভালো লাগছে। এখান থেকে অরুণাচল খুব কাছে। একটা গাড়ি পেলে সকালে গিয়ে রাতে ফিরে আসা যেতে পারে। চেষ্টা চলছে। বিহু আজ সন্ধেয় দেখা যেতে পারে। পরশুর মধ্যে নোঙর তুলতে হবে। মণিপুর রোড থেকে কোহিমা। টেলিফোনে যোগাযোগ করবো, আজ সন্ধেবেলা। কোহিমা থেকে মকক্‌চং সেখান থেকে মণিপুর হয়ে গৌহাটি। ২৭ রাতে কিংবা ২৮ সকালে। আগের চিঠি পেয়েছিলে তো? মেঘালয় ট্যুরিস্ট অফিস থেকে আমার জন্যে যতগুলো Handouts পাও নিয়ে এসো তো? নিশ্চয় এসো। শখানেক মতো অর্থ নিয়ে আসতে পারবে? আমি ফিরেই পাঠিয়ে দেবো। অকারণ খরচ হয়ে গেছে। আমি তোমার মামার বাড়িতেই যাচ্ছি। ভালবাসা।

শক্তিদা
২১/৫/৭৭

ঋত্বিক ত্রিপাঠী সম্পাদিত 'জলদর্চি' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৩ থেকে পুনর্মুদ্রিত। এই প্রসঙ্গে 'জলদর্চি'-র সম্পাদক ও এই স্মৃতিকথকদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইমেলায় স্বর্ণাক্ষরের ২৭৮নং স্টলে

এক আশ্চর্য বইয়ের পরমাশ্চর্য MP3 সিডি

অবাক করা গানে-সুরে
বাদ্যি-বাজনায় অভিনয়ে জমজমাট
প্রায় দু'ঘণ্টার MP3 সিডি

হীরু ডাকাত

ছন্দে-কথায়, গানে-বাজনায়, অভিনয়ে-কথকতায়
সব বয়সের ছোটদের মস্ত বড় আনন্দের আয়োজন

মূল রচনা ও শ্রুতিনাট্যরূপ: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী *সংগীত ও পরিচালনা:* দীপক চৌধুরী
অভিনয়: সন্তু মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত,
দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়চৌধুরী ও আরও অনেকে
ভাষ্যপাঠ: অনসূয়া মজুমদার *গান:* স্বপন বসু ও আরও অনেকে

সব মিউজিক শপে পাওয়া যায় ₹৯৯

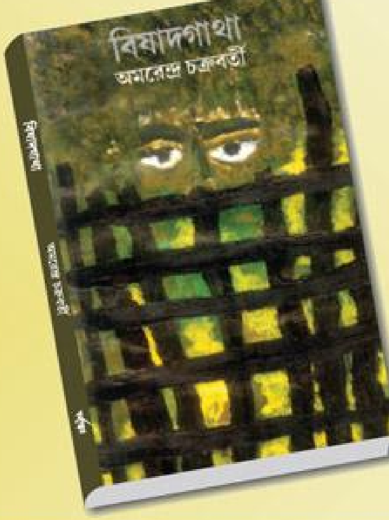

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
প্রথম উপন্যাস

বিষাদগাথা

হারানো অতীত থেকে ঝাঁপানো বর্তমান অবধি বিস্তৃত
বাংলার স্মৃতি-ইতিহাস। নদীহারা এক গ্রামের দর্পণে
দুই শতাব্দী যাপনের নিবিড় মায়াচিত্র
কিংবা সমকালীন রূপকথা।

২০০ টাকা। **বইমেলায় ১৫০ টাকা**

স্বর্ণাক্ষরের
বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র
জন্য লগ ইন করুন:
www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর

Swarnakshar Prakasani Private Limited
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: 2280-8818 **Fax:** 2287-6448
Email: info@swarnakshar.in **Website:** www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনীর বই, পত্রিকা, ভ্রমণ-ভিসিডি
Buy Online ▶ www.swarnakshar.in
তুতুল
মহাশ্বেতা দেবী
শাদা ঘোড়া
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
চলো দেখে আসি
কানাইলাল চক্রবর্তী
আমাজনের জঙ্গলে
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
গৌর যাযাবর
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
হীরু ডাকাত
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
কথামালা: ছড়ায় ঢালা
পবিত্র সরকার
বকবকম
সুভাষ মুখোপাধ্যায়
সেরা ভ্রমণ কাহিনী
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
ইছামতীর মশা
শঙ্খ ঘোষ
ভ্রমণের নবনীতা
নবনীতা দেব সেন
দুচাকায় দুনিয়া
বিমল মুখার্জি
দেশে দেশে
প্রতাপকুমার রায়
দক্ষিণ থাইল্যান্ড
সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড়ে
Read / Subscribe Online ▶ www.swarnakshar.in
ভ্রমণ
ছেলেবেলা
কালের কষ্টিপাথর
পেশাপ্রবেশ
কর্মক্ষেত্র
স্বর্ণাক্ষর
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ ই-মেল: info@swarnakshar.in
ওয়েবসাইট: www.swarnakshar.in • www.bhraman.com
www.ebhraman.com • www.echhelebela.com • www.ekarmakshetra.com
স্বর্ণাক্ষরের বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন: www.swarnakshar.in

KALER KASHTIPATHAR ◻ Vol. 2 No. 7 ◻ 1 February 2014 ◻ Rs. 30 RN WBBEN/2012/50069

Owner Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Printer & Publisher Amarendra Chakravorty on behalf of Swarnakshar Prakasani (P) Ltd.
Published from 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019 and Printed from Swapna Printing Works (P) Ltd.,
Doltala, Doharia, P.O. Ganganagar, North 24 Parganas, Kolkata-700 132.
Editor Amarendra Chakravorty.

Subscribe Online ▸ www.swarnakshar.in
Read Online ▸ www.ebhraman.com

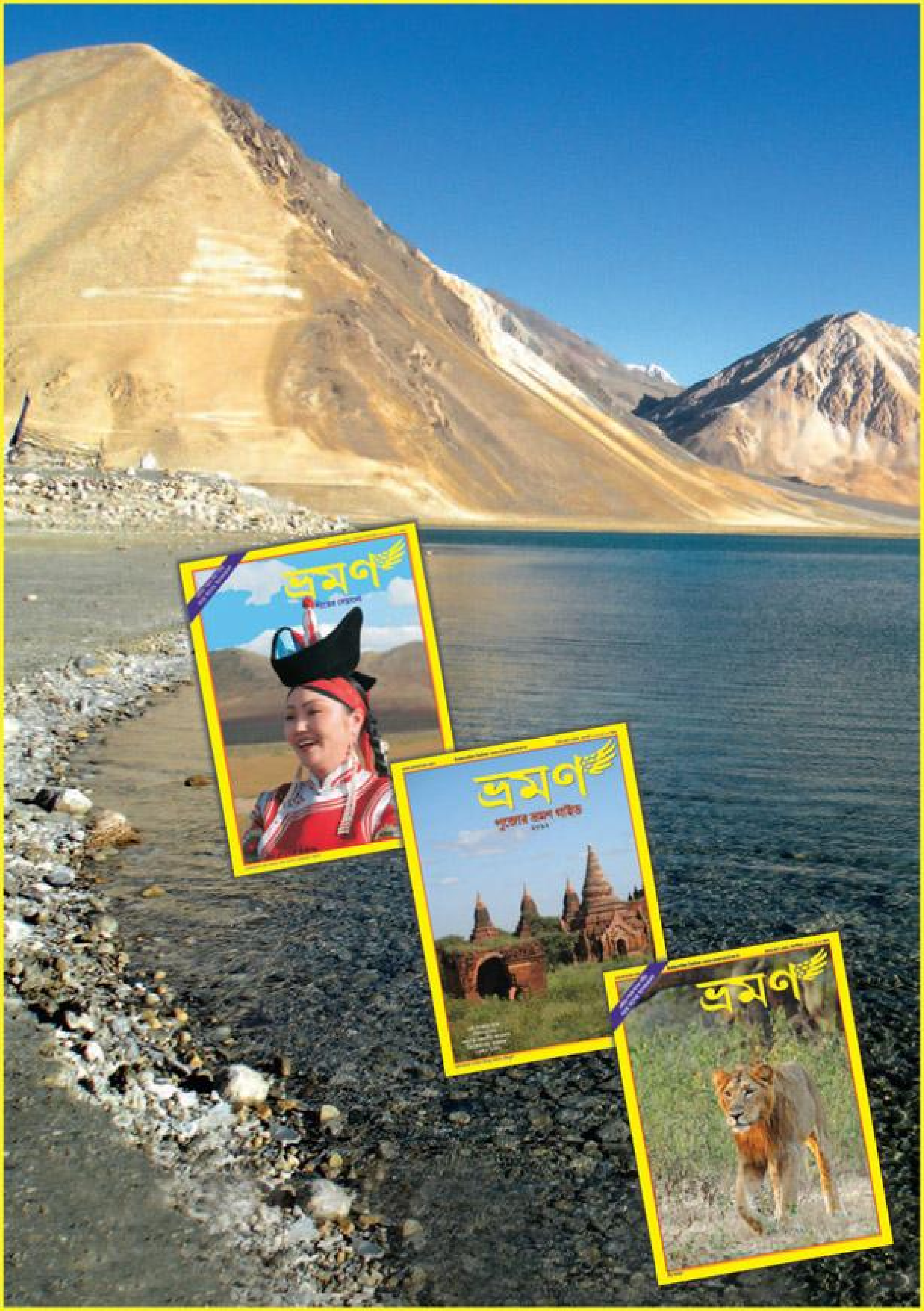

The most read travel magazine in India*

****Source: IRS (Indian Readership Survey) 2012 Q4***